বাসর সজ্জা

বিমল মিত্র

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

চকমকি প্রকাশনী

দমদম ছাতাকল

কলিকাতা—৬৫

প্রকাশক : অসিম বালা
দমদম ছাতাকল
কলিকাতা—৭০০০৬৫

প্রথম প্রকাশ
১লা মাঘ, ১৩৭১

মুদ্রাকর : অবলা প্রেস
গোপীনাথ চক্রবর্তী
১/এ, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

বালামণি

এই বালামণির কথাই পিয়ের লোটি লিখিয়াছেন। যে মোহিনী শক্তির প্রভাবে খ্যাতনামা এই পাশ্চাত্য লেখকটি মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সাহিত্যের মধ্যে বালামণির কথা বলিয়াছেন, তাহার কথা কিন্তু উত্তর-ভারতের লোকে বিশেষ জানে না। এখানে তাহার জীবন-কথা সংক্ষেপেই বলিতেছি।

দক্ষিণ ভারতে জন্ম, মাদুরা কুম্ভকোণাম, তানজোর, ত্রিচিনাপল্লি, মান্দ্রাজ প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ স্থান ব্যাপিয়া ছিল তাহার কর্মক্ষেত্র। এখনও সঙ্গীত ও নৃত্যকলারসিক-সমাজের অনেকেই তাহার কথা প্রীতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে আলোচনা করেন। এখনও তাহার প্রতি একটি আকর্ষণ দক্ষিণ ভারতের অনেক স্থানেই বর্তমান।

দেবদাসী শ্রেণীতেই তার জন্ম। যৌবনশ্রী উদ্গমের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার নৃত্য ও কণ্ঠ-সঙ্গীতের সৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। গৌরবর্ণা সে ছিল না, তবে চমৎকার দেহশ্রী, সুগঠিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্যে সে ছিল অতুলনীয়া। সত্যই তার বর্ণ ছিল শ্যামা, সেই শ্যামা রূপের যে কি অসাধারণ মাধুরী, কি আকর্ষণ ছিল, যে তাহাকে দেখিয়াছে সেই জানে। প্রসিদ্ধ কলাবতী তো ছিলই আবার বিদ্যাবতী বলিয়াও তাহার খ্যাতি ছিল। অল্প বয়সেই রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি পড়িয়া ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ভাবটি সে ভালমতেই বুঝিয়াছিল। কিন্নরকণ্ঠে যখন সে দক্ষিণের ভক্ত কবিগণের ভজনগান করিত, তখন তাহাকে কেহ মানবী ভাবিতে পারিত না। নৃত্যে সে ছিল রম্ভা। বালামণিকে যাহারা নাটকাভিনয়ে একবার দেখিয়াছে, জীবনে তাহাকে আর ভুলিতে পারে নাই। তাহার মিষ্ট কণ্ঠের কথাগুলি লোককে মোহিত করিত। কত লোক তাহার মুখের কথা শুনিবার জন্য এরূপ আকৃষ্ট হইত যে, সে যেখানেই যাইত, ভিড় করিয়া তাহার চারিদিকে ঘিরিয়া থাকিত। একজন বিখ্যাত ইউরোপীয় পর্যটক ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে বালামণির কথা শুনিলেন, তখন মাদুরায় তাহার অভিনয় চলিতেছিল। তিনি বলেন, যখন বালামণিকে তাহার নাটকের প্রধান ভূমিকায়, নৃত্যচ্ছন্দে, অপরূপ ভঙ্গিতে অবতীর্ণ হইতে দেখিলাম, এ কথা স্বীকার করিতে আমার লজ্জা নাই যে, আমি যথার্থই সম্মোহিত হইয়াছিলাম। আমি কে, কোথায়, কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছি —তাহা আমার বহুক্ষণ স্মরণ ছিল না। মনে হইল, এ অপ্সরা-মূর্তির কণ্ঠ-নিসৃত অমৃতপূর্ণ শব্দ-তরঙ্গে সেখানকার বায়ুমণ্ডল পূর্ণ হইয়া সমাগত সকলকেই আমার মতই ভুলাইয়াছিল। রূপে গন্ধর্ব, অথবা কিন্নরকণ্ঠ কাহাকে বলে জানি না,—বালামণির মূর্তি এবং কণ্ঠ হইতে তাহাদের যে অন্য অস্তিত্ব আছে, তাহা কল্পনাও করিতে পারি না। যে কেহ রঙ্গমঞ্চে তাহাকে দেখিয়াছে, তাহার কণ্ঠের সঙ্গীত শুনিয়াছে, নৃত্যচ্ছন্দে তাহার অপূর্ব ভঙ্গিমা, স্বরলহরীর উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অপরূপ বাহুলতার লীলায়িত ভঙ্গি, মুদ্রাযুক্ত মনোহর আঙ্গুলের

চঞ্চল গতিরেখা নিবিষ্ট চিত্তে লক্ষ্য করিয়াছে, তাহার জন্ম ও জীবন সার্থক হইয়াছে। এই ধারণা লইয়া বোধ হয় আমরা প্রত্যেকেই সে রাত্রে তাহার নাট্যশালা ত্যাগ করিয়াছিলাম।

নাতিদীর্ঘ-খর্ব শরীর,—কি অপূর্ব তার রেখায়তন ভঙ্গি। শ্যামা রূপের সে লাবণ্য বর্ণনাতীত—যথার্থ শিল্পী যারা, তাহাদের কাছেই সে রূপের সার্থক অনুভূতি,—সাধারণে কেবল মোহিত হইয়াই থাকিত। কোমল বাহুলতিকার ভঙ্গি, সুকোমল তীক্ষ্ণাগ্র অঙ্গুলীর মুদ্রার পর মুদ্রার পরিণতি, প্রতি অঙ্গুলী-সঞ্চালনের অপূর্ব কৌশল, বিস্ময়কর তাহাদের নমনীয়তা,—বিধাতার সেই অপূর্ব সৃষ্টি ভাগ্যবানেরই উপভোগের বিষয়। প্রশস্ত বক্ষের উন্নত পরিণতি, তাহার তলে ক্ষীণমধ্য-কটি, বাসন্তী মেখলায় বেড়িয়া আছে, তার নীচে ভারতীয় কবি-বর্ণিত যে নিবিড় নিতম্ব, তাহাতে অলঙ্কারের বেড়া, দেহগতির সঙ্গে ঝলমল করিয়া উঠিতেছে, আবার ঝটিতি পড়িয়া নিষ্প্রভ হইতেছে। পা দুটি যেন নৃত্য-সিদ্ধির প্রতীক—সুপুষ্ট ও সুগঠিত অথচ গোড়ালি তার এতটা ক্ষীণ যেন মুষ্টির মধ্যে সহজেই পুরিয়া ফেলা যায়। তার নীচে সে তরল চরণের গতিচ্ছন্দ, তাহার কথা আর কি বলিব,—ঠিক পল্লবের কথাই মনে আসে—যাহার মাধুর্য দেবী সারদাকে স্মরণে আনিয়া দেয়। তার পদাঙ্গুলীর এমনই কোমল গঠন-ভঙ্গি যে দেখিলে চক্ষু ফিরাইতে পারা যায় না। দেবদাসী সুন্দরী অনেক দেখা যায়—মন্দিরে নৃত্যই যাহাদের বৃত্তি;—এদেশের সম্ভ্রান্ত ভদ্র-সমাজের কেহই প্রায় তাহাদের দিকে ভাল করিয়া দেখেন না,—কিন্তু বালামণির প্রতি কি জানি কেন প্রথম হইতেই সাধারণের দৃষ্টি পড়িয়াছিল ;—তার শ্যামাঙ্গ সত্ত্বেও তার রূপ যে দেখিত, সে-ই গভীর একটি আকর্ষণ অনুভব করিত।

রাত্রে নাটকাভিনয়ের মূর্তির সঙ্গে দিনমানের বালামণির রূপের একটা পার্থক্য সকলের চক্ষেই পড়িত, কিন্তু কি জানি কেন, কেহ এই দুই রূপের তুলনা করিয়া দেখিতে চাহিত না। দিনমানের শ্যামাঙ্গী বালামণির আকর্ষণ কোন অংশেই কম বলিয়া কাহারও মনে হইত না। তার সেই শ্যামকান্তি গৌরবর্ণকেও উপেক্ষা করিতে পারে—সাধারণের তাহাই মনে হইত। কিন্তু সে নিজে তাহা জানিত না, বুঝিতও না। কালোর মাধুর্য যতই চমৎকার হোক, যারা কালো নয় তাদের সংস্কার এবং চির-আচরিত নিম্নদৃষ্টির প্রভাব কালোকে সমাজনেত্রে এমনই ছোট করিয়া দিয়াছে যে রূপের আসরে গোরার পাশে তাহার যেন স্থান হইতেই পারে না। তাই অভিনয়ের পূর্বে তাহাকে সাজিতে হইত,—অর্থাৎ উপযুক্ত বর্ণ-বিন্যাস অনুলেপনাদির যে প্রথা আছে, তাহারই আশ্রয় লইতে হইত। ইহা সর্বত্র অভিনয়কারী নটনটী সম্প্রদায়ের সংস্কারগত অনুষ্ঠান। প্রসাধনের কৌশল বা দক্ষতা, সত্যের দিক দিয়া দুর্বলতার নামান্তর মনে হইলেও তাহার পক্ষে অপরিহার্য ছিল—যাহার জন্য তাহার কোন সঙ্কোচ বা অনুশোচনা লাগে নাই, সে ইহাকে তাহার বৃত্তির অতি প্রয়োজনীয় সহজ অঙ্গ বলিয়াই মনে করিত।

এই সকল বাহিরের সৌন্দর্য অপেক্ষা তাহার অন্তরের মাধুর্য ছিল অসীম। করুণার সাগর ছিল তাহার অন্তরের মধ্যে সকল দিক পূর্ণ করিয়া।

নব প্রতিভায় উদ্ভাসিত যৌবনে তাহার নৃত্য-গীতের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের বণিক, জমিদার তথা ধনী-সম্প্রদায় তাহার অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন প্রথমাবস্থায় তার একরাত্রের মজুরা ছিল দুই শত, ক্রমে তাহা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছিল। টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া তার ভক্ত ধনবান কেহ এক-রাত্রের মত নৃত্য গীত উৎসবের মধ্যে তাহাকে পাইত। ইহাতেই তাহার প্রভাব কতটা ছিল বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এইভাবে জীবনের শুভদিনগুলি কাটাইতে তাহার প্রাণ চাহিত না। স্বাধীনভাবে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করিয়া নাটকাভিনয়ের বৃত্তি অবলম্বনের পূর্বে এক ঘটনায় তাহার ভূতপূর্ব কর্ম-জীবন পরিবর্তিত হইয়া গেল। সে ব্যাপার উপন্যাসের মতই চিত্তাকর্ষক।

বাসুদেবন্ নামে এক ব্রাহ্মণ যুবা একদা কোন ধনবানের ঘরে নাচ-গানের আসরে প্রথম তাহাকে দেখিয়াছিল এবং মোহিত হইয়াছিল ;—তারপর সে মজিল। কেমন করিয়া সে বালামণিকে আবার দেখিতে পাইবে, তখন হইতে ইহাই হইল চিন্তার বিষয়। যে পথে বালা স্নানে যাইত সেই পথে সে দাঁড়াইয়া থাকিত। পরে জানিতে পারিল যে পাঁচশত টাকা হইলে একরাত্র তাহাকে পাওয়া যায়,—কিন্তু একসঙ্গে পাঁচশত টাকা তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সে কল্পনাও করিতে পারিল না। কেমন করিয়া পারিবে, সে যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান। পিতা তাহার ক্ষুদ্র একখানি গৃহ ব্যতীত আর ত কিছুই রাখিয়া যান নাই,—তাহারই কতকটা ভাড়া দিত। বাকি কতকটায় সে থাকিত। সে সন্ধান লইল—তাহার গৃহখানি বিক্রয় করিলে ঐ টাকা পাওয়া যাইতে পারে কি না। যে দিন সে সম্ভাবনার কথা জানিতে পারিল, তখন হইতে আর বৃথা কালক্ষেপ করিল না।

কিন্তু তাহার পর সে থাকিবে কোথায়? খাইবে কি? তাহাদের ব্রাহ্মণ-সমাজেই বা সে আর তাহার কালোমুখ দেখাইবে কি করিয়া? ইহার পর আর কি তাহার এখানে বাস করা চলিবে? সে ভাবিল, বালাকে একরাত্র পাইবার পর তাহার আর বাঁচিবার প্রয়োজনই বা কি থাকিবে? বাঁচিয়া থাকিলে আবার তাহাকে হয়ত পাঁচশোর ধান্ধায় ফিরিতে হইবে। কিন্তু তখন ত আর সহজে সে টাকা যোগাড় করিতে পারিবে না,—কাজেই তাহাকে হয় চুরি অথবা কোন প্রকার নীচ ফন্দির পিছনে চলিতে হইবে। ব্রাহ্মণ-সন্তান হইয়া নীচ কর্ম—! ছিঃ! এ সব তাহার দ্বারা হইবে না। তার চেয়ে, রাত্রশেষে বালামণির বাড়ি হইতে বাহির হইয়া একেবারে সোজা ঐ নদীতে নামিয়া জীবন শেষ করিয়া দিলেই ত সকল আপদ চুকিয়া যায়। ঠিক্ ঠিক্,—সে তাহাই করিবে। এই সঙ্কল্প মনে মনে স্থির হইবামাত্রই তাহার মনের সকল গোলযোগ যেন কাটিয়া গেল, ভিতরটা হাল্কা হইয়া গেল। একজনের জীবনে গুরুতর দেনা-পাওনার একটা খোলসা হিসাব-নিকাশ হইয়া গেলে যেমন স্বচ্ছন্দ বোধ হয় তাহারও সেইরূপ হইল। তাহার অনুশোচনার আর কিছুই রহিল না। মানুষে যুবা অবস্থায় এই ভাবেই অনুশোচনার গুরুভার এড়াইতে জীবনকে একেবারেই শেষ করিয়া দেয় ও যেন নিশ্চিন্তই হয়।

এই ভাবে বাসুদেবন্ যথাসম্ভব গোপনে কয়েকদিনের মধ্যেই তাহার যথা-সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া টাকাটা সংগ্রহ করিল এবং যথাকালে বালামণির কর্মচারীর

সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক করিয়া টাকাটা সেই প্রিয়তমা দেবদাসীর তহবিলে পেঁছাইয়া নিশ্চিন্ত হইল।

সেদিন সন্ধ্যার পর, উত্তম বেশ-ভূষা করিয়া, সে জীবনের একমাত্র কাম্যবস্তু লাভের আশায় সারা জীবনের সাধ মিটাইতে তাহার ইষ্টমন্দিরে উপস্থিত হইল। বালা তাহাকে যত্ন করিয়া বসাইল, মহাসমাদর করিয়া পান সুপারী, আতর, গোলাপ-চন্দনাদির অনুলেপনে এবং পুষ্পমালায় ভূষিত করিল এবং তাহাকে ব্রাহ্মণ জানিয়া বিশেষ শ্রদ্ধাপূর্বক তাহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিল।

এতাবৎকাল অনেকের সেবাই সে করিয়াছে, কিন্তু আজিকার এই নায়কের মধ্যে সে একটা অস্বাভাবিক এমন কিছু লক্ষ্য করিল, যা সে পূর্বে কখনও কাহারও মধ্যে দেখে নাই। ব্রাহ্মণকুমারের এ প্রকার চাঞ্চল্য এবং উম্মাদনা তাহাকে প্রথমটা একটু বিস্মিত করিল, তারপর সহজেই তাহার মধ্যে কেমন একটা ধারণা হইল এ ব্যক্তি কখনও একরাত্রে এত টাকা খরচ করিবার লোক নয়। একটা অবোধ্য স্নেহাকর্ষণ অনুভব করিয়া কৌশলে প্রশ্ন করিয়া, বাসুদেবনের সকল কথা, সে কোথা থাকে, কি করে, সংসারে তাহার কে কে আছে, কি ভাবে এতটা টাকা যোগাড় করিয়াছে ইত্যাদি, তাহার অবস্থার সকল কথাই জানিয়া লইল।

সরল প্রাণ, উম্মাদ বাসুদেবন্, ঐ নটীর কৌশলময় প্রশ্নের আবর্তে পড়িয়া সকল কথাই বলিয়া ফেলিল। এমন কি শেষ কথাটাও গোপন করিতে পারিল না যে, তাহাকে একরাত্র পাইবার পর তাহার আর বাঁচিয়া থাকিবারও প্রয়োজন হইবে না।

সব কথা শুনিয়া বালামণি, ক্ষোভে, বিস্ময়ে, দুঃখে কতক্ষণ পাথরের মত স্থির হইয়া রহিল ;—তারপর বুকের মধ্যে প্রবল এক ঝড় উঠিয়া—তাহার অন্তর ক্ষেত্র তোলপাড় করিতে লাগিল, শেষে অশ্রুর বন্যা ঘনাইয়া আসিতেছে—তাহা রোধ করা দুঃসাধ্য অনুভব করিয়া হঠাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কতক্ষণ হইয়া গেল, বালা আসে না। কোথা গেল, অনুসন্ধানে বাসুদেবন্ বাহির হইয়া পাশের ঘরে ঢুকিয়া দেখে, বালা শয্যায় উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। তাহার মুখ তুলিয়া সে দেখিল, অশ্রুজলে শয্যা ভিজিয়া গিয়াছে। সে বেচারা ত একেবারেই অবাক। একি ব্যাপার ? তোমার হইল কি, তুমি কাঁদ কেন ? আমি কি তোমার সঙ্গে কোন দুর্ব্যবহার করিয়াছি ?

বালামণি তখন একখানি হাতে তাহার গলা জড়াইয়া অপর হাতে বাসুদেবনের ডান হাতখানি ধরিয়া আপন মাথায় রাখিয়া বলিল ;—বল তুমি, আমার মাথায় হাত দিয়া, ভগবানের নামে শপথ করিয়া বল, তুমি কখনও আত্মহত্যা করিবে না !

বাসুদেবনের বুকের মধ্যেও এক প্রবল আলোড়ন আরম্ভ হইয়া গেল। সে মুখ তুলিতে পারিল না, মাথাটি নীচু করিয়া রহিল আর তাহার চক্ষু দিয়া টপ্‌টপ্ করিয়া জল ঝরিতে লাগিল।

বালা তাহাকে আর ছাড়িল না। নানামতে বুঝাইয়া-পড়াইয়া তাহার

সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করিল। তারপর যাহাতে তাহার সামাজিক মান-সম্ভ্রম বজায় থাকে, এমনি ব্যবস্থা করিয়া দিল। এই ব্যাপারের অল্পদিনের মধ্যেই তাহার জন্য একখানি নূতন বাড়ি খরিদ করা হইল এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চালাইতে পারে এমনই একটি ব্যবসায়ে তাহাকে লাগানো হইল। ইহাই হইল বাসুদেবনের উন্মাদ প্রেমের পরিণতি। আর বালার যে পরিবর্তন ঘটিল তাহাও অপূর্ব, এমনটি কেহ পূর্বে কল্পনাও করে নাই।

অপরূপ প্রেমের পরশ লাগিয়া,—সেই দিন হইতে তাহার রাত্রের ব্যবসা উঠিয়া গেল। ক্রিয়া-কর্মে অবশ্য ধনীলোকের ঘরে তাহার মুজরা হইত, কিন্তু টাকা দিয়া কেহ তাহার গৃহে আসিতে পাইত না। ক্রমে নিজ ব্যয়ে চলন্ত নাট্যশালা নির্মাণ করিয়া নাটক অভিনয় আরম্ভ হইল। নাটকাভিনয় উপলক্ষে তাহার নৃত্য ও সঙ্গীতের দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠা তাহাকে এমন ভাবে জনপ্রিয় করিয়াছিল, যাহা তাহার পূর্ববর্তী কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই।

* * * * *

এখন মাদুরা-নিবাসী একজন প্রত্যক্ষদর্শী শিল্পী শ্রীমান সুন্দর শর্মা, যাঁহার সঙ্গে এক সময় বালামণির পরিচয় হইয়াছিল এবং যাঁহার জীবনে বালামণির স্মৃতি অক্ষয় হইয়া আছে,—তাঁহার মুখে যেমন শুনিয়াছি বলিয়া বালার কাহিনী এখন শেষ করিব। তিনি বলেন,—

যখন বালামণির বয়স আন্দাজ ত্রিশ বৎসর, তখন আমরা মাদুরাতে আসিয়াছিলাম, সে-সময় আমরা স্কুলে এন্‌ট্রান্স ক্লাসে পড়ি। প্রথম প্রথম আমরা তাহার কথা জানিতাম না। একদিন সকালে দেখি, রাজপথ লোকে লোকারণ্য। শুনিলাম, আজ বালামণি মন্দিরে দেবদর্শনে যাইতেছে। কৌতূহলবশে আমরাও দাঁড়াইয়া গেলাম।

কিছুক্ষণ দাঁড়াইবার পর দেখি, আগে তিন চারিটি সখী, তাহার পশ্চাতে একটি অপরূপ শ্যামাঙ্গিনী নারীমূর্তি। অগ্রবর্তী সকলকার বর্ণ উজ্জ্বল, হাসিয়া-ঢলিয়া, নানাভাবে অঙ্গ দোলাইয়া কত কথা কহিতে কহিতে তাহারা চলিতেছে, কিন্তু পিছনের মূর্তিটি ধীর, স্থির, নিঃশব্দ গম্ভীর পাদক্ষেপে চলিতেছে, কাহারও দিকে না দেখিয়া, কেবল নিম্নদৃষ্টিতে পথ দেখিয়া চলিতেছে। শ্যামা হইলেও তাহার মুখশ্রী ও লাবণ্য অপরূপ। আমরা তাহার গাম্ভীর্য দেখিয়া মুগ্ধ এবং শ্রদ্ধায় পূর্ণ হইয়াছিলাম। বলিতে হইবে না যে মন্দিরে আজ অসম্ভব ভিড় হইয়াছিল। যেদিন সে যাইত, এরূপই হইত।

ঐ ভাবে তাহাকে দেখিয়া আমার আগ্রহ বাড়িয়া গেল। দুই বন্ধু, কেশররঙ্গ ও আমি উভয়েই স্থির করিলাম, আজই তাহার অভিনয় দেখিতে যাইব। আট আনার জায়গায় খুব সকাল সকাল গিয়া বসিলাম। অবশেষে যখন যবনিকা উঠিল, তখন প্রথমটা হতাশ হইলাম। দুজন কালো কালো বিশ্রী চেহারার স্ত্রীজাতীয় জীব নাচিতে নাচিতে আসিয়া গান ধরিল, দেখিয়া-শুনিয়া আমরা অস্থির হইয়া উঠিলাম।

তাহাদের কাজ হইয়া গেল, তার পর যে আসিল, তাহাকে অপ্সরা ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। সকলেই বলিতে লাগিল, এই-ই বালামণি। সকালে

মন্দির পথে যাহাকে দেখিয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে ইহার কোন সৌসাদৃশ্যই নাই। কোন প্রকারে কাহারও চিনিবার শক্তি নাই যে, ইহারা একই ব্যক্তি। যাই হোক, সে রাত্রে গানের সঙ্গে নৃত্যে যে অদ্ভুত অভিনয় দেখিলাম, জীবনে তাহা ভুলিতে পারিব না। তাহার মধ্যে ছিল, মহাশক্তিশালী কলাবিদ্যার উৎস, নৃত্য ও গীতের আকারে বাহির হইয়া আমার মধ্যে সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া দিল। তখন হইতেই আমার অস্তিত্ব যেন বদলাইয়া গেল।

দ্বিতীয়, তৃতীয় দিন তাহার কলাভিনয় দেখিবার পর কেমন করিয়া বালামণির কাছে যাওয়া যায়, কি উপায়ে আলাপ-পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার কথা শুনা যায় কেশরের সঙ্গে এ সম্বন্ধে বহু আলোচনাই হইল। কি জানি, তাহার কাছে যাইয়া অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে কেন প্রাণ এতটা ছটফট করিতেছিল। কেশরের কিন্তু আমাপেক্ষা এ বিষয়ে উৎসাহ বেশী ছিল না, যদিও উপায়ের মতলবটা তাহার মাথা দিয়াই বাহির হইয়াছিল। পর দিন কেমন চমৎকার অভিনয় করিয়া আমরা ঐ প্রসিদ্ধ অভিনেত্রীর স্নেহ ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলাম, তাহাই বলিতেছি,—যদিও সে সব কথা এখন আলোচনা করিতে লজ্জার সীমা থাকে না।

বড় রাস্তার উপর প্রকাণ্ড একখানি বাড়িতে বালামণি থাকিত। খুব উঁচু ভিত তার, রাস্তার উপর হইতে এক মানুষ উঁচু হইবে। খুব বড়, প্রকাণ্ড কাঠের উপর সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত তাহার প্রধান দরজা, দুই ধারে লম্বা বারান্দা, তাতে সারি সারি কাঠের থাম, তার মধ্যেও বিচিত্র কারু,—আমাদের দক্ষিণ দেশের বড়লোকদের বাড়ি যেমন হইয়া থাকে। প্রতিদিন বৈকালে স্নানান্তে মনোহর বেশভূষা করিয়া সে বাহিরে একখানা উঁচু চৌকির উপরে আসনে আসিয়া বসিত। অনেকক্ষণই বসিত, রাস্তায় লোক-চলাচল দেখিত, তার পর উঠিয়া অভিনয়ে চলিয়া যাইত।

সময় বুঝিয়া আমরা দুজনে ঠিক তাহার সম্মুখে রাস্তায় আসিয়া পেঁৗছিলাম, তখন সে তাহার স্থানটিতে বসিয়া আছে। সহজেই তাহার দৃষ্টি পড়ে, এমন এক স্থানে আসিয়া কেশর হঠাৎ যেন টক্কর খাইয়া পড়িয়া গেল। সে দেখে নাই, একটা ঘোড়ার পায়ের ভাঙা নাল সেখানে পড়িয়াছিল, সেটা ফুটিয়া তাহার চোটটা একটু বেশি রকমই হইয়া গেল ; তা ছাড়া রাস্তার পাথরে ছড়িয়া এক জায়গায় রক্ত পড়িতেছিল। কেশরের পড়াটা বালামণি দেখিতে পাইয়াছিল, তার পর রক্ত দেখিয়া সে, হায়, হায়, করিতে করিতে চঞ্চলপদে একেবারে নিকটে আসিয়া কেশরের দুই বাহু মূলে দুই হাত দিয়া তাহাকে একেবারে তুলিয়া দাঁড় করাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, চলিতে পারিবে কি তুমি?

ততক্ষণে তাহার ভৃত্যও আসিয়া পড়িল এবং তাহার আজ্ঞায় কেশরকে কোলে তুলিয়া তাহার দাওয়ায় আনিয়া বসাইয়া দিল। তৎক্ষণাৎ জল আনাইয়া রক্ত ধোয়া মুছানো হইলে, তাহার দাসীকে একটা কি আনিতে বলিল। কাঁচের কৌটায় দাসী যাহা লইয়া আসিল, তাহা কেশরের পায়ে ক্ষত স্থানে লাগাইয়া নিজ হাতে পটি বাঁধিয়া দিল। দেখিলাম, নিজের হাতে কাজ করিতে তাহার কি অপূর্ব মনোযোগ, এত যত্ন আমি দেখি নাই। তার পর আমায় বলিল,

তুমি ঐ আঘাতের চারিদিকে একটু হাত বুলাইয়া দাও, ক্রমে একটু জোর দিয়া টিপিতে থাক, খুব শীঘ্রই যন্ত্রণা কমিয়া যাইবে। নিজে সর্বক্ষণ পাখা হাতে বাতাস করিতে লাগিল! কেশর অল্পক্ষণেই সুস্থ হইয়া উঠিল। তাহার মুখে একটা সহজ আনন্দ লক্ষ্য করিয়া বালামণি তখন আমাদের সঙ্গে কথা শুরু করিল ; আমি ইহাই চাহিতেছিলাম।

আমরা কে, কোথা থাকি, কি করি, কতদূর পড়িয়াছি ;—প্রতিবৎসর মন দিয়া রাত জাগিয়া পড়ি কিনা,—আমাদের স্বভাব প্রকৃতির খুঁটিনাটি প্রশ্ন করিয়া জানিয়া লইল। এই সব এক পালা হইয়া গেলে—আমরা তাহার কি কি অভিনয় দেখিয়াছি—তারপর কোনটা ভাল লাগিয়াছে জিজ্ঞাসা করিল। প্রশ্ন করা মাত্রই আমি বলিলাম, দশাবতার নাটক এবং তাহার নাচটা সারাজীবন দেখিতে পাইলেও সাধ মিটিবে না। শুনিয়া সে খুবই খুশী হইল। তারপর সে কৌশলে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিল, অর্থাৎ সে জানিতে চায় আমাদের জীবনে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য গড়িয়া উঠিয়াছে কিনা,—কিন্তু আমরা বিশেষতঃ আমি, তখন খুব স্ফূর্তি ও সহজ জীবনযাত্রার অনুরাগীই ছিলাম, কাজেই সে উত্তরে কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া আপন মনেই বলিতে লাগিল ঃ

মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া কি হইল যদি মানুষের দুঃখ কিছুমাত্র দূর করিতে না পারা যায়। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা উপার্জন করিয়া,—নিজের ভোগে ও আপন জনের সঙ্গে সুখের সাগরে ভাসিয়া এতটা দুর্লভ এই মানব জীবন শেষ করিলেই বা কি হইল, যদি কারো দুঃখ দূর করিতে না পারিলে ? যে যেমনই অবস্থায় থাকুক না কেন তাহার দ্বারা সমাজের সেই স্তরের মানুষের উপকার অন্ততঃ কিছু-না-কিছু হওয়া চাই। এই মনোভাব, মানুষের উপকার করিবার উদ্যমই মানুষ-সমাজে একজনকে বড় করে,—এ কথা যেন আমরা কখনও না ভুলি! বালামণি পুনঃ পুনঃ একথা আমাদের সেদিন বলিয়াছিল।

আমাদের তখন নবীন উৎসাহে প্রাণ পূর্ণ। একে আমাদের অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে,—তাহার উপর বালার অমৃতপূর্ণ কণ্ঠস্বর—তাহার সেই মিষ্ট কথার মধ্যে এমন একটা মাদকতা ছিল যাহার প্রভাবে আমাদের বিহ্বল করিয়া দিল। আমি বলিয়া ফেলিলাম,—তুমি একটি' দেবী—তোমার দর্শনে আমাদের জীবন ধন্য হইয়াছে।

শুনিবামাত্র বালা দুই কানে হাত দিয়া দাঁতে জিভ কাটিয়া বলিল—ছি, ছি, অমন কথা কি আমাদের বলিতে আছে! আমরা দেবীর দাসীর দাসী, আমাদের মত ক্ষুদ্রমনা মানুষে কি কখনও দেবী হইতে পারে? দেবীর দাসী হইয়াই আমাদের জন্ম সার্থক। জন্ম জন্ম তাঁর দাসী হইয়াই থাকিতে চাই, আর কিছু চাহি না।

ক্রমশঃ সময় হইল, বালা অভিনয়ে যাইবে দেখিয়া আমরাও উঠিলাম। একখানা জাটকা গাড়ি আনাইয়া তাহার ভাড়া গাড়িওয়ালাকে দিয়া দিল। আর আমাদের দুইজনকে দুইখানি সারা সিজন দুই টাকা সিটে বসিয়া তাহার অভিনয় দেখিবার টিকিট উপহার দিয়া বিদায় দিল। এইভাবে তাহার স্নেহের পরিচয় আমরা এক সময় পাইয়াছিলাম।

তীক্ষ্ণাগ্নি

বলরামপুরের মহেন্দ্র কবিরাজ ছিলেন ধন্বন্তরি। দূর দূরান্তের বড় বড় জমিদার, রাজা-মহারাজা, নবাব হইতে আরম্ভ করিয়া নিজ স্থানের সাধারণ গৃহস্থ, এমন কি গরীব প্রতিবেশীর ঘরেও তাঁহার খ্যাতি এবং অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। শুধু রোগমুক্তি নয়, দুঃখীর দুঃখ দূর, অভাবগ্রস্ত একজনের অভাব মোচন, এইরূপ কোন না কোন ভাবে উপকৃত নয় তাঁহার প্রতিবেশীর মধ্যে এমন লোক বড় অল্প ছিল। তিনি ছিলেন মহাশক্তিশালী ব্যক্তি, চার হাত দীর্ঘ শরীর, সেই অনুপাতেই প্রশস্ত,—শালপ্রাংশু মহাভুজ যাহাকে বলে তাহাই ; শত সহস্র জনের মধ্যে চিহ্নিত ব্যক্তি। সবার মাথার উপর তাঁহার মাথা অনেক দূর হইতেও নজরে পড়িত ;—তাঁহার দৃষ্টিও ছিল সুদূরপ্রসারী। আবার এদিকেও তিনি তান্ত্রিক সাধক, অনেকেই তাঁহাকে কৌল বলিয়া ভক্তি করিত, যাহারা তাঁহার সে পরিচয় জানিত না, কতকটা ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধায় তাহা পূরণ করিত। তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছিল অসাধারণ, সদানন্দময় পুরুষ ছিলেন তিনি। কেহ তাঁহার ব্যক্তিত্বের গণ্ডির মধ্যে আসিয়া পড়িলে তাহার অন্তরে দুঃখ, অবসাদ বা কোনরূপ দুর্বলতা তিষ্ঠিতে পারিত না। রুগ্ন ব্যক্তির নিকটে আসিলে—রোগীর মধ্যে আশা ও উৎসাহ যুগপৎ ক্রিয়া করিত, আরোগ্য নিকট বোধ হইত।

তাঁহার সংসারের আয়তন ছিল বিশাল ;—বহু আত্মীয় কুটুম্ব পরিবৃত হইয়া তিনি বাস করিতেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী ছিল না। একমাত্র কন্যা রাখিয়া তাঁহার সহধর্মিণী আজ প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পরলোকে ;—তখন হইতে ঐ কন্যাই একমাত্র অবলম্বন। অপূর্ব বিধাতার বিধান,—ঐ কন্যাটির জন্য স্বজাতীয় একটি সুদর্শন যুবা-পাত্রকে দীর্ঘকাল ঘরে রাখিয়া, তাহাকে শিক্ষা দিয়া উপযুক্ত হইলে যথাকালে শুভলগ্নে কন্যাটির বিবাহ দিয়াছিলেন। ছয় সাত বৎসরে তাহাকে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে দক্ষ এবং সুচিকিৎসক করিয়াও তুলিলেন। তাহাদের একটি পুত্রও হইয়াছিল। এই পুত্রটি জন্মগ্রহণের পর মাত্র দুই বৎসর সংসারে আনন্দের হাট পূর্ণরূপেই বিদ্যমান ছিল,—তাহার পরেই বিসূচিকা রোগে জামাতার মৃত্যু হইল ; কন্যাটি বিধবা হইল। এ আঘাত কিভাবে কবিরাজ মহাশয় সহ্য করিলেন তাহার বিবরণ সাধারণের অজ্ঞাত। তবে, তাঁহাকে নিত্য এবং নিয়মিত কার্য হইতে পশ্চাৎপদ অথবা তাঁহার কর্মধারায় ব্যতিক্রম কেহ দেখে নাই। কিন্তু, সবাই, যাহারা তাঁহার নিকটেই থাকিত তাহারা জানিত যে স্ত্রী বিয়োগের তুলনায় এ আঘাত বহু পরিমাণে গভীর হইয়াছিল। তাঁর বাহ্য ব্যবহারে ক্রমে এইটুকুই দেখা গেল যে তিনি নিজ ভোগাদি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় পরার্থেই জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন।

কন্যার নামটি ছিল অম্বা,—বালিকা কাল হইতেই অম্বা অতীব স্বল্প-ভাষিণী এবং স্বাস্থ্যবতী ; তাহার মধ্যেও একটি ব্যক্তিত্ব ছোট বেলা হইতেই

স্বজনবর্গের লক্ষ্যের বিষয় হইয়াছিল। সর্ব বিষয়ে পিতার সেবা ও সহায়তায় অগ্রণী, পিতার সঙ্গে সর্বক্ষণ থাকিয়া, সহজেই সে এই বয়সে অসাধারণ চিকিৎসা নৈপুণ্য অর্জন করিয়াছিল। কবিরাজ মহাশয় আজ কাল গৃহে কোন বিচিত্র রোগী পাইলে আগে অম্বাকে পরীক্ষা করিতে বলিতেন। এইভাবে অম্বার অভিজ্ঞতা বাড়িতেছিল। একজন রোগীকে রোগমুক্ত করিবার তাহার আগ্রহ ছিল অসাধারণ। এমন এক-একটি কঠিন রোগে এমন সহজ প্রতিকার সময় সময় অম্বার বুদ্ধিতে বাহির হইত যাহা দেখিয়া কবিরাজ মহাশয় বিস্মিত হইয়া যাইতেন। কন্যাটির আরও একটি বিশিষ্ট গুণ ছিল—বাড়িতে অতিথি ভিখারী যে কেহ আসুক না কেন তাহার স্বাস্থ্যের প্রতি অম্বার দৃষ্টি সবার আগে। কিভাবে, কাহার মধ্যে কোন্ রোগের সূত্রপাত হইয়াছে, সেদিকে অম্বার ঠিক নজর থাকিত। অক্ষমকে ঔষধ, পথ্য, সকল কিছু দিয়া শুধু বিদায় নহে, মধ্যে মধ্যে আসিয়া অম্বাকে তাহার অবস্থা দেখাইয়া যাইতে হইত। যতক্ষণ না রোগমুক্তির লক্ষণ দেখা যাইত ততক্ষণ তাহার অব্যাহতি ছিল না। অম্বার দাতব্য ব্যবস্থায় কবিরাজ মহাশয়ের অনেক ঔষধ এবং পথ্যাদিতে বেশ কিছু অর্থব্যয় ছিল। তাঁহার ঘরে অর্থের অভাব ছিল না। তখনকার দিনে নিজ দেশে বড় বড় ধনবানের ঘরে চিকিৎসা করিয়া প্রভূত ধনসম্পত্তি উপার্জন করিতেন। কোন বিষয়েই অপ্রতুল ছিল না। কবিরাজ মহাশয়ের গোপন দানও কম ছিল না, অবশ্য সে সকল অর্থের হিসাব কখনও খাতায় উঠিত না। তাঁহার লোক কল্যাণের প্রবৃত্তি উত্তর উত্তর বাড়িতেই ছিল। যেখানে সাধারণ চিকিৎসায় ফল পাওয়া যাইত না বা ঔষধ কার্যকরী হইত না সেখানে গভীর তপঃশক্তি অথবা অধ্যাত্মশক্তি প্রয়োগ করিয়া এমন অনেক রোগীকে বাঁচাইয়াছেন। এই সকল কারণে লোকে জানিত এবং বিশ্বাস করিত, কোন প্রকারে একবার তাঁহার হাতে পড়িলে রোগীর আরোগ্য অবধারিত। তাঁহার হাতে রোগী কখনই মরিবে না।

প্রায় পঁচাত্তর বৎসর যখন তাঁহার বয়স, তখনও তিনি চার পাঁচ ক্রোশ হাঁটিতেন। নিত্য প্রাতে, সূর্যোদয়ের চারদণ্ড পূর্বেই বাহির হইয়া বড় গাঙের ধার পর্যন্ত হাঁটিয়া যাইতেন একদিনও বন্ধ যাইত না। অম্বাও কখন কখন তাঁহার সঙ্গী হইত। বৈধব্যের পরে উহা নিয়মিত হইয়াছিল। কিন্তু পিতা-পুত্রীর একই বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, পথে দুর্বল-শরীর রুগ্ন কাহাকেও দেখিলে রক্ষা ছিল না। নিশ্চিত তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়িতে আনা হইত। এইভাবে প্রত্যহই অনেকগুলি রোগীর চিকিৎসা চলিত। ঔষধপথ্য অনেকেই লইয়া যাইত,—আট দশটি রোগী বাড়িতেও থাকিত। ঘরেতে তাঁহার ছাত্র সংখ্যাও কম ছিল না, প্রায় পনেরো যোলটি বিদ্যার্থী, ছাত্রগণ নিজ গৃহের মতই প্রতিপালিত হইত। তখনকার দিনে তাঁহার আয়ুর্বেদে সার্বভৌমিকতা বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতেই কবিরাজ মহাশয়কে দূর দূরান্তরে চিকিৎসার জন্য যাইতে হইত।

তাঁহার দূর গমনের উপলক্ষ ঘটিলে কন্যা অম্বার উপরই সংসারের সকল

কিছুই ভার পড়িত। অবশ্য যখন তিনি থাকিতেন তখনও ঐ অম্বাই সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী।

একবার এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটিল। কবিরাজ মহাশয় কোথায় অনেক দূরে এক নবাব পরিবারে চিকিৎসায় গিয়াছিলেন ফিরিবার ঠিক ছিল না। তাহার সংসারের যাহা নিয়ম,—যে যে ক্রিয়াকর্ম বিধিবদ্ধ ছিল, তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাহার কোন ব্যতিক্রমের জো ছিল না। অম্বার সব কিছুই জানা ছিল।

এখন সেদিন একপ্রহর বেলা হইয়াছে এমন সময় ভৃত্য আসিয়া খবর দিল যে একজন আসিয়াছে সে খাইতে চায়। সে একবার আপনার কাছে তাহার কথা আমাকেই বলিতে বলিতেছে, আবার বলিতেছে তুমি আমায় তাঁর কাছে নিয়ে চল। যেন পাগলের মতই আকার প্রকার।

অম্বা প্রথমে জিজ্ঞাসা করিল, সে কে, আগে সে এসেছিল কি না এবং কোথা হইতে আসিয়াছে। উত্তরে ভৃত্য বলিল, সে ব্রাহ্মণের ছেলে,—আর কিছু বুঝা যায় না। তবে দূর গ্রাম হইতেই আসিতেছে, আগে তাহাকে এ অঞ্চলে দেখা যায় নাই। লোকটার অদ্ভুত চেহারা, বড় ভয়ানক কিন্তু—

অম্বা তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিল বটে কিন্তু তাহার কাছে উপস্থিত হইল না। আড়াল হইতে দেখিল। বয়স লোকটির বেশী নয় ছাব্বিশ আঠাশ বৎসর হইবে। শীর্ণকায়, সরু সরু হাত পা প্রায় কঙ্কালসার মূর্তি, পেটটা কিন্তু খুবই বড়, যেন প্লীহা যকৃতের অসাধারণ স্ফীতি। চামড়া কুঁচকাইয়াছে একজন অশীতিপর বৃদ্ধের যেমন হইয়া থাকে। মাথার চুলগুলি বহু কাল তৈলবিহীন রুক্ষ, ধুলায় ধূসরিত, খাবলানো খাবলানো কিম্ভূত কিমাকৃতি। গায়ের রং একসময়ে উজ্জ্বল ছিল এখন ম্লান, তাহার উপর এক পরত পুরু ময়লা জমিয়া আছে। পরনে একখানি ময়লা, লাল পাড় খাটো কাপড়, গায়ে সেইরূপ ময়লা চাদর, পায়ে ধুলা, অল্প অল্প ফুলাও বোধ হয়।

অম্বা অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া তাহাকে দরজার আড়াল হইতেই দেখিল, তারপর ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বসিতে বলিল। সে বসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি অসুখ বলো তো। অম্বাকে দেখিয়াই প্রথমে সে একটু সঙ্কুচিত হইয়াছিল, এখন সে আবার দাঁড়াইয়া উঠিল, বলিল, কৈ আমার দেহে কোন অসুখ নেই তো।

অম্বা বলিল, তাহলে তোমার শরীর এমন কেন?

আমার শরীর তো বরাবরই এই রকম,—তবে আজকাল সবাই বলে, আমার খাওয়াটা একটু বেড়েচে, খাই আমি একটু বেশি। তারপর একটু থামিয়া বলিল, আজ আমি আপনাদের অতিথি, আমি খাবো এখানে।

অম্বা তৎক্ষণাৎ বলিল, বেশ তো, ভাল কথা, তুমি আজ এখানে খাবে তাতে আর হয়েছে কি। আচ্ছা এই খাওয়াটা বেড়েছে তোমার কতদিন মনে হয়? সে বলিল, তা বোধ হয় দু'বছর হবে।

আচ্ছা, কতটা বেশী খেতে পারো তুমি,—বলতো শুনি।,

এই প্রশ্ন শুনিয়া সে বিরক্ত হইল, বলিল, তা পরিমাণ আগে থেকে না জানলে খেতে পাওয়া যাবে না এমন কথা আছে নাকি?

অম্বা বেশ বুঝিতে পারিল যে তাহার সন্দেহ হইয়াছে পাছে বা এই ভোজনটা ফস্‌কাইয়া যায় অতিরিক্ত পরিমাণের কথায়। হাসিয়া সে বলিল, তোমার খাওয়া ঠিকই হবে,—তবে পরিমাণের কথাটা জানতে পারলে আয়োজনের সুবিধা হয়, এই আর কি।

শুনিয়া সে বুঝিল, এবং প্রফুল্ল মুখেই বলিল,—তা অনেক খেতে পারি, দু'তিন জন সাজোয়ান মরদের ভাত খেতে পারি, ভালো তরকারী পাতি থাকলে আরও বেশি খেতে পারি।

এবার অম্বা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা তোমার যখন খিদে পায়, পেটের ভিতর আগুনের জ্বালা—যেন জ্বলে গেল এমন বোধ হয় কি? শুনিবামাত্রেই সে বলিল,—ঠিক ঠিক ঐ রকমই হয় তো,—

আচ্ছা, তার পরেই নাড়িগুলো খামচে ধরে এমন একটা যন্ত্রণা বোধ হয় কি?

হাঁ হাঁ ঠিক ঐ রকমই হয় বটে তো—

শুনিয়া অম্বা আবার বলিল, আর একটা বলতো, আচ্ছা, মাঝে মাঝে একটা কিছু তালগোল পাকিয়ে যেন নীচে থেকে উপর দিকে ঠেলে ঠেলে ওঠে কি?

ঠিক তো গো,—তাই তো হয়,—ঐ দেখ ঐ দেখ। এই রকমই হচ্ছে এখন ঐ দেখো। বলিয়া সে কসি খুলিয়া দেখাইল। অম্বা দেখিল, বিশেষ লক্ষ্য করিয়াই দেখিল। তারপর বলিল, এখন বলতো, তোমার কি খেতে ইচ্ছা হয়, ভাতের সঙ্গে ডাল, তরকারী, মাছ, দুধ, পরমান্ন কি খেতে ইচ্ছা হয় মনের কথাটা খুলে বলো তো বাপু। তুমি যা চাইবে তা-ই হবে। তুমি নিঃসংকোচেই বলো।

এইবার সে যেন ভরসা পাইল,—অকপটেই বলিল, হেঁ হেঁ কি জানেন অনেক দিন থেকেই আমার মাংস খেতেই বড় ইচ্ছা। জোটেনি এতদিন কেউ দেয় নি তাই আর কাকেও বলি না;—আজ আপনি জিজ্ঞাসা করলেন তাইতো বললাম।

অম্বা তাহার কথা শুনিয়া ব্যথিত হইল, শেষে বলিল,—বেশ,—তাই হবে তুমি কচি পাঁঠার মাংসই খাবে কেমন? তবে বুঝতেই পারো যোগাড়যন্ত্র করতে একটু সময় লাগবে,—তুমি ততক্ষণ বাইরের ঐ চালায়, যেখানে ওরা ওষুধ কুটছে ঐখানে থাকো বা বাইরে একটু ঘোরাফেরা করো, দেখো শোনো এখানকার কাজ; রান্না হয়ে গেলেই তোমায় ডাকা হবে।

সে চলিয়া গেলে তখন অম্বা ওখানকার ভারপ্রাপ্ত কবিরাজ মহাশয়ের প্রধান ছাত্র রেবতীমোহনকে ডাকাইয়া তাহাকে বলিল, ঐ একজন রোগী এসেছে দেখেছ, রোগ ওর নির্ণয় করে ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। বেশ করে দেখো ওকে। তারপর কি বুঝেছ আমায় বলবে। কেমন? সে স্বীকার করিল, বলিল, বেশ।

ভিতরে আসিয়া—একটি পাঁঠা কাটাইয়া আলাদা কিভাবে রাঁধিতে হইবে সেবিষয়ে উপদেশ দিয়া সে একজন বিশ্বস্ত ভৃত্যকে গোপনে ডাকিয়া লইয়া

গেল, এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক কিছু শিখাইয়া পড়াইয়া যখন অম্বা বুঝিল যে তাহার উদ্দেশ্য ঠিক ধরিতে পারিয়াছে তখন তাহাকে বলিল,—যখন তাহার জন্য সব কিছু প্রস্তুত সম্পূর্ণ হইবে তখন অতিথিকে স্নান করিতে বলিবে, যদি সে আপত্তি করে তাহাকে বলিবে যে এখানে স্নান না করিয়া খাইবার নিয়ম নাই, অতএব তাহাকে স্নান করিয়াই ভোজনে বসিতে হইবে। ভৃত্যকে সকল কিছু উপদেশ দিয়া অম্বা বাহিরের একটা ঘরে একখানি তক্তার উপর মাদুর তারপর বিছানা বালিশ প্রভৃতি দিয়া পরিপাটি শয্যা রচনা করাইয়া,—নিশ্চিন্ত মনে আপন কর্মে মনোনিবেশ করিল। ভোজনের পর অতিথি এইখানে বিশ্রাম করিবে বুঝিয়াই ভৃত্যেরা সব কিছুই আজ্ঞা মত সমাধা করিল। তাহারা গৃহ-কর্ত্রীকে ভালই জানিত।

ইতিমধ্যে একবার রেবতীকে ডাকিয়া অম্বা জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, রোগী দেখলে কেমন? কি বুঝলে?

সে বলিল, ওর প্লীহা যকৃৎ দুইই বিকৃত, এমনকি অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে ওর প্রতিবিধান নেই। শেষ অবস্থা বোধ হয়। শুনিয়া অম্বা বলিল, তা হ'লে অত ভোজন, খাদ্য পরিপাক হচ্ছে কি করে। এখন রেবতী বলিল, কি জানি, এ এক অদ্ভুত রোগ আগে কোথাও এমন দেখিনি।

যাহা হউক এই নবীন অতিথির জন্য রান্না শেষ হইতে বেলা আড়াই প্রহর হইয়া গেল। এইবার তাহাকে ডাকানো হইল। কিন্তু স্নান তাহাকে কিছুতেই করানো গেল না। যতই অনুরোধ করা হয় ততই সে প্রতিবাদ করিয়া বলে স্নান করলে মরে যাবো, এক দিন খাইয়ে কি আমায় মারবেন আপনারা?

অন্দরের পথে এক জায়গায় ঠাঁই হইয়াছে একখানা প্রকাণ্ড কলা পাতাকে চার টুকরা করিয়া বেশ বড় একটা পাত্র, তাহার উপর অন্ন স্তূপাকার। তাহার চার ধারে কিছু কিছু ব্যঞ্জন,—আর আসল উপকরণ একখান কাঁসার গামলায় একটি মাঝারি পাঁঠার মুণ্ডটি বাদে সবটুকুই রান্না হইয়াছে। যে কড়ায় রান্না হইয়াছে সেটিও সেখানে রাখা আছে তাহাতে কিছু মাংস এখনও রহিয়াছে, যদি দরকার লাগে। এই প্রকার ব্যবস্থা দেখিয়া তাহার আনন্দের সীমা নাই। যখন সে আসনের উপর বসিল,—কিছু দূরে সামনেই একখানা প্রকাণ্ড মান-পাতায় কি যেন একটা বস্তু ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে।

ভোজনার্থ যখন তাহাকে বাহির হইতে ডাকিয়া আনিল. অন্ন দেখিয়া তখনই তাহার মুখের শ্রী পরিবর্তিত হইয়া আর একরকম হইয়া গেল। চক্ষু বিস্ফারিত হইল, তাহাতে যেন এক অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করা গেল। একখানি কাঠের পিঁড়ি পাতা, পার্শ্বেই এক ঘটি জল। সে বসিল এবং গণ্ডূষ না করিয়া এমন কি হাতটা পর্যন্ত না ধুইয়া গম্ভীরভাবেই খাইতে আরম্ভ করিল। কাছে কেহ নাই,—একটু দূরে কেবল মাত্র অম্বা একখানি পাখা হাতে একটি আসনে চুপটি করিয়া বসিয়া গভীর মনোযোগের সহিত তাহার খাওয়া দেখিতেছিল। অতিথি ক্রমে ক্রমে সমস্ত অন্ন এবং সকল রকমের উপকরণ সমেত মাংসের গামলাটিও শেষ করিল। তাহার উদরের যে অস্বাভাবিক স্ফীতি হইল, তাহা দেখিয়া ভয় হয়।

এখন অম্বা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—আর চাট্টি ভাত নেবে কি? সে অম্লান বদনে বলিল, হাঁ ঐ কড়ার মাংসটুকু দিয়েই খাবো। পূর্ণ এক হাঁড়ি ভাত খাওয়ার পর—আরও ভাত লইয়া সে কড়ার মধ্যেকার সেই অবশিষ্ট মাংসটুকু অবলম্বনে খাইয়া যখন সোজা হইয়া বসিল তখন তার শরীর আইঢাই করিতেছে। সে বলিল, এমন তৃপ্ত করে কখনও খাই নি। সে যখন শেষ গ্রাসটা মুখে তুলিতেছিল,—তাহার পাতের উপর সুপারীর মতই ছোট একটি পিণ্ডাকার পদার্থ গড়াইয়া আসিল। সে অতটা লক্ষ্য করে নাই দেখিয়া অম্বা বলিল,—ওটা কি বলো দেখি?

এখন তাহার লক্ষ্য হইতেই সে খপ করিয়া উহা তুলিয়া লইল। এখন অম্বা বলিল, শুঁকে দেখো দিকি। বলিতেই সে উহার ঘ্রাণ লইল, সঙ্গে সঙ্গে মুখটা তার বিকৃত হইল এবং গা বমির ভাব অনুভব করিল। এমন সময়ে তাহার সেই ভৃত্যটি আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া অম্বা বলিল—হাঁরে তুই এটা কিসের মাংস কেটে রাঁধতে দিয়েছিলি?

সে বলিল, ওখানে একটি ঘেঁয়ো কুকুর ছিল তাকে কেটে তার মাংসই এর জন্য রান্না করতে দিয়েছিলাম। এই দেখুন না,—বলিয়া দূরে সামনে রাখা মান পাতার ঢাকা উপরে তুলিয়া কুকুরের কাটামুণ্ডটা দেখাইল, আবার কান ধরিয়াই উহা উঠাইয়া অতিথির পাতের উপর ফেলিয়া দিল।

এবার অতিথির মুখখানা খুব বেশী বিকৃত হইল সঙ্গে সঙ্গে,—এ্যাঁ ঘেয়ো ঐ কুকুরের মাংস আমায় খাইয়েচ?

বলিতে বলিতে সে বমনের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া ঐখানেই হুড়-হুড় করিয়া বমন আরম্ভ করিল। এই ভাবে যাহা কিছু তার উদরে ছিল সবই উঠিয়া গেল। শেষে দেখা গেল এক গোছা মোটা-মোটা নাড়ির মত তার মুখ হইতে ঝুলিতে লাগিল, প্রত্যেকটা এক হাত লম্বা। তৎক্ষণাৎ অম্বা উহা সবলে টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিল। অতিথি ততক্ষণে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেছে। এধারে রেবতী ও ছাত্রেরাও সবাই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ভৃত্যের সাহায্যে তার মুখ ধোয়াইয়া তাহাকে সেই ঘরের শয্যায় শোয়াইয়া, অম্বা আদেশ করিল, তাহাকে কেহ জাগাইবার চেষ্টা না করে। যতক্ষণ না তাহার জ্ঞান হয় ততক্ষণ কেহ যেন কাছে না যায় বা বিরক্ত করে।

এইবার রেবতীমোহন অম্বাকে জিজ্ঞাসা করিল, একি ব্যাপার, দিদি?

অম্বা বলিল, এটি বিষম ব্যাধি, বাবার কাছে শুনেছি এর নাম তীক্ষ্ণাগ্নি। পেটে ঐ একপ্রকার কৃমি জাতীয় জীব জন্মায়, সর্বভুক অগ্নির মতই শক্তি এদের—যা কিছু ভোজন, তা ঐ জীবেরই আহুতি স্বরূপ। শুনেছিলাম, বাবা একটি মাত্র রোগী পেয়েছিলেন! এর একমাত্র প্রতিকার রোগীকে কোন প্রকারে বমি করানো। যাকে করানো যায় সেই বাঁচে, না হলে বাঁচবার অন্য উপায় নেই। তিনি সেই রোগীকে যে যে উপায়ে বমনটা সম্ভব করেছিলেন আমায় সে কথা বলেছিলেন,—আমি ঠিক সেই সেই উপায়ে একে বমন করিয়েছি, মনে হয় এ বাঁচবে। নইলে তিন বৎসরের মধ্যে মৃত্যু অবধারিত—এর প্রায় দুই বৎসর হয়ে গিয়েছে।

* * * * *

এই রোগীকে পাঁচ বৎসর পর কেহ যদি দেখিত তাহা হইলে দেখিত, স্বাস্থ্যবান প্রিয়দর্শন রমাপতি, এখন কবিরাজ মহাশয়ের আশ্রমের একজন উদ্যমশীল আয়ুর্বেদের ছাত্র এবং মহেন্দ্র কবিরাজের অতিপ্রিয় দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। সর্বত্রই তাঁহার ভ্রমণসঙ্গী এবং সেবকরূপে কৃতিত্ব অর্জনে ব্যস্ত।

উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তাহার আমরা শুনিয়াছি। পরে রমাপতি পূর্ববঙ্গে একজন আয়ুর্বেদশাস্ত্রী কবিরাজরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার বহুতর ছাত্র এখনও বর্তমান।

হরি

বীরভূমে ছিল তাদের ঘর,—নামটি তার হরি,—পূর্ণ নাম হরিমতি। চৌদ্দ দিনের মেয়ে রেখে তার মা গেল মারা। তার মাসী এসে তাকে কোলে নিলে,—স্তন দিয়ে নিজের পেটের সন্তানের মতই তাকে করছিল মানুষ। এক বছরের মেয়ে যখন সে, মাসীও গেল তার মায়ের কাছে। পড়শী সকলে বললে, এ একটা রাক্ষুসী এয়েছে, একে মেরে ফেলাই ভালো। তারপর কিন্তু সে আর কাকেও মারলে না,—আপন ভাবেই বাড়তে লাগলো।

তার বাপ ভালো মানুষটি,—পুনরায় বিবাহ করেছিল হরির মাসী মারা যাবার ঠিক পরেই। হরি কিন্তু কখনও তাকে মা বলেনি যদিও মা বলবার জন্য চেষ্টা-যত্নও কম হয়নি। ঐ তোর মা, বোলে যখন কেউ তার বিমাতাকে দেখাতো সে ফ্যালফ্যাল করে খানিকটা তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতো,—চোখে চোখে মিললে মুখটি হেঁট করে একটু মুচকে হেসে সে খেলায় মন দিত। সে একটু বড় হলে যখন ঝুড়ি-ঝুড়ি পাকা কথায় সবাইকে অবাক করে দিচ্ছে তখন পড়শীরা কেউ যদি তাকে বলতো, হ্যাঁরে হরি! তু উয়ারে মা বলিস নাই কেনে, উ যে তোর মা হয়? তখন হাসতে হাসতে সে বলতো, উ কেন আমার মা হতে যাবেক? আমার মা যে মোর‍্যা গ্যাছ্যা, উ-যে আমার বাবার মেয়্যা। মেয়ে অর্থাৎ বৌ। কিন্তু তার আরও এইটুকু বিশেষত্ব ছিল, কখনও যদি তার বাপ বাইরে থেকে কারণ খেয়ে, তালে-বেতালে ঘরে এসে নূতন স্ত্রীকে ধরে প্রহার করতো, সে তখন তার বাপকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতো, আমার মাকে তো খেঁয়্যাচো, উয়ারেও খাও, আপদ চুকে যাক, কেনে?

ক্রমে ক্রমে সে হয়ে উঠলো এক বলবান,—মোটা-সোটা ধিঙ্গি-মেয়ে। গাছ কোমর বেঁধে সে পাড়ায় পাড়ায় বেড়ায়;—আর ঘরের কাজ? তার বয়ে গেছে। যেমন তেমন করে যেটুকু না-করলে নয় কেবল সেইটুকুর সঙ্গেই তার সম্বন্ধ। তিনটি প্রাণী তারা, কতই বা কাজ?

খাবার সে বাড়িতে প্রায়ই খায় না, ভাতটাও মাঝে মাঝে একরকম জোর করে পড়শী বাড়ি খেয়ে আসে। গ্রামে তাদের ভাতটা সস্তা নয় তা সেও বেশ জানে, কিন্তু, কারো কোন কথা কানে না তুলে সে ঠিক তার হিসাবমত নিজকর্ম

সম্পন্ন করে নেয়। যদি পড়শীরা কেউ কেউ বলতো, হাঁরে হরি! সৎমার হাতের ভাত ভাল লাগে না বটে? সে বোলতো—দূর, তা হবেক কেনে, ভাত ত আমার বাবার, উ তো তার বাপের ঘর হতে আনে নাই। বাড়িতে তার কোন উপদ্রবই নাই ;—যত কিছু উপদ্রব পাড়ায়।

গাছে গাছে পাখির ছানা খোঁজা,—তারপর কার গাছে কি ফল ধরেছে তাতে হরির তীক্ষ্ম দৃষ্টি থাকে। প্রতিবেশীরা বলে, তোর জ্বালায় ফল-মূল কারো গাছে পাকতে পায় না। কেউ বলে,—পোড়া মু তোর, তু দূর হ।—কেউ বলে, মুয়ে আগুন তোর, মরগা যা রাক্কুসী। কেউ বলে, তোর বুকে বাঁশ দিয়ে দলবো—কেউ বলে, ধিঙ্গীটা, দস্যিটা, হতভাগী মরে যা,—কেউ বলে, লক্ষ্মীছাড়া হাবাতে,—হাড় জ্বালানে মেয়্যা, চ্যান্দড়, এই সব। সে কিন্তু ওসব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। সারাদিন হুটোপাটি, দৌড়-ঝাঁপ করে ঘরে আসে সন্ধ্যায়,—তারপর দাওয়াতে খুটি ঠ্যাসান দিয়ে বসে যতক্ষণ না ভাত তৈরী হয় ;—শেষে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। একপাশেই রাত কাবার করে সক্কালে উঠেই তার নিত্য-কর্ম শুরু করে দেয়।

যাই হোক এইভাবে তার জীবনের চৌদ্দটি বছর যখন কেটেছে,—পাড়া পড়শীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র বা পরামর্শ করে তার বাবা ফাগুনের এক শুভদিনে নগদ দশটি রজত মুদ্রা, আর তার মায়ের হাতের সোনার রুলি দুগাছি দিয়ে হরিকে লাল চেলী পরিয়ে সম্প্রদান করে দিলে তৃতীয় পক্ষের এক সু-পাত্রের হাতে। পাড়ার যত এয়ো এসে শাঁক বাজিয়ে তাকে তাদের জাতে তুলে নিলে।

যিনি হরির পাণিগ্রহণ করিলেন, আর কিছু না থাক তার লম্বা শরীরের উপযুক্ত নামটি ছিল যা সকলকে চমৎকৃত করেছিল। বরকে বাসর-ঘরে যখন একটি বর্ষীয়সী জিজ্ঞাসা করলে, হেঁ গো বর! আমাদের হরিকে কতদিন বাঁচিয়ে রাখবে বল দেখি ভাই? তখন শ্রীমান সমরেন্দ্ররঞ্জন বিশ্বাস চৌধুরী মশাই একবার মুখখানি তুলে, চেষ্টা করে তাঁর সেই ঘোর লাল চক্ষু দুটি গহ্বরের ভিতর থেকেই যথাসাধ্য বিস্ফারিত করে ঐ বক্তার পানে এমনভাবে চাইলেন যেন তাঁর রক্ষা পাওয়াটা একমাত্র দৈব ব্যাপার ; তারপর ভাঙা ভাঙা বাজখাঁই আওয়াজে ;—দেখো! আমি একজন মরদ বটি, মেয়্যা লয়, মস্করা চলবেক নাই হেথাকে,—এই বোলে দিলাম ব্যস্,—এই উত্তর দিয়ে সকলকে স্তম্ভিত করে দিলেন। শুনা যায় বাবাজী যৌবনে অনেকদিন যাত্রাদলে ছিলেন।

বয়স তাঁর পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চান্নের মধ্যেই। দেহটি তাঁর যত লম্বা ততটাই রোগা, আবার ততটাই কালো, আবার ততটাই বাঁকা। ঘন ঘন কাঁচা পাকা কোঁকড়ানো বড় বড় চুলে মাথাটির মাঝখানটা ভরা, ঠিক মাঝে সিঁথি ; পিছনে আর দুই পাশ একেবারে কামানো, এক্কেবারেই হাল ফ্যাশান। দুদিকে কয়েক গাছা করে চুল আছে গোঁফে। অনেকটা দূরগহ্বর প্রবৃষ্ট চক্ষু দুটি করঞ্জ চেরা, প্রায়ই শিবনেত্র। ভ্রূতে চুল আছে কি নেই বুঝা মুশকিল, অনেক সময় চক্ষের গহ্বরের সঙ্গে উপর পাতার খাঁজটুকুই ভ্রূ মনে হয়। আঁখি-গোলকটি ঘোরতর রক্তবর্ণ, কারণ বাবাজীর অত্যধিক কারণাসক্তি। তান্ত্রিকেরা মদকে কারণ বলে, অনেকেই জানেন।

কোঁচার খুঁটটি গায়ে, খালি পা, বগলে যন্ত্র,—বীরভূমে মদের বোতলের তান্ত্রিক প্রতিশব্দ হলো যন্ত্র, অবশ্য যন্ত্রের অন্য অর্থও আছে,—হাতে ছাতা, গ্রামের পথে ঘাটে অথবা বাজার পানে তাঁকে দেখতেই সাধারণে অভ্যস্ত। এ ব্যাপারে সকল সময়েই তাঁকে নিঃসংকোচ দেখা যেতো। লজ্জা যে একমাত্র নারী জাতির অঙ্গের ভূষণ একথা তাঁর মত আর কেউ জানে না। এ হেন পুরুষত্ব-অভিমানী শ্রীমান সমরেন্দ্ররঞ্জনের বৃত্তির কথা কেউ জিজ্ঞাসা মাত্রেই এই উত্তর পেতো যে তিনি বাবুদের বাড়ির গোমস্তা। কিন্তু সেই বাবুদের অবস্থান যে কোথা তার ঠিকানা আজ পর্যন্ত কেউ জানে না—কেউ আবিষ্কার করতেও পারে নি, পারবেও না।

বিবাহের পরদিন তিনি হরিকে নিয়ে এলেন যেখানে সেটা বাবাজীর কনিষ্ঠা একমাত্র ভগিনীর স্বামীর ঘর। স্ত্রী পুরুষমাত্র, আর কেউ ছিল না সে-সংসারে। স্নেহময়ী ছোট বোনটি তার একমাত্র আপন জন,—তার নামটি চারুশীলা। সেই এখন হরিকে বরণ করে ঘরে তুললে। গোয়ালের পাশে একখানি ছোট ঘর,—ভাইয়ের জন্য রাখা আছে, রাতে-বেরাতে অদিনে অক্ষণে এলে সেইখানেই থাকতো ; এখন সেইটিই হলো হরির ঘর। ননদটি তার ভাল চোখেই দেখেছিল তাকে, বরণ করে তুলবার সময়ে সে হরিকে বোললে,—এবার তোমার পালা, হেথা কেনে মরতে এলে ভাই ? শুনে মুখরা হরি, ফিক্ করে একটু হেসে বললে,—আমু ত আপুনি আসি নাই,—নিয়ে এলে কেনে তুমরা ? যাই হোক এখানে নূতন এক অভিজ্ঞতার পূর্বাভাষ ; হরি এক নূতন জীবনের আভাষ পেতে উন্মুখ হয়েই রইলো।

এখানে এসে দুই একদিন পরেই বৌভাতের মান রেখে একটু যৎসামান্য অনুষ্ঠানও হয়ে গেল। সেই রাত্রেই আবার ফুলশয্যা ছিল, রাত প্রায় একটার সময় সমরেন্দ্ররঞ্জন দেওয়াল ধরে ধরে কোন রকমে ঘরে ঢুক্‌লেন, হাতড়ে হাতড়ে বিছানাটা ঠিক করে নিয়ে আঃ, বোলে শুয়ে পড়লেন, একটা গভীর আরামের নিঃশ্বাস ফেলে ; হরি তখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। পরদিন হরি ঘুম ভেঙ্গে দেখলে এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘুমাচ্ছে তার স্বামী, মাথাটা তক্তা থেকে বেরিয়ে খানিকটা ঝুলছে। একটু বালিস দিয়ে তার মাথাটা ঠিক করে দিয়ে সে ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে গেল। তাদের গ্রামে অনেক মাতালই দেখা আছে হরির।

সেই বৈকালেই তার ননদ,—তার হাতের রুলি দু' গাছি দেখিয়ে বললে,—তুমার হাতে এখন শাখা আর নোয়াই থাক, ওদুটা খুলে এখন আমার কাছে রেখ্যা দাও, যখন বাপের ঘরকে যাবে তখন হাতে দিয়ে যাবে। হরি ননদকে বিশ্বাস করলে না, সে বললে,—আমার মায়ের দেওয়া জিনিস এ আমি খুলবো কেনে,—আমি দিব নাই। ননদ আর কিছুই বললে না। হরি ভাবলে, রুলি খুলবার কথা বলে কেনে, এরা—কেমন মানুষ গো ? ননদটি ভাবলে, মেয়্যাটা চালাক বটে গো।

প্রথম থেকেই স্বামীর দেখা পাওয়া যেতো না, রাত্রের প্রথম দেড় প্রহর গত হয়ে গেলে এই কয়দিন শুতে আসছিল প্রায় বেএক্তিয়ার অবস্থায়। হরি তখন অসাড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। পরদিন বেলা নটা দশটার সময় কখন সে

উঠে চলে যেতো কেউ জানতেই পারতো না। হরি কখনও তাকে এখানে দিনে কিংবা রেতে পাত পাড়তেও দেখেনি। কোথায় খেতো, কোথায় থাকতো কে জানে। এখন শেষ দিন অর্থাৎ হরির স্বামী-ঘর বা স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ সম্পর্কের শেষদিন বা রাত্রের কথা :

সে রাত্রে স্বামী তার একটু সকাল সকাল এসেছিল বটে ; আর কারণের আনন্দ তখন তার যেন ভাঁটা পড়ে এসেছিল। হরি শুয়েছিল, তবে ঘরের প্রদীপটা তখনও জ্বলছিল, গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়নি তখন হরির প্রায় তন্দ্রাবস্থা। এমনই সময়ে—সুমুখের চুলগুলি চ'খের উপর উসখো-খুসকো মাথা, বিবাহের দিন ক্ষৌরকর্ম হয়েছিল, তারপর ছ'দিন নাপিতের সঙ্গে দেখা হয়নি, শুধু একখানা ময়লা চাদর গায়ে জড়ানো, ঘাম আর মদের গন্ধে ভরা, কাপড়খানাও ময়লা,—কোমরে জড়ানো তাতে পেটের উপর একটা গাঁট বাঁধা,—চুপি চুপি লোকটা চোরের মত পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকেই দরজা আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিলে। প্রদীপটা তখনও নেবেনি দেখে একটু দাঁড়িয়ে কি ভাবলে, তারপর ধীরে ধীরে তক্তার উপর বিছানায় বসলো আর হরির তন্দ্রাবস্থাও ছুটে গেল।

হরির বুকটা ধক্‌ধক্ করে উঠলো ; তারপর আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে যখন তার স্বামীর কঠিন, গাঁট-সর্বস্ব হাতের আঙুলগুলি তার নিটোল, স্বাস্থ্যপূর্ণ কোমল হাতখানির উপর এসে পড়লো, তখন হরির শরীর রোমাঞ্চ,—আর তার মনে কেমন একটা ভয় আর বিস্ময় যুগপৎ খেলা করতে লাগলো, তাতে তাকে চঞ্চল করে তুললে কিন্তু সে চক্ষু চাইলে না। নির্জনে এই প্রথম তার সজ্ঞানে স্বামীস্পর্শ অনুভব। তারপর যখন স্বামী, কঠিন হাতটি যথাসম্ভব কোমল কোরে তার হাতখানি তুলে নিয়ে নিজের কোলের উপর রাখলে তখন আবার এক আনন্দের পুলক খেলে গেল হরির সর্বশরীরে, বুকের মধ্যে তার রক্তস্রোত উদ্দাম হয়ে চলতে শুরু করে দিলে। ভয় একটু আছে কিন্তু সেটা স্পষ্ট নয়, তার জায়গায় মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত কৌতূহল জাগিয়ে তাকে তটস্থ করে রাখলে অনাগত কোন অভাবনীয় রসাস্বাদনের কল্পনায়। তখনও হাত টেনে নিলে না। তারপর স্বামী, অপর হাত দিয়ে তার সেই কোমল হাতের উপর কাষ্ঠকঠিন আঙুলগুলির মৃদু বুলানি এবং রুলির উপর মাঝে মাঝে বিশ্রাম আর সঙ্গে সঙ্গে সেটার পরিধির অনুভব, অবশেষে স্থানচ্যুতির উদ্যোগ অনুভব করতেই হরির প্রাণে একটা প্রচণ্ড আঘাত, সঙ্গে সঙ্গে অন্তরক্ষেত্রে যেন একটি বিষম ভাবের আলোড়ন শুরু হয়ে গেল, তিক্ত হয়ে উঠল তার মন। সে তখনই তার হাতটি বেশ একটু জোরে সরিয়ে নিলে ;—তাতে তার স্বামীর বুঝতে বাকী রইলো না যে সে জেগেই আছে বা এখনই জেগেছে। স্বভাবতঃ হরির ঘুম মোটেই সজাগ নয়, অত্যন্ত গাঢ়। আজ যদি সে যথার্থই ঘুমিয়ে পোড়তো তাহলে তার স্বামী ঐ কাজটি অতি সহজেই সম্পন্ন করতে পারতো তার ঘুমেরও কোন ব্যাঘাত হোতো না ;—স্বামী তার সেই সদোদ্দেশ্য নিয়েই এসেছিল। ভাগ্যক্রমে আজ সে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হবার আগেই স্বামী-সংস্পর্শ পেয়েছিল। যাই হোক চালাক লোক আমাদের এই সমরেন্দ্ররঞ্জন।

তৎক্ষণাৎ সে, ক্ষেত্রকর্মপদ্ধতি, যাকে বলে ট্যাকটিকস্, বদলে ফেললে। এখন সে অভিনয় আরম্ভ করলে। রসিক নাগরের ভাবে সে আরও একটু হরির গা ঘেঁষে বসে,—যথাসম্ভব প্রেমবিহ্বল কম্পিতকণ্ঠে,—ওগো শুনচো, বোলে একেবারে হরির গায়ে ঢলে পড়লো আর সেই কেটো আঙুল দিয়ে হরির পুরন্ত গালে একটু টিপন দিলে, ফলে, হরি তাকে এক হাতে সরিয়ে উঠে বসে তার রুলিটা ভাল করে উপর দিকে একটু তুলে এঁটে নিলে।

আহা, ভয়কি তুমার গো, আমি তো পর নয়,—বোলে স্বামী সমরেন্দ্ররঞ্জন গোমস্তাবাবু একটু ঝুঁকে পড়ে হরির হাতখানি ধরতেই আবার জোরে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে হরি একটু সরে গিয়ে ;—টানাটানি কর ক্যানে, ঘুমাতে দিবে নাই ? বোলে আর এক হাতের রুলিটি গুঁজে দিলে উপর পানে।

এবার স্বামীর মেজাজ গেল বিগড়ে,—কতক্ষণ আর ধৈর্য রাখা যায় ? কত ভেবে, মতলব ঠিক করে এসেছিল সে সেই সহজ অরিজিন্যাল প্ল্যান ত ফসকে গেলই উপরন্তু এই কাঁচ মেয়েটা তার ব্যবহারের প্রতিবাদ করে বসলো, মরদ স্বামীর আর কত সহ্য হয় ? এবার তার স্বরূপ প্রকাশ করতে ইচ্ছা হলো। কিন্তু কি জানি কি ভেবে সে পুনরায় অভিনয়ের সাহায্যেই হরিকে মোহিত করে কার্য উদ্ধারের চেষ্টাই ভালো মনে করলে। এবার সে কণ্ঠকে অপেক্ষাকৃত নরম করে বললে,—আচ্ছা আমায় তুমার কেমন লাগে, বল দেখি ?

হরি তবুও কথা কয় না দেখে সে আবার আরম্ভ করলে,—আমায় তুমার বুড়া মনে হয় বটে ? তাতেও হরির কথা নাই দেখে সে তার সামনে কপালের উপর ঝোলা চুলগুলি দুহাতে সিঁথির দুদিকে মাথার উপর সাজিয়ে একবার হাত দিয়েই যেন বুরুশ করে নিলে। তারপর বললে,—ফ্যোচক্যামি তোমার ভাল লাগে না বটে ? আমি একটু ফ্যোচক্যা ত বটি গো, উ আমার ভাল লাগে যে ! এবার তার কথা শুনে হরি,—পোড়ার মুয়ের মরণ আর কি, লজ্জা লাগে নাই ?—বোলে আবার মুখটা ফিরিয়ে বসলো। আশা পেয়ে স্বামী এবার,—এখানে তুমার কেমন লাগে গো ? চারুটা (অর্থাৎ ভগিনী) যতনু-আত্তি করে বটে ? হরি একথারও কোন উত্তর দিলে না,—সে মুখ নীচু করে কি ভাবছিল কে জানে।

তুমি রা-কাড়ো নাই কেনে গো ? এবারেও ধৈর্যশীল স্বামীর জিজ্ঞাসার উত্তরে কোন কথা নাই। এটা বোধহয় তার লজ্জা, মনে করে এবারে প্রবীণ স্বামী তার অভিনয়ের নামে এক দুঃসাহসিক কাজ করে বসলো। সে ভুলে গেল যে হরি এখনও বালিকা, ভুলে গেল এই বিবাহ তাদের এখনও এক সপ্তাহও হয়নি ; অধিকারীর যাত্রায় যেমন কৃষ্ণ রাধাকে কাঁধে হাত দিয়ে জড়ায়, সেই-ভাবেই জড়িয়ে,—নিভৃত মিলনের অবকাশে দীর্ঘ বিরহের পর রাধার দাড়িটি ধরে প্রেম-নিবেদন করে ; সে,—মনে মনে নিজেকে যুবা কৃষ্ণ আর হরিকে যুবতী রাধায় পরিণত করে রাধাকে চিত্ত নিবেদন, প্রাণ মন সকল কিছুই নিবেদন করতে গেল। গিয়ে করলে কি ? বেশ জোর করে একহাতে হরির উপবিষ্ট দেহবেষ্টন, অন্য হাতে হরির মুখখানি টেনে একেবারে নিজের কাছে এনে ;—প্রেম গদ্‌গদ কণ্ঠে, হেঁ গো প্রেমময়ী, বল দেখি তুমি আমার কে ? বোলে

সে সাতদিনের তীক্ষ্ম খোঁচা খোঁচা গোঁফ-সমেত একটি চুম্বনে হরিকে মোহিত করতে গেল। তার অধিকার ভেবেই সে হয়তো ও কাজ করছিল। এখন তাতে হলো কি ?—

তার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে একেই সোজা মানুষ হরির মনটা বিষিয়ে উঠেছিল, তার উপর ঘাম আর মদের গন্ধে, এমন কি তার শ্বাস-প্রশ্বাসে হরির প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠেছিল। তারপর এইসব ঢং, আবার টানাটানি, জোর-জবরদস্তি দেখে এক মুহূর্ত অবাক বিস্ময়ে যেন সে স্তম্ভিত, পরক্ষণেই মনে তার এক ঝড় উঠলো, এ বলে কি ;—তুমি আমার কে ?—

স্বামী চমকে উঠলো হরিমতীর মুখের দিয়ে চেয়ে ; তার চাহনি অগ্নিময়, সে অগ্নি তার স্বামীও অনুভব করলে আর সঙ্গে সঙ্গে,—আমি তুমার যম্ বঁটি গো ! বলেই সজোরে একটি চড় বসিয়ে দিলে তার স্বামী-দেবতার ঐ তোবড়া গালে ; তারপর দুদ্দাড় করে নেমে দরজা খুলে হরি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ছুটে। ব্যাপারটা লিখতে এতক্ষণ গেল কিন্তু ঘটে গেল কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই।

নেশা তো ছুটে গেলই ; কি করতে এসে কি হলো ! এমন বিপরীত কাণ্ড যে ঘটতে পারে সে কখনো কল্পনাও করেনি। এখন তলের বিষটা উঠলো উপরে ভেসে,—মন থেকে কর্মেন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হলো সঙ্গে সঙ্গে চেপে গেল হিংসার প্রবৃত্তি। উপর মাড়ির অত্যন্ত দুর্বল নড়া দাঁত কটাতে ঘা খেয়ে তার মাথার শির পর্যন্ত যন্ত্রণায় দপ্‌দপ্ করছিল, দুহাতে গালটা চেপে যতটা সাধ্য চিৎকার করে অতি কুৎসিত গাল দিতে দিতে বেরিয়ে এলো সে। বাইরে অন্ধকার, পাশেই গোয়াল, ভাবলে ঐ গোয়ালে ঢুকেছে বুঝি তার শিকার।

এ ক্যামন মেয়্যা গো ! দস্যিটা, হারামজাদি,—তারপর,—চলতে চলতে গোয়ালের দিকে ফিরে,—আজ গাড়বো তোয়ারে, থাম, দেখাই,—বোলে গোয়ালে ঢুকলো। একটা কিছু বিষম ব্যাপার ঘটেছে মনে করে তার বোন নিরীহ চারুবালা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, বোনাইও এলো পিছনে পিছনে আলো নিয়ে।

কুথায় গেল, সে হারামজাদি ?—বোলে রঞ্জন অনেক দম্ভ করে ব্যাপারটা গুছিয়ে তাদের গোচর করলে,—তারপর উদ্দেশে অনেক গালাগালি,—সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধান এদিক-ওদিক চললো কতক্ষণ ;—কিন্তু তাকে কোথাও পাওয়া গেল না। বুদ্ধিমতি ভগিনী ব্যাপারটা বুঝে তখন,—চুলায় যাউগগো দাদা, উ মরুগগা তুমি যাও, শোওগা। বলে নিজেরা ঘরের দরজা মুখো হলো।

দাদার তখনও দাঁতের যন্ত্রণা কিছুমাত্র কমেনি, গালে হাত তখনও আছে, এসে বললে,—চুলায়ই দিব তারে আজ। বোলতে বোলতে বেরিয়ে গেল। ভাগ্যক্রমেই হরিকে পাওয়া গেল না, তার আয়ু ছিল তাই বেঁচে গেল সে।

শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না-ভরা নিস্তব্ধ রাত,—হরি এক কাপড়েই পাড়ি দিলে গ্রামের পথ, রাস্তাঘাট তার সবই জানা। পথের ধারেই—একখানা বড় বাগান তারপরেই একটা বড় মাঠ, সেই মাঠ পেরিয়েই তাদের গ্রাম। হন্‌হন্ করে হরি যেন এক নিঃশ্বাসে এসে উঠলো তাদের গ্রামেতে। এত রাত্রে এ অবস্থায় হঠাৎ হরিকে দেখে তার সৎমা আর বাবা একেবারে চমকে উঠলো। ব্যাপার কি ?

হরি বলে,—ঐ বুড়ো মড়ার সাথে থাকতে আমি লারবো। উ মদ খেঁয়ে আমার হাত হতে রুলি খুলে নিতে আইছিলো, চোর মনিষ গো,—আমার এমন জনের সাথে কেনে বিয়া দিলে বাবা।

তার বাবা ভাল মানুষটি, এ ধরনের অনুযোগ শুনে, উচ্চবাক্য না করে নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকলো। সৎমা কেবল এই কথাটি বললে, আমাদের পোড়া কপালে আবার উয়ার চেয়ে ভাল বর হবেক কেনে মা?

এই পর্যন্তই হরির বিবাহিত জীবনে স্বামী-ঘর করার ইতিহাস। সে আর স্বামীর সঙ্গে ঘর করেনি বটে কিন্তু এত সহজে তার হাত থেকে নিস্তারও পায়নি। সে চলে আসবার দুদিন পর বাবাজী এসে উপস্থিত, হরিকে নিয়ে যাবে। হরি কোনমতেই গেল না। তারপর থেকে মাঝে মাঝে এসে হরিকে নিয়ে যাবার প্রবল চেষ্টা আরম্ভ করলে প্রতিবেশীদের দুই তিন জনকে সহায় করে। তারা ঐ দলেরই, ঐ প্রকৃতির লোক,—তারাই ঐ বিবাহটা ঘটিয়েছে,—তারা ধুমধাম করে এখন জামায়ের পক্ষে দাঁড়ালো। জোয়ান মরদ লোকের মদ খাওয়া, বেশ্যা-সঙ্গ করা কি একটা দোষের মধ্যে ধরা যায়?—ও কাজ ত বেটা ছেলেরই বটে?

সহজ বুদ্ধিতে যা বুঝেছিল,—হরি তার বাবাকে বুঝিয়ে দিলে যে, এইবার নিয়ে গিয়ে আমাকে মেরে ফেলে এই সোনাটুকু নেবে। আগের দুটাকেও এইরকম করেই মেরেছে। জানি না এই নির্ঘাত ইন্দ্রিয়জ ষষ্ঠ অনুভূতি হরির কোথা থেকে হলো, কিন্তু আশ্চর্য সত্য এটা, হরির বাবাও বিশ্বাস করলে তার কথা, কারণ বিয়ের পর সেও ঐরকম কিছু শুনেছিল কারো কারো কাছে। কিন্তু, প্রতিবেশীরা শাস্ত্রজ্ঞ ও ধার্মিক তারা ঐ সব বাজে কথা শুনতে চায় না। হরিকে তারা গাঁয়ের আপদের মতই মনে করে। তাদের বিধিদত্ত অকাট্য যুক্তি এই যে, পায়ে ধরে বিয়ে দিয়েছ যখন, তখন ও ত' উহারই জিনিস বটে। উ মারতে হয় মারবে,—কাটতে হয় কাটবে, রাখতে হয় রাখবে, যা ইচ্ছা তাই করবে ওর নিজের স্ত্রীকে নিয়ে, তাতে লোকতঃ-ধর্মতঃ আমাদের কিছুই করবার নাই। মেয়ের বরাতে যা আছে তাই হবে,—সুতরাং ওকে জোর করেই পাঠানো উচিত তা হলেই ঐ ঠেঁটা মেয়েটা জব্দ হবে। মেয়েটি অস্বাভাবিক রকমের দস্যি,—তাতে কারো কোন সন্দেহই নেই, আর তা থাকবার কথাও নয়।

দুর্বলচিত্ত হরির বাপ, মনে জোর বলতে কিছুই ছিল না, পড়শীদের কথাতেই সে রাজি হয়ে গেল। কথা এই রইল যে, হরিকে জোর করে এমন কি হাত পা বেঁধেই পাঠাতে হবে এবার বাবাজী নিতে এলে। বাবাজীকে চটালে অধর্ম, আইনতঃ তারই অধিকার যে। হয়তো শেষে তাই-ই হতো কিন্তু কি জানি কি মনে করে বাবাজী, হয়তো সে মহাপাতকের কাজে বিতৃষ্ণা বশতঃই হবে এবার শান্তভাবে এসে বললেন, উয়ারে আমি চাই না;—উয়ার হাতের ঐ দু'ভরির রুলি দু'গাছা হলেই হবে। দানে পাওয়া সোনা উতো আমারই বটে,—উয়ারে বলগা আমায় খুলে দেক্। সহৃদয় প্রতিবেশীরা,—হরিকে দূর করতে পারলেই সুখী হতো,—কিন্তু হলো না দেখে একটু ক্ষুণ্ণ হলো। তারা বাবাজীকে সাধ্যমত এই কথাটাই বুঝাতে চেষ্টা করলে যে, ও তোমারই সম্পত্তি, ওকে নিয়ে

গিয়ে যা করবার তা করলেই তো চুকে যায় লেঠা। আর ঐ ভাবেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি সহজেই হবে।—এতে ভয় পাবার কি আছে।

কিন্তু প্রতিবেশীরা খবর রাখতো না যে একটু কেন বিলক্ষণ ভয়ের ব্যাপার একটা ছিল এর মধ্যে। বাবাজী আগে যে দুজনকে ভবপারে পাঠিয়েছেন তাদের মধ্যে শেষেরটি দাহ করবার পরেই তার কোন আপনজনই কতক প্রমাণ হাতে পুলিসে খবরাখবর করে বেশ ঘোরালো ব্যাপার করে এনেছিল কিন্তু দারোগা সহায় ছিল বোলে কিছু করতে পারেনি। এখন একজন সাধু ভদ্র শিক্ষিত দারোগা এসেছে সেখানে,—সেইজন্য ভয় আছে। এবারে রক্ষা নাই। কাজেই বাবাজী এবারে সোজ পথ ধরেছেন, ঐ সোনাটুকু পেলেই খুশি হয়ে যাবেন, আর কিছুই চাই না। তারপর এখন ওকে নিয়েই বা যান কোথা, তাড়াতাড়ি নিয়ে গিয়ে কাজ হাসিল করবার জায়গাই বা কোথা। ভগিনীর দ্বার তো বন্ধ হয়েই গিয়েছে। তাই সোজা পথই ধরেছেন। অবশ্য তার প্রস্তাবে অগত্যা রাজী হতে হলো প্রতিবেশী বন্ধুদের। তখন সকলে হরিকে বললে, খুল্যা দে তু ঐ রুলি দু'গাছা। ওটা পেলে, প্রতিবেশীদের দু বোতল কারণ উপহার দেবার কথা ছিল,—বাবাজীর সঙ্গে।

হরি বলে, আমার মায়ের দেয়া রুলি, উয়ার হলো কি করে? এ আমি কখ্‌খনো দিব না। ধর্মভীরু পড়শীরা তাকে বুঝিয়ে দিলে, ঐ গওনা-সুদ্ধু তোর বাপ তোকে ভগবান সাক্ষী করে বিয়ার রাতে উয়ার পায়ে ধঁরে সোঁপে দেয় নাই? তাহলে ও গয়নার সোনা উয়ার হলো নাই?—তুই ন্যাক্যা মেয়্যা একথা জানিস নাই?

এত বড় যুক্তিযুক্ত এই শাস্ত্রের কথা মাথায় ঢুকলো না, সে রেগে গিয়ে বললে,—আমি ছাগল, না গরু, না জলভরা কলসী যে বাবা আমায় ঐ বুড়া-মড়া মাতালকে পায়ে ধরে দান করতে যাবে। আমি প্রাণ গেলেও মায়ের রুলি হাত হতে খুলবো না। উয়াকে দিতে লারবো, তুমরা যাই-ই বলো ক্যাম্নে।

কথায় যে কাজ হবে না একথা তারা বুঝেছিল ভালমতেই; কাজেই তারা বললে, তাহলে আমরা জোর করে তোর হাত থেকে খুলে ওকে দিব। তাদের ঐ কথা শুনেই ক্রোধে হরির মুখখানা লাল হয়ে উঠলো, সে চিৎকার করে বললে,—তুমাদের বুঝি উয়ার সঙ্গে বকরা-ব্যবস্থা হয়্যাছে এই নিয়্যা? তা হোক, শুনে রাখো;—তুমরা যেই হওনা কেনে আমার অঙ্গে যিনি হাত দিবেন তার ঘরকে আগুন লাগাবো যেঁয়ে তবে ছাড়বো। তুমাদের মরণ হয় না, ঐ খুনে বদমাস মাতলের লেগে সালিসি করতে আইচো হেথাকে। হরি যেন থর-থর কাঁপতে লাগলো,—তার মূর্তি দেখে জ্ঞানী প্রতিবেশীরা সুড়সুড় করে যে যার ঘরের দিকে পা চালিয়ে দিলে। খুব ভালমতেই তারা জানতো হরির অসাধ্য কাজ নেই।

বাবাজীও তাদের পিছনে পিছনে এই ভাবতে ভাবতে গেল যে, এই একরত্তি মেয়্যা এর এত তেজ? একবার ঘরে পেতাম ত' ভাল ওষুধই দিতাম,—হারামজাদা মেয়্যাকে একেবারে সেথাকে পাঠাতাম যেথা আগে দু'জনা গিয়েছে। কিন্তু বাবাজী এতেই কাজ শেষ মনে করলেন না, আবার একদিন মদে বিহ্বল

অবস্থায় এসে হরিদের ঘরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সেই রুলির দাবী করতে,—তার বাপকে চোর, জুয়াচোর ক্রমে পিতৃ-পিতামহ এমন কি সাতগোষ্ঠীর উপর অকথ্য গালিগালাজ করতে আরম্ভ করে দিলেন। অনেকটা সহ্য করেছিল হরি, শেষে তার স্বর্গত মাকে লক্ষ্য করে যখন কুকথা অবলীলাক্রমে প্রয়োগ করে তাঁর পৌরুষ জাহির করতে আরম্ভ করলে তখন আর তার সহ্য হল না, একতাল পচা গোবর এনে সে এমন জোরে নির্ঘাত ভাবে তার মুখ লক্ষ্য করে ছুড়ে মারলে, বাবাজীর চোখে, মুখে নাকে কপালে আবার কতকটা চুলে, গলায় বুকে পর্যন্ত নেপটে একাকার। তারপর হরি চেঁচিয়ে বললে, আজ এই গোবর দিলাম ঐ মুখে,—ফের যদি এখানে এসে ঐ পোড়ার মুখে আবার গালমন্দ শুনি, তাহলে এরপর যা দিব তা আর এখন বলবো নাই,—মনে থাকে যেন মরদের। বাবাজীর নেশা গেল ছুটে, অবশ্য এরপর আর তিনি আসেননি বটে কিন্তু যাবার সময় বলে গেলেন, এবার আর ওমনি আসবো না পুলিস দারোগা এনে সবাইকে ধরে নিয়া জেলে পুরবো তবে ছাড়বো,—আমায় তুমরা চিন নাই।

আর কেউ না চিনুক হরি কিন্তু ঠিক চিনেছিল।

এই ব্যাপারটায় হরিকে নিয়ে তাদের পল্লীতে বেশ একটা আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। এমন বিয়ে অনেক মেয়েরই হয় কিন্তু হরি যেরকম কাণ্ড বাধিয়ে তুললে এরকম কেলেঙ্কার এ গ্রামে ত কেউ করে নি। সকলেরই একটা আক্রোশ হরির উপর,—যেন, এ সকল অপরাধই হরির।—মেয়েটা অতি অলক্ষণা। মেয়েরা পর্যন্ত ঘাটে, পথে ঐ হরির কথাই বলে—হরি যেন সকলকার অসহ্য, পাঁচজনের পাঁচকথায় হরিকে অতিষ্ঠ করে তুললে। সে তাদের সকল কথাই শোনে। তার বাপ বা বিমাতা কিছুই বলে না ;—কিন্তু মন তাদের ভার এটা বুঝা যায়। শেষ পর্যন্ত অসহ্য হয়ে তার বাপও একদিন দৃঢ়ভাবেই বলে বসলো যে, তোর জ্বালা অসহ্য হয়েছে, হরি তুই মর।

হরি বললে, আচ্ছা মরবো যেঁয়ে আজ নদীতে ডুবে। সত্যসত্যই পরদিন সকাল থেকে আর কেউ তাকে দেখতে পেলো না। প্রায় সকলেই ভাবলে হয়তো বা প্রাণের ধিক্কারে হরি নদীতে ডুবে মরেছে। যে ভাল সাঁতার জানে সে যে কখনও ডুবে মরতে পারে না একথা কারো মনে হলো না ;—তারা ভাবলে আপদটা গেল এখন পুলিসের হাঙ্গামটা এড়াতে পারলে হয়।

বয়ে গেছে হরির ডুবে মরতে, সে এলো কলকাতায়।

দেশের অনেক মেয়ে কলকাতায় কাজ করতে যায়, হরি ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছে,—শুনেছে, আবার জানেও। তার দিদিমাও কলকাতায় কোন বামুনের বাড়িতে বুড়ি বয়স পর্যন্ত ঝিয়ের কাজ করে দুইটি পালি টাকা রেখে মরেছে। বাপ তার সে সবই পেয়েছে।—এ সব সে জানে বৈকি।

সন্ধ্যার পর সে দিব্যি একটা পোঁটলা হাতে করে দুবরাজপুর স্টেশনে গিয়ে বসে রইল। তাদের গ্রামের সদু আর মানিনী দু'জনা আজ কলকাতা যাচ্ছে, এ খবর তার জানা ছিল কিন্তু পাছে জানাজানি হয় সে আগে তাদের কিছুই বলেনি, তারা এসে পেঁছাবার ঘণ্টাখানেক পরেই হরি এসে হাসতে

হাসতে তাদের পাশে দাঁড়াল। আরও একঘণ্টা পরেই সে তাদের সঙ্গে রেলে চড়লো কলকাতার উদ্দেশে।

তারা কাজ করতো জগন্নাথ ঘাটের এক ভুসি মালের আড়তে। হরি এসে জুটলো তাদের সঙ্গে। গতর ছিল তার ;—কাজের লোকও সে কম ছিল না। পয়সা উপার্জনের কাজে হরি প্রাণের আনন্দে লেগে গেল। তার একটা দম ছিল পয়সার উপর ;—পয়সায় সব হয়—ধর্ম, কর্ম, অভাবমোচন।

তার কাজ হলো ডাল ঝাড়া। কখনও বা কুলায় মসলা ঝাড়ার কাজ, রোজ চার আনা। সে স্ফূর্তিতে লেগে গেল। তাছাড়া সকালে বিকালে বাবুদের বাড়ি বাসন মাজতো, দু'বেলা খাওয়া আর কাপড় গামছা। এইভাবে তিনটি বছর তার কাটলো। এই তিন বৎসর প্রায় সাড়ে তিনশো টাকা তার জমে উঠলো। পয়সা সে কারো কাছে রাখতো না। তিনবার কালীঘাটে যাওয়া ছাড়া হরি আর কোথাও যায়নি বা কোনো খরচ করেনি। কালীঘাটে তাদের গ্রামের মহেশ পালের হাঁড়ি কলসির দোকান—সে হরিকে মেয়ের মতই ভালবাসতো।

বাবুদের অর্থাৎ আড়তদার যাঁরা, তাঁরা তিন ভাই। তাঁদের মেজ ভাইটির নজর পড়ল হরির ওপর ; তখন হরির সতেরো বছর বয়স, ভরা যৌবন যাকে বলে। তখনকার দিনে তার দু'তিন ছেলের মায়ের বয়স। একে তার নির্মল স্বভাব,—সারাদিনের খাটুনির পর রাত্রে নিশ্চিন্ত ঘুম,—পূর্ণ স্বাস্থ্যবতী হরি, কস্তাপেড়ে শাড়ি পরে মাথায় কাপড় দিয়ে এসে দাঁড়ালে তাকে ভদ্রঘরের বৌ বলেই মনে হয়। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ কপালে আর দাড়িতে উলকি ছিল তার,—বড় বড় চক্ষু দুটি সুশ্রী মুখ দেখে মেজবাবু কাবু হয়ে পড়লেন। ফর্সা হলেও মেজবাবুর বৌ ছিল রুগ্না,—চিররুগ্নও বলা যায়, কঙ্কালের উপর পাত্‌লা একখানি চামড়া। দুটি ছেলে, তাঁরাও রুগ্ন,—কাজেই তাঁর যদি হরিকে দেখে মাথার ঠিক না থাকে তাকে বেশী দোষ দেওয়া যায় না। তারপর,—দু'একদিন ইশারায় চেষ্টা চরিত্র চললো,—হরিকে বাগানো যখন গেল না,—তখন মেজবাবু একরাত্রে সদু ও মণিকে সহায় করে হরির ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। হরি কিন্তু তাকে শুধু দোষ দেওয়া নয় তাকে বেশ স্পষ্ট গলায়, গলায় দড়ি দিয়ে যমালয়ে যাবার পরামর্শ এবং তৎক্ষণাৎ কাজ ছেড়ে দিয়ে,—তার পুঁজিপাটা সব নিয়ে সেই রাত্রেই হেঁটে কালীঘাটে এসে উঠলো তার মহেশ খুড়োর বাসায়।

এই তিন বছরে পাল-পার্বণে হরি সদু ও মণির সঙ্গে কালীঘাটে কয়েকবার এসেছিল। আগেই বলেছি তাদের গ্রামের এক ঘর কুমার মহেশ পাল,—অনেককাল কালীঘাটে হাঁড়ি কলসির দোকান করে বেশ দু' পয়সা করেছিল। প্রথমবার এসেই তাদের সঙ্গি হরির,—পরিচয় হয়েছিল। মহেশ এখন বুড়ো হয়েছে, তার ছেলে ভৈরবই সব কারবার দেখে, মাল কেনে, বেচে, আর মহেশ কড়াকড়ি হিসাব রাখে কেবল। হরি তার পুঁজি নিয়ে এসে উঠলো মহেশের আশ্রয়ে। তাকে সরলভাবেই সব কথা খুলে বললে ;—তার পুঁজির কথাটাও লুকায়নি। মহেশ বললে, থাক্ তুই আমার কাছে,—তুই আমার মেয়ের মত থাকবি হেথা, কোথাও আর যেতে হবে না। কথা রইল—সে তাদের সংসারের সব কাজ করবে আর

ভৈরবের ছেলেটি মানুষ করবে—আর খাবে-দাবে থাকবে আপন লোকের মত। এই চৈত্র এলে ছেলেটি দু বছরে পড়বে। মা যায় রাঁধতে, ছেলেটার হয় খোয়ার, যত্ন হয় না। কাজ অনেক তাদের সংসারে,—করবার লোক ঐ বৌটি,—কাজেই সংসারে বিশৃঙ্খল যতটা হবার ততটাই হয়েছে।

হরি এসে এক মাসের মধ্যে মহেশের সংসার গুছিয়ে তুললে,—ভৈরবের ছেলেটিকে সে এই এক মাসের মধ্যে যত্নে তাকে সুস্থ এবং আপন করে নিলে, ছেলে এখন হরিতেই অনুরক্ত হয়ে পড়লো,—সব দেখে-শুনে মহেশের আর ভৈরবের সুখের সীমা রইল না। হরি,—ভৈরবের ছেলে কার্তিকের উপর মনপ্রাণ ঢেলে দিলে।

তার মধ্যে একটা মাতৃত্বের ক্ষুধা চাপা ছিল,—এখন মহেশের সংসারে এসে এই কার্তিককে নিয়ে সে মমতার সাগরে ডুব দিলে। এমনভাবে জড়িয়ে পড়লো যে তার আর ছাড়াবার উপায় রইল না। ইতিমধ্যে ভৈরবের তিনটি ছেলেতে মেয়েতে হয়েছে।—হরির অরণ্যের গতর, সেই গতরের জোরে সংসারের কোন দিকে কোন বিশৃঙ্খলা নেই। হরিকে মহেশ এমন করে রাখতো কথায়-বার্তায় ব্যবহারে—হরি মনে করতো এই তার নিজের সংসার, এই তার স্বর্গের পথ এখান থেকে কখনও তার বিচ্যুতি নেই।

এইভাবে বছর পাঁচ ছয় কেটে গেল, ভৈরবের ছেলেটিকে লেখাপড়া শেখাবার কথা হতেই হরি বললে, ওকে আমি পাস করাবো। বাবুদের ছেলেরা যেখানে পড়ে সেইখানেই পড়বে আমার কার্তিক। নিজের পয়সায় কার্তিকের পোশাক, জামা, জুতা, কাপড়—কিনে সাজিয়ে দিতো, স্কুলের মাহিনা মহেশের—আর জল-খাবার পয়সা, বই-স্লেট,—কাপড় জামা জুতা সব হরির। মহেশ কিছুদিন চুপ করে সব দেখছিল,—বছর তিন পড়বার পর—একদিন সুযোগ বুঝে মহেশ হরিকে বললে,—দেখ হরি,—তুই আমার মেয়্যা বটে ত?—একটা কথা তোকে বলি বুঝে দেখ্ ক্যানে। কার্তিক কুমারের ঘরের ছেলে, ওর বেশী পড়াশুনা, পাস করা, এসব ভাল নয়। ইস্কুল কলেজে বেশী পড়লে, ওছেলে আর আমাদের পৈতৃক কাজকর্ম করতে চাইবে না;—বাবুদের ছেলেদের মত চাকুরী করে মরবে, কখনও ওর দুঃখ ঘুচবে না। বাবু হয়ে বেড়াবে, আমাদের কাজ-কর্মকে দেখবে যেন বাঘ,—বিড়ি সিগারেট খাবে, তামাক পর্যন্ত খাবে না, বাপ পিতোমোকে, আমাদের ছোটলোক মনে করবে,—চাল বেড়ে যাবে,—তাই বলি আমার কথা শোন,—যেটুকু হয়েচে তাই ভাল আর কাজ নেই বেশী লেখা-পড়ায়। এখন থেকে একটু একটু দোকানে বসুক,—নিজেদের কাজ-কারবার শিখুক।

হরি প্রথমে কথাটা বুঝতেই পারল না, খানিকক্ষণ অবাক হয়ে মহেশের মুখের দিকে চেয়ে রইল। এ কথাটা যে তার মহেশ খুড়োর মুখ থেকে বেরুতে পারে সে ধারণাই করতে পারেনি। মহেশ তার মুখ দেখে, বুঝলে বিপদ বটে,—এইবার। হলোও তাই; হরি তার কথা বুঝেই ফেটে পড়লো। চিৎকার করে সে বাড়ি মাথায় করলে। তার ছটফটানি দেখে মহেশ ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

রাগে হরি থরথর করে কাঁপতে লাগলো—গলার আওয়াজে দশদিক কাঁপিয়ে

সে গলা ভেঙে ফেললে অল্পক্ষণেই। পরের ছেলেকে মানুষ করতে গেলে এই রকমই হয়ে থাকে? কেন? আমার কি মাথা ব্যথা? এত যদি মনে ছিল তো গোড়ায় বল নাই কেনে?

তারপর খানিকটা দম নিয়ে সে অন্য দিকটাও দেখালো। কি বুদ্ধি তোমাদের মহেশখুড়ো; চিরকালটাই কুমোর হয়ে রইলে? ছেলেকেও কুমোর করে,—আবার নাতিটাকেও সেই কুমোর-গিরিতে ঢোকাতে চাও? কেন? তাকে কি মানুষ হতে নেই, তাকে কি বড় হতে নেই। যদি পাস করে সে জ্ঞান-বিদ্যে-বুদ্ধিতে বড় হয়ে যায়, কুমোর-বংশে কি সেটা কলঙ্ক? এই যে আশু পাল,—হাজার টাকা মাইনে পায়—কটা বামনের ছেলে তা পায়? বেটা ছেলে সে, তার কি বংশ ছাড়িয়ে বড় হতে নেই? এইসব অনর্গল বেরুতে লাগলো তার মুখ থেকে।

মহেশ কিছুতেই থৈ পেলে না, তার কথার তোড়ে ভেসে যেতে লাগলো। মহেশ যত তাকে বোঝাতে যায়—যে কুমোরের ছেলে কুমোর হলেও মানুষ হতে পারে, বড় হতে পারে। মানুষ হতে গেলে পাস করে কেরানী হবার দরকার নেই,—নিজের বৃত্তির মধ্যেই সে মহৎ হতে পারে। কে তার কথা শোনে, হরি যেন পাঁচটা হয়ে উঠলো। শেষে হরি প্রচার করলে, থাক, তোমাদের ছেলে, আমি চললুম এখান থেকে। পথের মানুষ আমি পথেই চললুম; বুঝলাম যে এতদিন ভস্মে ঘি ঢেলেচি।

বাপরে! মহেশ একেবারে এতটুকু হয়ে গেল। এ সংসার থেকে হরির চলে যাওয়ার মানে যে কি তা মহেশ খুব ভালই জানে। হরির যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জমজমাট সংসার ভেঙে ঝরঝর করে পড়বে এ বিষয়ে তার সন্দেহের কোন অবকাশই ছিল না।

কাজেই, অবশেষে হরির জেদই বজায় রইল। কার্তিকের পড়াশুনা চলতে লাগলো। এই সময়েই হরির বাপের মৃত্যু সংবাদ এলো মহেশের কাছে। সে ভটাচায্যি ডেকে কালীগঙ্গার তীরে যথাসাধ্য করলে তার জ্ঞান ধর্ম বুদ্ধিমত। দ্বাদশ ব্রাহ্মণ ভোজন করালে একটাকা দক্ষিণা দিয়ে। হরি তারপর কার্তিককে বোঝাতে আরম্ভ করলে লেখাপড়া না শিখলে মানুষ হওয়া যায় না। তোর হাজার টাকা থাকলেও লেখাপড়া না জানলে লোকে বলবে, মুখ্যু। কোন রকমে তুই পাসটা কর না, তারপর বুঝতে পারবি কেমন করে বড় হতে হয়। এইভাবে হরির উৎসাহের ছোঁয়াচ লেগে গেল তার প্রাণে, তখন সে মন দিলে। কিন্তু হরির কাছে তার নিষ্কৃতি নেই, খেতে-শুতে-নাইতে হরি তাকে নিয়ে পড়লো, তাকে ভদ্র এবং বড় হতেই হবে।

এইভাবে মহেশের সংসারে হরির আরও পাঁচটি, সব শুদ্ধ এগারটি বৎসর কাটলো—কার্তিক তেরো বৎসরের ছেলে, উৎসাহ প্রথম প্রথম তার পড়া-শুনায় ছিল না বটে এখন কয়েক বৎসর থেকে তার পড়া-শুনায় মন বেশ বসেছে। এবার চতুর্থ শ্রেণীতে উঠলো। হরি দিন গুনছে, আর তিনটি বছর তারপর তার কার্তিক একটা পাস দেবে। নতুন বই কেনা হলো, নতুন ক্লাসে উঠে

উৎসাহে পড়াশুনা চলতে লাগলো।—এখন আবার রোজ বাড়িতে বিকালে মাস্টার এসে পড়িয়ে যায়।

সেই বছরে ফাল্গুন মাসে বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের অনুগ্রহর হাওয়াও জোর বইতে লাগলো। সরকার থেকে ঢেঁড়া পিটিয়ে পল্লীতে পল্লীতে বসন্তের টিকে নিতে ও সাবধান হয়ে থাকতে সবাইকে সতর্ক করে দেওয়া হলো। সব বাড়িতেই টিকে দিয়ে গেল কোম্পানীর ডাক্তার এসে। কার্তিকও টিকে নিলে। টিকে নিয়ে তার জ্বর বেরুল, একদিন পরে জ্বর মিলিয়ে গেল বটে কিন্তু তার গায়ে গুটি দেখা দিলে। শীতলার বামুনকে ধরে আনলে হরি। তিনি দেখে বললেন, এটা জাত বসন্তই বোধ হচ্চে। ক্রমে বড় বড় ও ঘন ঘন হয়ে সর্বাঙ্গ ছেয়ে গেল,—চোখ চাইতে পারে না ; কার্তিকের বড় ভয়ানক রকম চেহারা হয়ে গেল। ক্রমে ছট্‌ফটানি বড় বাড়লো।—হরি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে সেবা করলে,—মানত এত রকমের করলে যার সংখ্যা হয় না,—শেষে,—হে মা শেতলা ! তুমি আমায় নাও মা, ছেলেটিকে প্রাণদান দাও। এতটাও হলো।

যে ভাগ্যের জোরে দেবতার দয়া পাওয়া যায় সে ভাগ্য হরির ছিল না সুতরাং বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ করে কার্তিক মারা গেল।

হরিও পথে বেরিয়ে পড়লো। মহেশ আর ভৈরব, বাপ বেটাতে মিলে কোন রকমেই আর হরিকে তাদের ঘরে রাখতে পারলো না।

এই সময়টায় হরি খবর পেলে সে বিধবা হয়েছে। যে লোকটির অন্তর্ধানে হরি বিধবা হলো,—তার সঙ্গে যোগাযোগটুকু কেবল তার আইবুড় নামটি খণ্ডাবার জন্য—এই কথা সবাই জানতো।

দেশে আর সে গেল না। দেশের কেউ আর তার উদ্দেশ্যও করেনি। দেশের ওপর কোন কালেও তার কোন টানই ছিল না। ঐ যে কুমোরের পো-কে মানুষ করা, তার মা হওয়া, এগারোটি বৎসর তার জন্যে প্রাণপাত করা, যাতে সে আপনাতে আপনি ভরে ছিল, এখন তার ভেতরটা যেন ফাঁকা হয়ে গেল এই আকস্মিক বজ্রপাতে। পাগলের মত সে কিছুদিন পথে পথে মহেশকে গাল দিয়ে বেড়াতো ; রাত্রে কালী মন্দিরের আশপাশে শুয়ে থাকতো। তার ধারণা, মহেশ তাকে পড়াশুনা করতে দিলে না, তাই সে বাঁচলো না ; সে ক্ষণজন্মা ছেলে ঐ পাতকীর ঘরে থাকবে কেন?—মনোমত হলো না বোলেই সে আর রইল না।

এইভাবে কিছুদিন কাটিয়ে সে সিমলায় এক ভদ্র পরিবারে কাজ নিল। গিন্নী কালীঘাটে এসেছিলেন ;—হরিকে দেখে, পরিচয় পেয়ে স্নেহাবিষ্ট হয়ে নিয়ে গেলেন তাঁদের ঘরে। সেখানেও বেশীদিন থাকতে পারলে না, কারণ সে বাড়িতে মানুষ করবার মত ছেলেপুলে ছিল না। তারপর শেষে গিন্নীর সঙ্গে খিটিমিটি লাগলো, ছেলের বৌকে অন্যায়ভাবে খাটানো নিয়ে। কর্তা সংসারের কোন খবরই রাখেন না। তাঁর ছয়টি ছেলেমেয়ে। দুটি মেয়ের বিয়ে আগেই হয়েছিল গত বছর, সবে বড় ছেলেটির বিবাহ হয়েছিল। গিন্নী খুব জাঁহাবাজ। এখন তাঁর কাজ হয়েছে ছেলের বউটিকে শুধুই অবিশ্রান্ত খাটানো, তার উপর তাকে অসহ্য বাক্য-যন্ত্রণা দেওয়া। হরি বৌটিকে ভালবাসতো, যতটা পারতো

তার কাজে সাহায্য করতো, সেটাও হলো গিন্নীর চক্ষুশূল। কাজেই ঝগড়ার মুখে একদিন ; অমন গিন্নীর মুখে আগুন,—বলে সে তো বেরিয়ে গেল মাইনে-পত্তর কিছুই না নিয়ে। টাকার উপর আর তত মমতা ছিল না।

সেই বৌয়ের বাপের বাড়ি ছিল চাঁপাতলায়, সেখানে আগে সে কয়েকবার গিয়েছিল। এখন গিয়ে হরি তাদের মেয়ের দুঃখের কথা, শাশুড়ীর অত্যাচারের কথা,—কিভাবে কত কষ্টে আছে তাদের মেয়ে, প্রাণের আবেগেই সে সব কথাই জানালো। সবকিছু শুনে তারা তখন এই বলে হরির গায়ে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলে যে.—তারা ওসব কথাই জানে, ব্যাপার কিছুই তাদের অজানা নয়। কি করবে—তারা নিরুপায়। কুটুমের সঙ্গে ঝগড়া করে মেয়েটি গলায় বেঁধে কি গঙ্গায় ডুব দেবে ?

তাদের কথায় হরির অসহ্য হয়ে উঠলো। তারপর তারা যখন বললে, তুমি তো বাছা তাদের ঝি, তোমার এত মাথাব্যথা কেন বলতো ? ঝি চাকর, ঝি চাকরের মতই থাকো না কেন,—মানুষদের অতশত কথায় কাজ কি তোমার ?

হরির প্রাণে তখনও কার্তিককে হারানোর গভীর ক্ষত দগ্‌দগ্‌ করছে, সে পাগলের মতই বললে, তোমাদের গায়ে কি মানুষের চামড়া নেই গা ? মেয়ে ! মেয়ে বলে কি ফ্যালনা, আপদ বালাই ?—একটা মেয়ের জন্যে কত কত ঘরে হাহাকার পড়ে যায়,—মেয়ের জন্যে রাজত্ব বয়ে যায়,—জান না কি ? মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া, যার রাজত্বে বাস করছ, সেও মেয়েমানুষ !

যিনি মেয়ের মা,—হরির কথায় তার একটু যেন সহানুভূতি জেগে উঠলো,—তখন তিনি বললেন,—অদৃষ্ট মা অদৃষ্ট। অদৃষ্ট না হলে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে বিয়ে দিয়ে, আমাদের মেয়ের এ দুর্গতি হবেই বা কেন ? কথায় বলে, মেয়ে হলে সাত হাত মাটি নেমে যায়, আর স্বর্গে পিতৃপুরুষেরা দুঃখে মুখ নীচু করে থাকেন, আর ছেলে হলে সাত হাত মাটি উঠে যায়—পিতৃপুরুষেরা আনন্দে দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করেন।

কথাটা শুনেই হরির অঙ্গ জ্বলে উঠলো—সে বলে ফেললে, আমার এই আটাশ ত্রিশ বছর বয়স হলো, মেয়ে হলে সাত হাত মাটি কোথাও নামতে দেখিনি, আর ছেলে হলে সাত কেন এক হাত মাটিও কোথাও উঠতে দেখিনি। পিতৃপুরুষের কথা জানিনি মা, তাঁরা এখানকার পৃথিবীর এই নরক থেকে স্বর্গে গিয়ে আবার এই নরকের দিকেই চেয়ে থাকেন, কোথায় কবে কার ছেলে হচ্চে আর মেয়ে হচ্চে দেখে মাথা উঁচু আর নীচু করে থাকেন।

মেয়ের মা বললেন,—ওসব বামুন ঠাকুরদের বিধান মা,—

শুনে অসহ্য হলো হরির ; সে বললে, মুখে আগুন অমন বামুনের বিধান, যেখানে মেয়ে হলে সাত হাত মাটি নামে আর ছেলে হলে সাত হাত ওঠে। অমন বিধান নিয়ে কি ভাল হবে এ সমাজে ?

গিন্নীর অসহ্য হলো এবার এই ঝি মাগীর কথা শুনে। যা মুখে এলো তাই বোলে শেষে তিনি ঝাঁটা মেরে বিদায়ের ব্যবস্থা করলেন অমন ঝি-কে। তখন হরি বললে, যাচ্চি মা, ঝাঁটা আর আনতে হবে না, তুলে রেখে দাও। ঐ ঝাঁটা তোমাদেরই মাথার উপর পড়বে যখন সাতহাত মাটি উঁচু করা ছেলে, তোমার বড় হবে।

হরির বেকার অবস্থা ছিল দিন দুই। সে ছিল পূর্ণ অদৃষ্টবাদী। তার অসাধারণ মনঃশক্তি বলেই জানতো যে তার কখনও অন্নাভাব হবে না,—যেহেতু সে একলা এবং তার মনে পাপ নেই,—ভগবান তার ভার নিয়েছেন।

ইতিমধ্যে হরি আরও প্রায় দুই বৎসর তিন চার জায়গায় কাজ করেছিল, সব জায়গায় তাকে রাখবার আগ্রহও কম ছিল না, কিন্তু একটা না একটা বাধা এমনভাবেই এসে গেল যাতে টিকে থাকা সম্ভব হলো না। আসল কথা হরির মন বসলো না কোনখানে। শেষে যেখানে কাজ ছিল সেটা এক স্কুল-কলেজের মেস, মাইনে বেশী কাজও বেশী। কাজকে সে গ্রাহ্য করে না,—কিন্তু সে কাজও তাকে ছাড়তে হলো কারণ রাঁধুনির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ম্যানেজার বাবু হরিকে মাসিক কিছু টাকা দিয়ে বাঁধতে চাইলেন।

হরি ব্যাপার বুঝে নিয়েই সটান কালীঘাটে গিয়ে মাথা নেড়া করলে না বটে কিন্তু চুলগুলি খুব ছোট করে ছেঁটে একেবারে ঠিক ঠিক বিধবার বেশ ধারণ করলে। সাদা থান কাপড় সে আগেই ধরেছিল। এইবার তার মনে যেন একটা স্বাধীনভাবের হাওয়া বইতে লাগলো। শরীর মন হালকা,—আর অটুট গতর নিয়ে সে পেয়ে গেল একটা কাজ, দরজীপাড়াতে। ব্রাহ্মণের বাড়ি, যদিও সে বাড়িতে কর্তার মধ্যে ব্রাহ্মণের সদাচার বোলে কিছু ছিল না। এবারে হরি নূতন অভিজ্ঞতা নিয়ে ঢুকে পড়লো ঐ বাড়ির কাজে। ইতিমধ্যে কয়েক রকমের সংসার সে দেখেছে—এবারেও সে আর একরকম দেখলে। বৌ-পীড়নটা ছিল না বটে কিন্তু এখানে যে সব অশান্তির ব্যবস্থা ছিল তা আগের তুলনায় কিছু কম নয়।

এ বাড়িতে ছেলের বৌ বলে কাকেও সে দেখতে পায়নি প্রথমে, কারণ এদের বড় বৌ তখন বাপের বাড়ি প্রসব হতে গিয়েছে। কর্তা, গিন্নী দুজনেই বর্তমান, কিন্তু দুজনেই বিপরীত প্রকৃতির। তাঁদের পাঁচটি ছেলে তিনটি মেয়ে,—সকলগুলিই হরির চক্ষে অপরূপ। মেয়ে দুটির বিবাহ হয়েছে, শ্বশুর-বাড়িও তাদের কাছাকাছি, ছেলেপুলেও হয়েছে।

এক হপ্তাহ মধ্যেই হরি গিন্নীর মর্মস্থলে পেঁৗছে গেল,—গিন্নী বুঝলেন তাকে প্রাণের দরদ দিয়ে,—হরির পরিচয় পেয়ে গিন্নী অকপটে মনের দুয়ার খুলে দিলেন।

হরি দেখলে বাড়ির গিন্নী অপূর্ব, একটি অসহায় জীব,—তাঁর স্বামী-পুত্র-কন্যা সব থাকতেও কেউ যেন নেই, এ সংসারে তিনি একা। এমনটি হরি আর কোথাও দেখেনি। সহানুভূতিতে তার অন্তর ভরে উঠলো,—তার মুখে মা শব্দটি শুনে গিন্নী তাকে নিজের মেয়ে বোলেই স্বীকার করলেন,—মোটকথা হরিকে পেয়ে গিন্নী যেন একটি আশ্রয় পেলেন। একটু শুচিবায়ুপ্রবণ, এ ছাড়া আর কোন গোল নেই, হরি প্রথমদিনেই সেটি লক্ষ্য করলে। অতি ধীর শান্ত, জুজুবুড়ীর মত মানুষটি বিশেষতঃ স্বামীর কাছে গেলে, বোবা। তাঁর গলার স্বর, চার হাত তফাত থেকে শোনা যায় না। অগ্নিঅবতার কর্তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হলে থরথর করে কাঁপতে থাকে তাঁর অঙ্গ। গিন্নীর প্রধান কর্ম ছিল পূজাপাঠ,—আর তাঁর চারিদিকের শুচিতা রক্ষা করা।

কর্তা হলেন একেবারেই বিপরীত, বড় ভয়ংকর মূর্তি—স্ত্রীকে অধিকাংশ সময়, কারণে-অকারণে বিরক্ত হলেই—হারামজাদি, তখনকার দিনে প্রচলিত রূঢ় সম্বোধন করতেন। ক্রোধান্ধ হয়ে উঠতে তাঁর বেশীক্ষণ লাগতো না, আবার ঠাণ্ডা ভালোমানুষ হতেও তাঁর বেশী বিলম্ব হতো না। কখনও কখনও স্ত্রীর প্রতি বেশ পত্নীগতপ্রাণ স্বামীর মত,—ও গো শুনচ ? এসনা বলি একটা কথা। এই ভাবের কথাও হরি শুনেছে,—কিন্তু সেটা কমের ভাগই। কর্তা হরিকেও প্রথম প্রথম, মা হরি, আমার চায়ের জলটা দিয়ে যাও ত মা, এইরকম মিষ্ট কথা,—তার কয়েকদিন পর ঠিক তাঁর মনোমত কিছু একটা করতে পারেনি বোলে, তখনই হারামজাদি ইত্যাদি সম্ভাষণ, শুনে হরি হেসেই আকুল হয়েছে। কি অদ্ভুত মানুষ, মাগো! ছেলেগুলিও মনমেজাজে ঐ বাপের ধাঁচা, উপরন্তু প্রত্যেকটি প্রত্যেকেরই যেন প্রতিবাদ মনে হতো হরির। মোটের উপর ঐ অসহায় গিন্নী আর ছোট ছেলেটির জন্য ,হরির এইসব ব্যবহার-বৈচিত্র্য তার ঐ গৃহস্থালিতে কিছুদিন থাকবার পক্ষে সহায়তাই করেছিল।

বড় ছেলেটি আর্টিস্ট, পেণ্টার। ছবি আঁকার কাজ করে,—বাড়িতে থাকে বটে কিন্তু সব থেকে সে আলাদা ;—কারো সঙ্গে বেশী কথা নেই, যতটুকু থাকে নিজের কাজ নিয়ে—খাওয়া আর শোয়া ছাড়া বাড়ির সঙ্গে সম্বন্ধ নেই। আর মেজবাবুই সংসারের ঠিক কর্তা। বড়ই রোগা, এমন কি জোরে কথা কইতেই তার হাঁপ লাগে। হাটবাজার, সংসারের সকল কিছুর ভার তার উপর। তারপর সেজটি আর এক রকমের, তিনিও চাকরী করেন, সংসারে কিছু দেন না, কিছু নেন না,—কোন সম্বন্ধ নেই তার কারো সঙ্গে। তেতলায় একখানা ছোট ঘরে—একটি স্টোভ আছে তাইতেই রেঁধেবেড়ে খান। সকালে বাড়িতে থাকেন দুপুরে আপিস যান। কাশি আর হাঁপানী এই জোয়ান বয়সে,—মেজ আর সেজটিকে যেন ফোঁপরা করে ফেলেছে! দেখে দুঃখ হয়,—আর তাদের ব্যবহারে, বদমেজাজের দাপটে এক এক সময় সংসারে মহা অশান্তির সৃষ্টি করে—দেখে তার আশ্চর্য লাগে। চতুর্থ ও পঞ্চমটির পাঠ্যাবস্থা। কিন্তু তারাও দাদাদের ঠিক উপযুক্ত ভাই।

অত্যাচার,—তাকে মাঝে মাঝে সহ্য করতে হতো—বিশেষতঃ ঐ ছোট দুটির কাছ থেকেই,—কারণ ঐ দুটি ছোট হলেও অসাধারণ দুষ্ট প্রকৃতির। একজন দুর্দান্ত দ্বন্দ্বপ্রিয়, দুঃসাহসী, ফট করে যাকে-তাকে মেরে বসে। তার নীচের যেটি রোগা, তারও মেজ ও সেজটির মত ঐ হাঁপ, কাশি, দুর্বল শরীর, মুখ-সর্বস্ব। কাজের বেলা ভিজে বেরালের মত, ধূর্ত প্রকৃতি,—এই ছোট বয়সেই সে এমন দুর্মুখ আর কুচক্রী হয়ে উঠেছিল হরি তা দেখে অবাক হয়ে যেতো। ছোটদাদাবাবু বোলেই হরি তাকে আদর করে ডাকতো।

খিদে পেয়েছে তার,—কাঁদছে। মা পূজায় বোসেছেন—উঠে খাবার দেবেন, তার আর তর সয় না। সে আর্তনাদ, নাচুনী, ঘ্যানঘ্যান এইসব শুরু করে দিলে। হরি বললে, এস দাদাবাবু আমি খাবার দিচ্চি। দু' পয়সার খাবার এনে তার হাতে দিয়ে বললে, খাও। সে বেশ করে খেয়ে নিয়ে বোললে ;—হারামজাদি, তোর মুখে জুতো-সুদ্দু লাথি মারবো। হাসির চোটে হরির পেট

গুলিয়ে উঠলো, সে বোলে ফেললে, ওটা তোমার দোষ নয় ছোট দাদাবাবু,—যাও খেলা করোগে। গিন্নী এসব দেখে-শুনে, পূজা থেকে উঠে এসে ঘরের বাইরে দাঁড়ালেন,—তাঁর কাজ এতক্ষণে হয়ে গিয়েছিল, শুনছিলেন তাঁর ছোট ছেলের কথা, —এখন বললেন,—মুখে আগুন অমন ছেলের, যেমন দেখচে তেমনি শিখচে আর হচ্চেও তেমনি ; কি জানো, আকরে টানে মা, আকরে টানে। বোলে হরিকে পয়সা দিতে এলেন। হরি বললে, ষাট্ ষাট্, মুখে আগুন বোলো না মা,—ছেলেমানুষ ওরা, জ্ঞান কি ওদের ! এইভাবে হরি বছর দুই কাটালো এ-বাড়িতে।

তারপর একদিন হরি, গিন্নীমাকে এক বিপদ থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে কর্তাবাবুর বিষনজরে পড়ে তার চাকরীটা খোয়ালো। গিন্নী, গোপনে একজনকে কিছু টাকা দিয়েছিলেন একটা হার বাঁধা রেখে। হরিকে তাগাদায় পাঠিয়েছিলেন অনেকদিন তার খবরাখবর না পেয়ে। খোঁজ করে হরি টের পেলে ভদ্রঘরের মেয়ে সেজে থাকে বটে কিন্তু সে ব্যক্তি একটা জুয়াচোর, তার কাজই ঐ ভদ্রঘরের মেয়েদের কাছ থেকে ঝুটা গয়না রেখে টাকা নিয়ে সরে পড়া। হরি এসে বললে, দেখি মা গয়নাটা ? গয়না তখন কালোবরণ হয়ে এসেছে। সেটা কেমিকেল ছিল।

বড় বিপদে পড়ে এসেছি মা, চার ভরির হারটা রেখে আমায় দশটা টাকা দাও,—কাল না হয় পরশু ছাড়িয়ে নিয়ে যাবো আমার স্বামী মাইনে পেলে। গিন্নীর দয়া হলো তার বিপদের কথায়, ফলে টাকাটা গেল। কথাটা কর্তার কানে গেল,—গিন্নীর ছোট মেয়েটির মারফত। কর্তার সন্দেহ হলো হরিই এই কাজের মূলে আছে। ফলে,—বেরোও হারামজাদি আমার বাড়ি থেকে।

এবার বোধহয় হরির প্রতি বিধাতার একটু কৃপাদৃষ্টি পড়লো। কারণ এবারে হরি যেখানে আশ্রয় পেলে সেখান থেকে তাকে আর কোথাও যেতে হয়নি। এটা হলো গিন্নীর মেজ মেয়ের শ্বশুরবাড়ি। এখানে দুই ভাইয়ের সংসার। বৃদ্ধ কর্তা বড় কারবার আর টাকাকড়ি রেখে সম্প্রতি মারা গেছেন। কারবারী লোক তারা, বেশ বড়ই বসতবাড়ি, তাছাড়া আরো তিনচারখানা বাড়ি আছে তাদের, ভাড়া দেওয়া। ঐ ফুলবাগানের গলির মধ্যে সারি সারি বাড়ি তিনখানি। ঘরে গাড়িও একখানা আছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি দিদিমণির ;—বেশ ফুটফুটে চেহারা। সুন্দর রূপ দেখে, লেগে গেল হরি মনের আনন্দে। দিদিমণিই এখানকার বড় বৌ। তারই তৃতীয় সন্তানটির উপর পড়লো তার মন। তার মুখখানি দেখেই হরি আবার বাঁধা পড়ে গেল। ভাল নাম তার আদ্যনাথ, আদি বোলে ডাকা হতো। দেখতে দেখতে আদিও বিলক্ষণ অকৃত্রিম ন্যাওটা হয়ে উঠলো হরির।

· গোপীনাথ বড় আর শ্রীনাথ ছোট। দুইটি ভাই, বড় বড় জঙ্গল জমা নিয়ে রেলের স্লিপার সরবরাহ করা, আসলে ঠিকাদারি তাদের কাজ। দুই ভাই—দুই বৌ। দুজনেরই ছেলেতে মেয়েতে ঘর-ভরা, তবে হরির যিনি মা, বলেছি তিনিই বড় এখানকার, তারই সন্তান-ভাগ্য প্রবল। তিনি বড়বাবুর দ্বিতীয় পক্ষের। বড়বাবুর প্রথম পক্ষের দুটি সন্তান, একটি ছেলে দশ বছরের, নাম তার সিতু, আর একটি মেয়ে বয়স প্রায় বারো, নাম তার কুমুদ। দ্বিতীয় পক্ষেও

প্রথমেই মেয়ে বেলা, এখন আট বছরের,—তারপর কোলে উপস্থিত পর পর চারটি ছেলে। কালী, শ্যামু, আদি ও শিবু। এই আদির সঙ্গেই হরির সম্বন্ধ হয়ে উঠলো বড় ঘনিষ্ঠ। কোলের ছেলেটির উপরেই এই আদি—তাকে নিয়ে মানুষ করতে লেগে গেল হরি। এখানে হরির মনটা বসলো, হরি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো, দরজীপাড়ার সেই ছোট্ট ঘুপসী বাড়ি থেকে এসে, বড় বৌকে মা বলে তার প্রাণটা জুড়লো। ছোট বৌ একটু গুজগুজে স্বভাব। তাতে একটু কালা তার উপর রুগ্ন। দেখতে শুনতে মন্দ নয়। দুই জা-ই গৌরবর্ণ তবে বড় বৌ কমলশশী, এখানে কমলা বোলেই শ্বশুর ডাকতেন—দেখলেই মনে হয় স্বাস্থ্যবতী,—তার সকল কাজ গোছালো আর কথাবার্তা মিষ্ট। এখন আদিকে নিয়েই হরির সকল কাজের মধ্যে কাল কাটতে লাগল। এইভাবে দুই তিন মাস কাটিয়ে দিলে।

দুজন ঝি, বাসন মাজা, কাপড় কাচা থেকে সেই সংসারের সকল কাজই প্রত্যহ নিয়মিতভাবেই করতো। তার মধ্যে হরি আদির সকল উপদ্রবই সহ্য করতো, তাকে নিয়ে প্রত্যহ হাওয়া খেতে বিকেলে কোম্পানীর বাগানে যেতো। আর একজন ঝি, ছোট বৌয়ের ছেলেমেয়েদের নিয়ে যেতো। সন্ধ্যায় আবার ফিরে এসে সংসারের কাজে লেগে যেতো।

অন্যান্য গুণের মধ্যে আগেই তা পরিচয় পাওয়া গিয়েছে—হরির বিশেষ গুণ এই ছিল যে, সে যেখানে থাকবে, পরের সংসারে ঝিয়ের মত নয়, এভাবে সে থাকতেই পারতো না কোথাও। সে যেখানে থাকবে সেটি যেন তার নিজের সংসার।

একদিন সকালের দিকে হরি বাসন মাজছিল। দু'জনের এই কাজটি কিন্তু ঐদিন আর একজনকে দেখা গেল না, তা সত্ত্বেও যথাসময়ে হরি আরম্ভ করে দিলে। খানিক পরে আদি একটা বড় শব্দ করে পড়ে গেল—তার খুবই লেগেছে, সে কোঁকিয়ে কেঁদে উঠল—বড় গিন্নী ঠাকুরঘরে ঢুকছেন তিনি এখন বেরুবেন না কিছুতেই, কাজেই হরি তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে গিয়ে তাকে দেখতে গেল,—তার দাড়িটা কেটে গেছে। তাড়াতাড়ি হরি যথাযোগ্য ব্যবস্থা করলে—তারপর তাকে নিয়ে ভোলাতে বসে গেল। এমন সময় ছোট গিন্নী উপর থেকে নামলেন। আ-মাজা বাসন দেখেই যেন কিছুই জানেন না এমনভাবে হরির ওপর তম্বি করে বলে উঠলেন, এ কি অন্যায়, এখনই সকলে খেতে আসবে, আফিস ইস্কুলের ভাত দিতে হবে,—এমন করে বাসন ফেলে ঝি গেল কোথায়? এ সব ঝি নিয়ে কি হবে? ছি ছি—

দোতলা থেকে হরি তার হুকুমদারী গলায় বললে,—আমি তো আর একলা ঝি নয় আরও ঝি একটা তো আছে ছোটমা,—আমি এখন ছেলেটাকে দেখচি, আহা বড্ড পড়ে গিয়েছে গো। ছোটমার অপমানবোধ হলো, বড়কে শুনিয়ে বললেন—কি এত বড় স্পর্ধা, আমায় দোতলায় বসে হুকুম করা হচ্চে অন্য ঝি ডেকে বাসন মাজিয়ে নিতে,—দিদি তো আর এসব দেখবে না। আমার ছেলে কেঁদে কেঁদে মরে গেলেও কেউ একবার দেখেও না। হরি চুপ করে থাকবার মেয়ে নয়,—এই কথা শুনে বললে, হ্যাঁগো ছোটমা, তোমার ছেলেপুলেকে কেউ দেখেও না, যত্নও করে না তারা সব হাওয়ায় আপনা-আপনি মানুষ হয়ে যায়।

এখন তোমার সদু ঝিকে ডেকে বাসনগুলো মাজিয়ে নাও,—এখান থেকে আমি যেতে পারবো না তো, আজ এখনই আদিকে নাওয়াতে হবে যে।

আসলে তখন ছোটমা সদুকে নিজের এক কাজে পাঠিয়েছেন, হয় তো তার আসতে দেরিও হবে, এখন সেটা প্রকাশ হওয়াও অভিপ্রেত নয়, কাজেই তাকে একটু বিজ্ঞলোকের মতই ব্যবহার করতে হলো। তিনি বললেন, কে কোথায় আছে আমি কোথায় খুঁজতে যাব,—ছেলেকে শান্ত করে তুমিই এসে মেজে দেবে অখন। হরি কিন্তু সেদিক দিয়েই গেল না—সে বললে, বললুম তো ছোটমা আমায় চান করিয়ে দিতে হবে আদিকে,—তারপর সে ঠাকুরকে উদ্দেশ্য করে বললে, এক গামলা জল চড়িয়ে দাও তো ঠাকুর, আদি চান করবে।

এমন সময়, কি হয়েচে! কি হয়েচে! করে ছোটবাবু এসে ঢুকলেন অন্দরে। সকল বিষয়েই তিনি তো কর্তা, হামবড়িয়া ভাবটি তাঁর স্বভাবগত। ছোট গিন্নী এইবার সুবিধা বোধ করে খুব একচোট হরির স্পর্ধার কথা,— আর এসব বিষয়ে বড় বৌয়ের উপেক্ষার কথা বেশ রসান দিয়ে বর্ণনা করে ছোটবাবুকে উন্মুখ করে দিলেন। শুনেই ছোটবাবু একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন,—তিনি হরিকে ডেকে, এই হরি, হারামজাদি—বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে, চাই না তোর কাজ।

খবরদার ছোটবাবু, ওরকম ছোটকথা বোলে গালাগাল দিও না বলছি ঃ— আমরা গরীব সত্যি,—কিন্তু ইতর নীচ কোন ছোট জাত নয় আর তোমাদের বস্তির ঠিকে ঝিও নয়। এ কথাটা যেন মনে থাকে।

হরি এতদিন এখানে আছে—সে দুই ভায়ের সব রকম ব্যবহারই দেখেছে। দুই ভায়ের প্রীতির ব্যবহার, অপ্রীতিমূলক ব্যবহার-বচসা দুই-ই দেখে এসেছে কিনা সেইজন্য সে ঐ কথাটা বার করতে পেরেছিল। তার কথা শুনে ছোটবাবু গলার স্বর দ্বিগুণ চড়িয়ে দিলেন,—এখনি বেরো বাড়ি থেকে, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা, বড়বৌ ঝিকে একেবারে মাথায় তুলেছে।

হরি এসব কথা গায়েই মাখলে না। হ্যাঁগো হ্যাঁ ছোটবাবু, মনে কোরেই নাও না যে আমি বেরিয়ে গেছি, এখন যা কোরলে ভাল হয় তাই করো। মিছি-মিছি মাথা গরম করতে নেই গো, সক্কালবেলা,—যাও আপন কাজে যাও।

বড়মা এমন সময় বেরিয়ে এলেন। আদেশসূচক কোমলকণ্ঠে বললেন, যা, এখনই বাসনগুলো আগে মেজে দিয়ে আয়—তারপর আদিকে চান করাবি। সুড়সুড় করে হরি বাসন মাজতে গেল। ব্যস সবই শান্ত হলো।

এই ধরনের ব্যাপার হরির সঙ্গে প্রায়ই ঘটতো।

হৃষ্টপুষ্ট বাড়ন্ত ছেলে আদি, বেশ বাড়ছিল। ক্রমে ক্রমে যখন সে প্রায় আড়াই বছরেরটি হয়েছে, কেমন যেন তার দেহ খয়ে যেতে লাগলো। রোগা হয়ে গেল, অমন হৃষ্টপুষ্ট ছেলে একমাসের মধ্যে শীর্ণকায় কঙ্কালসার হয়ে পড়লো। ডাক্তার একবার দেখানো হলো বটে কিন্তু কোন ফলই হলো না। ছেলে কেন এমনটা হলো কেউ বুঝতেই পারলে না।

বড়বৌ-এর একটা অপর দিকও আছে। তিনি মোটেই ডাক্তারের ভক্ত নন, যেমন ডাক্তার ভক্ত ছোটবাবু আর ছোটগিন্নী। তিনি ছেলেপুলেদের ডাক্তার

দেখাতে রাজী নন, অবশ্য আগেও তাঁর ছেলেপুলের অসুখে কখনও ডাক্তার দেখাননি, নিজেই চিকিৎসা করেন, কি যে করেন কেউ তা জানে না। তবে সেরে ওঠে। অথচ সংসারে ছোটবাবুর ছেলেপুলের অসুখে প্রতিমাসে পঞ্চাশ ষাট সত্তর অবধি খরচ হয়—আর বড়বৌয়ের ডাক্তার খরচ নেই বললেই হয়। ছেলেপুলের অসুখে যদিও ছোটবাবুর জেদে ডাক্তার আনা হয়, দেখানো হয়, ওষুধ খাওয়ানো কখনও হয় না। ডাক্তার ভিজিট পায় কিন্তু ঔষধ-বাবদে আর কিছুই পায় না বড়বাবুর সংসারে। এখন ব্যাপারটা গুরুতর দাঁড়িয়ে গেল আদিকে নিয়ে।

হরির ছটফটানি বেড়ে গেল,—কি হবে বড়মা, কেন এমন হলো, ছেলেটাকে নিশ্চয় ডাইনি লেগেছে। এইসব ব্যাপারে—নানা রকম জলপড়া, মন্ত্রতন্ত্র চলতেই ল্যাগলো, কিছুতেই কিছু হয় না—হরি ত' আহার-নিদ্রা ত্যাগ করার যোগাড়। এখন হরির ঘর পোড়া গরুর অবস্থা হলো।

যাকে পায় তাকেই শুধায়—হ্যাঁগা তোমরা জান কিছু? শেষে কোথায় এক আভিচারিক ব্রাহ্মণের সন্ধান পেয়ে তাকে তাদের বাড়ির ঠিকানা দিয়ে এলো যাতে শীঘ্র শীঘ্র তিনি এসে ছেলেটিকে দেখে যান। তারপর একদিন সকালে একজন ব্রাহ্মণ,—হ্যাঁ গা, এ বাড়িতে আদ্যনাথ বোলে একটি ছেলের অসুখ আছে? এই বোলে ঢুকলো। বড় বৌয়ের কাছে খবর গেল। তাকে ডেকে ভিতরে এনে আদিকে দেখানো হলো। তিনি বললেন, মহামাংস অর্থাৎ নরমাংস খেয়েছে ঐ ছেলে, তাই এই রকম হয়েছে। কোথায় পেলে? ছাদের উপর হয়ত কাক, চিল, শকুন,—পাখি-পক্ষীতে এনে ফেলেছিল, ঐ ছেলে ছাদে খেলা করছিল, কুড়িয়ে খেয়ে থাকবে। এখন যা যা করতে হবে তার ব্যবস্থা করে, তাঁর দক্ষিণা নিয়ে তিনি চলে গেলেন। তারপর ক্রমে ক্রমে আদি সেরে উঠলো, হরিরও প্রাণ ঠাণ্ডা হলো। আদিকে নিয়ে প্রাণে উদ্বেগের সীমা ছিল না, এখন হরির চক্ষে সংসাব মধুময় হয়ে উঠলো আবার।

এইভাবে আরও দু আড়াই বৎসর কাটলো।

বড়বাবুর প্রথম পক্ষের মেয়ে কুমুদিনী, তার এখন বিয়ের কথা হচ্ছে। ছোটবাবু এই ভাবটাই দেখান, বাবা যখন আবার বিয়ে করেছে তখন ছোটবাবুই তাদের বাপের মত, যথার্থই অভিভাবক। বড়বাবু যদি সিতুর সম্বন্ধে কিছু বলেন তৎক্ষণাৎ ছোটবাবু প্রতিবাদ করবেন। নীল রংয়ের একটা সাটিনের জামা তাই পরে সিতু যাবে স্কুলে, বায়না ধরেছে। বড়বাবু বললেন,—ছি বাবা, স্কুলে কি জমকালো জামা পরে যায়? স্কুলে সাদা জীনের কোট পরে যেতে হয়। ছোটবাবুর জেদ চেপে গেল—হ্যাঁ, ও যাবে সাটিনের জামা পরে। বড়বাবু দেখলেন ব্যাপারটা নিয়ে ছোটবাবু বাড়াবাড়ি করতে চান, তিনি আর কথা কইলেন না ; তামাক টানতে লাগলেন। ছোটবাবু ধুমধাম করে সিতুকে স্কুলে পাঠিয়ে তবে নিশ্চিন্ত। এইভাবেই ছোটবাবু সিতুকে বড় করে তুলেছেন বাপের উপর টেক্কা দিয়ে ;—বাপের দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহের খোঁটা,—একপক্ষের সন্তানগুলির উপর স্নেহই বেশী এই জাহির করাই তাঁহার কাজ।

হরি যখন ছোটবাবুর কায়দা-কানুন বুঝে নিল,—মনোভাবের পরিচয় পেলে

তখন থেকে সে এমন কৌশলে এদের এড়িয়ে চলতে আরম্ভ করলে যাতে ছোটবাবু এবং ছোটগিন্নী নিজেদের বড়ই ছোট মনে করতে লাগলেন। একদিন সে গিন্নীর সম্মুখেই বোলে ফেললে, ছোটবাবু! বাপকে অপমান করে তারই সম্মুখে যে ছেলেকে এতটা আস্কারা দিয়ে উলটো দিকে চালালে তাতে তোমার প্রাণ ঠাণ্ডা হলো সত্যি সত্যি, কিন্তু বাপের প্রাণে যে ঘা লাগলো,—তার ধাক্কা সামলাবে কি করে?

হরির কথায় চটে আগুন হবার মত অবস্থা ছিল না তখন ছোটবাবুর, একথাটা জানতো হরি,—তাই সে বলতে পেরেছিল।

কুমদিনীর বিয়ে—ছোটবাবু সর্ববিষয়েই কর্তা, বড়বাবুকে কোন বিষয়েই কথা কইতে দিচ্ছে না। তিনিই যেন অভিভাবক, পাত্র পছন্দ থেকে বিবাহ এবং সারা বছরের তত্ত্ব পর্যন্ত সব ছোটবাবুর কর্তৃত্বে সম্পন্ন হয়ে গেল। সিতু আর কুমুদ বড় হয়ে তারা কাকার মহিমা বুঝেছে;—কিন্তু বাল্যাবস্থাটা ছোট-বাবুর খপ্পরে তারই প্রভাবে তারা চলেছিল। বড় বউকে কম দুঃখ পেতে হয়নি ছোটবাবুর ব্যবহারে যদিও নিজগুণে বড়বৌ সকলকে আপন করেই নিয়েছিল।

* * *

এই ভারতের সর্বত্রই লক্ষ্মীর অপর নাম চঞ্চলা। তাঁর যাওয়া-আসা-থাকা, বাড়া-কমা বড় অদ্ভূত, বিশেষতঃ—কারবারী যারা তাদের ঘরের লক্ষ্মী আবার চপলার মতই চঞ্চলা।

হরি যখন ছয় সাত বছর আগে এসেছিল এদের সংসারে—তখন একখানা ঘোড়ার গাড়ি ছিল; এখন বেশ বড় এক ওভারল্যাণ্ড এসেছে, আবার একখানা বুইক কেনবার কথা হচ্ছে কারণ গাড়িখানা অফিসের কাজেই থাকে—বাড়িতে মেয়েদের কোথাও আসা-যাওয়ার দরকার হলে অফিস-গাড়ি ফেরবার অপেক্ষায় থাকতে হয়—তাই কথা হচ্ছিল আর একখানা গাড়ি হলে বেশ হয়। অবশ্য বড়বৌএর তত মটোর গাড়ির টান নেই, তার ওপর আবার মেয়েদের জন্য আলাদা গাড়ি করবার পক্ষপাতী মোটেই নন। তাঁর বাপের বাড়ি যাওয়া, তা একখানা ভাড়া গাড়িতেই চলে। ছোটগিন্নীর আর ছোটবাবুরই ঝোঁক বেশী। তার একটু কারণ আছে। ছোটবাবুর শ্বশুরবাড়ি গরীব বটে কিন্তু ছোটবাবুর ভায়রাভাই বা শালীপতি ভাই একজন সমাজবরেণ্য স্যার উপাধিধারী কোটিপতি। অবশ্য তাঁদের সুখৈশ্বর্যের তুলনায় এরা নগণ্য—মোটার হলে ছোটগিন্নী দিদির বাড়ি যাবেন নিজের গাড়িতে। সাধ কিছুই বিচিত্র নয়।

যাই হোক এই সময়ে লাগলো আবার বড়বাবুর এ পক্ষের বড় মেয়ে বেলার বিয়ে, বেশ ধুমধাম করে হয়ে গেল। এ বিয়েতেও কর্তা হলেন ছোটবাবু। এ জামাইটিও এটর্নী, ধনী লোকের সন্তান,—তবে বিপত্নীক শ্বশুরটি বাইরে যেমন সভা-উজ্জ্বলকারী জাঁদরেল চেহারা, ভিতরের ব্যবহারে কিন্তু বিপরীত। বেলা মেয়েটি ঐ শ্বশুরের ব্যবহারে সারাজীবন সুখী হতে পারেনি, যদিও তার শাশুড়ী বহুকাল গত। বৌ-কাঁটকী শাশুড়ী শোনা যায়—এ হল বৌ-কাঁটকী শ্বশুর! ছেলে বা পাত্র বা জামাইটি পিতৃভক্ত, অবশ্য তার উপর আবার যে পিতা ধনবান

সে পিতার বাধ্য হওয়া ছেলের পক্ষে অতি স্বাভাবিক, তার ওপর এখনও ছেলের উপার্জনের সময় আসেনি, পিতার মুখাপেক্ষী থাকতেই হয় সকল ব্যাপারে।

নতুন বৈবাহিকটি স্বর্গত স্ত্রীগত প্রাণ, স্ত্রীর কথা উঠলেই প্রিয়ার গুণ-কাহিনী বলতে ভালবাসেন, আর তাই বলতে বলতে কেঁদে ভাসিয়ে দেন। সে যে কত গুণের ছিল বলতে বলতে তিনি একদা হরির কাছেই কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন। হরি এ সব শুনে চুপি চুপি এসে বড় বৌকে বলে গেল, মা—বেলা শ্বশুরের ব্যবহারে কখনও সুখী হতে পারবে না। হয়েছিলও তাই। তাছাড়া বেলা ছিল অত্যন্ত সরল গোবেচারী গোছের মেয়ে, কুমুদিনীর মত চালাক-চতুর মোটেই নয়।

যাই হোক এখন এই বিবাহ চুকে যাবার পর দুই ভায়ে বাধলো ঝগড়া, —তুমি কেন এত টাকা খরচ করেছ ;—এই নিয়ে ছোটবাবু এমন ভাষা প্রয়োগ করতে লাগলেন যা দাঁড়িয়ে শোনাও মুশকিল। আসল কমপ্লেন এত টাকা খরচ করে এতবড় ঘরে বেলাকে দেবার কি প্রয়োজন ছিল—ষাট টাকা মাইনে, সওদাগরী অফিসে কাজ করে ম্যাট্রিক পাস একটি পাত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ এনেছিল ছোটবাবু, সেখানে দিলে দু'আড়াই হাজারে হতো, তা না করে এতটা বড় ঘরে এম-এ, পাস এডভোকেট পাত্র করবার কি প্রয়োজন ছিল ?—কুমুদিনীর যে বড় ঘরে বিবাহ হয়েচে তাতে কোন ক্ষতি হয়নি—সে মা-মরা মেয়ে কিনা, যেহেতু এর মা আছে, সুখেই আছে এ মেয়ে কেন এমনভাবে ধুমধাম করে দেওয়া ? যে বিষ উদ্গিরণ করলেন ছোটবাবু, বড়বৌ আর দাদাকে নিয়ে যে কঠিন কঠিন কথা বললেন তাতে সেদিন তাঁদের পেটে আর অন্ন গেল না।

এ ক্ষেত্রে একটা কথা রাগের মাথায় ভুলে গেলেন যে তাঁর বাবা মরবার সময় বলে গিয়েছিলেন, দেখ বাবা, বড়বৌ এ সংসারের লক্ষ্মী, কখনও তাঁর মনে কোন কষ্ট দিও না। তাঁর ব্যবস্থার কোন প্রতিবাদ করো না আর এ কথাটা কখনও ভুল না। হরির সুমুখেই এ সব না হোক সে এসব ইতিহাস অনেকবার প্রথম এসে অবধি অনেকের মুখেই শুনেছে। মনে মনে আগুন হয়ে আছে সুযোগ মত একথা ছোটবাবুকে শোনাবে বোলে। ঝগড়াতেই দিনটি গেল। সেই রাত্রি থেকে ছোটবাবুর এলো প্রবল জ্বর। পরদিন সকালে তিনি হলেন অচৈতন্য।

ছোট বউ এসে,—দিদি কি হবে ? বোলে দাঁড়ালেন। ছোটবাবুর ডাক্তারে চির বিশ্বাস তাছাড়া তার ভায়রাভাই ভারতপ্রসিদ্ধ ডাক্তার। বড় বউ বললেন, ভয় কি—সব সেরে যাবে। তারপর ডাক্তার আনবার ব্যবস্থা, পরে সংসারের সব কিছুই ব্যবস্থা করে দিয়ে বসলেন দেওরের মাথার শিয়রে। যখন ছোটবাবুর চৈতন্য হলো, চক্ষু চেয়ে প্রথমেই দেখলেন বড়বৌ, মাথায় আইসব্যাগ দিচ্ছে আর ছোটবৌ পাশে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। বড়বৌ ? বলে একবার ডেকে ছোটবাবু তাঁর ডান হাতখানি ধরে—একবার মাথায় একবার বুকে ঘষতে লাগলেন। তারপর আস্তে আস্তে তিনি উঠছেন, দেখে, আহা করকি, উঠো না ঠাকুরপো শুয়ে থাকো, ডাক্তার বারণ করেছে। কে শোনে তাঁর কথা,—উঠে বসে বড়বৌয়ের পায়ে মাথা ঘষতে লাগলেন। বল, আমায় ক্ষমা করলে, তুমি না ক্ষমা করলে আমার

অসুখ সারবে না। বল, ক্ষমা করবে বল বল। অহংকারের বশে কত কথা বলে আমি তোমার মনে বড় কষ্ট দিয়েছি, আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছিল, আমার পাতকের ফলে আমার এই অসুখ। তুমি আমার মা,—বল তুমি আমায় ক্ষমা করলে, বল বল।

বড়বৌ সযত্নে ধরে ধীরে ধীরে ভাল করে শুইয়ে, সান্ত্বনা দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করলেন। আত্মগ্লানির পরাকাষ্ঠা দেখালেন ছোটবাবু। বড়বৌ জানতেন এমনটাই ঘটবে। তিনি তো ভালমতেই চেনেন দেবরটিকে। যাই হোক তাঁর জ্বর সেই রাতেই না হোক পর দিন ছেড়ে গেল। তিনি ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠলেন।

সেরে উঠলেন ছোটবাবু। বেশ শান্তির হাওয়া বইতে লাগলো কিছুদিন। তারপর থেকে আবার ঠিক যে সেই। তিনমাস পরে তুচ্ছ এক ব্যাপার নিয়ে গুরুতর করে তুললেন। বড়বৌয়ের কাপড় এসেছে, ছোটবউয়েরও এসেছে, একই দাম, একই মার্কা কেবল পাড় আলাদা। বড়বৌয়ের নাকি পাড়টা ভাল হয়েছে ছোট বউ অনুযোগ করেছেন।—এ কেমন কথা? এতটা ব্যাপার কেন? কাপড় কিনেছে সরকার। সে ব্যক্তি যে বড়বৌয়ের মামারবাড়ির দেশের লোক এই তার অপরাধ। সরকারকে খুব একচোট নেওয়া হলো তারপর দাদাকে আর বৌদিকে অপরাধী করা হ'লো কারণ তাঁদেরই এই চাতুরীটা, এতো স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে।

এইভাবে আরও বছর দুই চললো, তারপর এলো ছোটবাবুর এক মেয়ে কুচির বিয়ে। এবার তিনি মনের সাধে খরচ করতে লাগলেন। বিবাহ হ'লো খুব ধুমধাম করে। তারপর কুটুমের খাতির-যত্ন চললো কিছুদিন। এই কুচির বিবাহই সংসারে এদের একটা বিপরীতমুখী পরিবর্তন এনে দিলে।

তারপর কিছুদিন যায়, এতটা ধুমধাম করে যে ছোটবাবুর মেয়ের বিবাহ ব্যাপারটা হয়ে গেল, হরির কিন্তু কোনদিকেই কোন উৎসাহ নেই। শরীর খারাপ বলে দিন কতক সে শুয়ে-বসে রইল গোমড়া মুখ করে;—তারপর কাজকর্ম সবই করে যেতে লাগলো, কিন্তু তার মধ্যে কোন উৎসাহ নেই।

কিন্তু তার মধ্যে ঐ যে বিমর্ষ ভাব সেটা কারো চোখ এড়ালো না। বড়বৌ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েচে রে হরি? ছোটবাবু কিছু বলেচে? হরি বললে, ছোটবাবুর আমাকে বলবার কি আছে মা।

তবে কি? হরি কিছুই বলে না। একদিন ঠিক তাগ্ করে যখন বড়বৌ ঠাকুরঘর থেকে বেরুবেন,—দরজা খুলেই দেখেন সুমুখে হরি দাঁড়িয়ে, বড় ম্লান মুখ তার।

হরি একেবারে চৌকাটের ওপর দাঁড়িয়ে উঠলো, বড়বৌয়ের হাতখানা খপ করে ধরে ফেললে। মা তোমার গহনা কোথা? শুনেই বড়বৌয়ের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল—তিনি বললেন,—কেন তোর তাতে দরকার কি? সব তোলা আছে সিন্দুকে। হরি বলে, আমি দেখবো দেখাও আমাকে। বড়বউ বললেন, আমার কি এখন কাজ নেই হরি—এটা কি দেখাবার সময়?

কেন? এই তো ঠাকুরঘরেই রয়েছে, এই ঘরেই তো সিন্দুক, দেখাও না মা? একবার দেখাও আমার মাথা খাও।

তার মা কিন্তু দেখালে না—এখন সময় নেই, আর একদিন তখন দেখিস, বলে বড়বৌ বেরিয়ে এল ঘর থেকে। হরি অবাক হয়ে চেয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে।

মা! বলে ডাকতেই বড়বৌ ফিরে দেখলে—হরি বললে, আমার কাছে লুকুতে পারবে না মা, আমি জানি। বড়বৌ বললে, হরি কাজে যা তুই, আমাকে আর জ্বালাসনি।

মাসখানেক পর তাদের গলির মোড়ের চার নম্বরের বাড়িখানা মেরামত হচ্ছে দেখে হরি দাঁড়ালো। তাদের যারা মেরামতের কাজ করে সেই ঘানি মিঞাকে হরি বেশ জানতো। অনেকবার তার সঙ্গে কথা কয়েছে সে। এখন দেখলে সে ঘানি মিঞাও নয় বা তার তাঁবেদার মিস্ত্রীরাও নয়—মেরামতের কাজ করছে অন্য মিস্ত্রী। হরি এগিয়ে গিয়ে একজনকে জিজ্ঞাসা করলে—ঘানি মিঞা কোথায়? তাদের একজন বললে . ঘানি মিঞাকে তারা চেনে না, কে ঘানি মিঞা? হরি জিজ্ঞাসা করলে, তাহলে তোমরা কার লোক? তোমাদের লাগালে কে? যিনি বাড়ি কিনেছেন তিনিই লাগিয়েছেন। আমাদের সর্দারের নাম দলু মিস্ত্রী।

এইভাবে পাঁচ, ছয়, সাত নম্বরের বাড়ি ক'খানাই গেল, জানাজানিও সব হয়ে গেল। তারপর কয়েকদিন বাদে মোটারখানা মিস্ত্রিখানায় গেল আর এলো না। বাবুরা ট্রামে যাতায়াত আরম্ভ করলেন। ছেলেরা সব হেঁটে আর বউরা সব ভাড়াগাড়িতে যাতায়াত করতে লাগলেন। আরও এক বছর গেল, তখন দুই ভায়ে হলেন পৃথক। বড়বাবু এলেন সিতুকে নিয়ে, দশ নম্বরের বড় বাড়িখানা ছেড়ে পুরানো আদি বাড়িতে—আর ছোটবাবু গেলেন সুমুখের নূতন বাড়িতে। এই দুখানা রক্ষা পেয়েছিল মাত্র, চাকর ঝি সব ছাড়ানো হল, রইল শুধু বুড়ো ঝি আর হরি। সরকার কালীপদ এই সময় এক কাণ্ড করে বসলো। এক জায়গায় তাগাদায় গিয়ে তিনশো টাকা আদায় করে নিয়ে বেমালুম ডুব দিলে। বাবুরা নানাদিকে অনুসন্ধান ক'রে না পেয়ে শেষে তার দেশে গিয়ে ধরলেন। সে স্পষ্টই বললে, আমার দু' বছরের মাইনে বাকি জমেচে, যা নিয়েচি তার চেয়ে ঢের বেশী পাওনা। আর গোলমাল না কোরে চেপে যাওয়াই ভাল ভেবে বাবুরা চেপেই গেলেন। যাই হোক এর পর কারবারও আলাদা হয়ে গেল যদিও কারবারের দুই-ই নষ্ট হয়েছিল, সুনাম আর মূলধন!

পাঁচটি ছেলে আর ঋণের বোঝা নিয়ে পৃথক সংসারে বড়বাবু অবসন্ন হয়ে পড়লেন। কারবারটাকে কোন রকমেই আর চাগিয়ে তুলতে পারলেন না। ক্রমে অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠলো। এমনই সময় এলো—জোর তাগাদা,—মুদী গয়লা ধোপার টাকা দেওয়া হয় না, ছেলেদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হবার জো, বহুদিনের মাইনে বাকী, দেওয়া হয়নি, বই কেনা হয় না। দুর্ভাগ্য এলো সকল দিক দিয়েই, হাতে কাজ নেই পয়সাও নেই। বড়বাবু পড়লেন—অসুখে পূর্ণ ছয়টি মাস শয্যাগত। এই সময়টা বড় বৌ আর হরি এই দুজনের অপরিসীম চেষ্টায় ও যত্নে তাদের সংসারটি চলেছে আর রোগীর সেবাও হয়েছে। এতগুলি প্রাণীর আহার জোটানো বিধাতাই জানেন কেমন করে চলেছিল। ছোটবাবু

মাঝে মাঝে, কেমন আছে সব,—কেমন আছে ? বোলে তাড়াতাড়ি যেমন ঢুকতেন তেমনি তাড়াতাড়ি বাইরে থেকেই, আচ্ছা আসবো'খনই, বোলে সরে পড়তেন। ছোটবাবুরও অবস্থা তত ভাল নয় তবে তাঁর বড় একজন সহায়, তাঁর শালীপতি ভাই। দুঃস্থ আপন জনকে তিনি অনেক সাহায্য করতেন, কখনও ফেলতেন না। ছোটবাবুর দুটি ছেলের পড়াশুনা ও সংসার খরচ বাবদ তাঁর দুশত টাকা করে মাসিক ব্যবস্থা হয়েছিল। কাজেই ছোটবাবুর বিশেষ কষ্টে পড়তে হয়নি —ব্যবসা মাটি হতে। তাঁর ছেলেদের পড়া বন্ধ হয়নি।

তাঁদের ঐ ব্যবসাটা মাটি হলো কেন ? সেটা আর এক কাহিনী, তার সঙ্গে হরির জীবনের কোন সম্বন্ধ নেই, তবে হরি এ কথাটা বড়বৌয়ের মুখে শুনেছিল যে ছোটবাবুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে বড়বাবু নিজে একটা গুরুতর কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তারি মাঝে ছোটর জেদ বা নির্বুদ্ধিতায় ব্যবসার সর্বনাশ হয়ে গেল। বড়বাবু একথা আর কাকেও জানতে দেননি। কারণ তাতে, যা গেছে তা আর তো ফিরে আসবে না।

এখন সিতু বড় হয়েছে। অফিস আলাদা হওয়া থেকেই সে বাপের সঙ্গে তাঁরই কাছে কাছে থাকতো, কাজকর্ম শিখতো, আর মধ্যে মধ্যে ছোটখাটো অর্ডার পেলে তা সরবরাহ করে কিছু কিছু উপার্জন করতো। বড় কাজ সামলাবার মতো বুদ্ধি থাকলেও অর্থের অভাবে তা চালানো সম্ভব হতো না। এখন বড়বাবুর অসুখে অফিস তুলে দিতে হলো, যেটুকু কারবার ছিল তাও গেল। এখন সিতু ছোটখাট যা সামান্য পুঁজিতে হয় তাই সরবরাহ ক'রে অল্প অল্প যা পেতো কিছুটা নিজের জন্যে রেখে বাকি মায়ের হাতে দিতো। কিন্তু সে টাকা উল্লেখযোগ্য নয়। কালী শ্যামু শিবু আদিকে আর পড়ানো গেল না, কেবল শিবু ছাড়তে চাইল না কিছুতেই। সে বলে, আমি যেমন করে পারি পড়বো। আর কিছু চাই না তোমাদের কাছে, কেবল দুটি খেতে দিও দুবেলা। সে দুটো টুইসানী যোগাড় করেছিল তারই ভরসায় তার পড়াটা চলছিল।

এইভাবে হরি দেখলো যে তার এই বারো বছরের কাজের মধ্যে এতবড় একটা পরিবর্তন। যে পরিবর্তনের কথা সে ছ'মাস আগেও কল্পনা করেনি। ছোটবাবুর মেয়ের বিবাহসূত্রেই তার কাছে ধরা পড়লো। তার পর কিছুদিন বড় মায়ের সব গহনা গিয়ে রুলি সার হওয়া, এটা হরির প্রাণে বড় লাগলো। আজ শেষ দুবছর সে মাইনে বোলে কিছুই পায়নি, বা চায়ওনি। তত্ত্বতাওয়াস নিয়ে গিয়ে যা দু' পাঁচ টাকা পেয়েছে মাঝে মাঝে আদির এটা-ওটা খাবারটা-আসটায় তা চলে গেছে। মাইনে সেতো চায় না—মাইনের জন্যে সে চাকরী করতে আসেনি। আদি মানুষ হোক, বড় হোক তার ভাবনা কি ? তার একটা জীবন, স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে।

আদিকে মাঝে মাঝে বলে—হ্যাঁরে, এত কম বয়সে লেখাপড়া ত' গেল এখন একটা কিছু শেখ না কারো কাছে, পরে মাইনে হবে। আদি একটু মুখ-চোরা মানুষ, মুখ ফুটেও কিছু বলতে পারে না। তা ছাড়া ছেলেবেলাতেও তাদের ভাল অবস্থার কতকটা আভাস সে পেয়েছে। কেমন বাধো বাধো ঠেকে কাকেও কাজের কথা কিছু বলতে গেলে। আদির শরীরটা, খাওয়া-পরার কষ্ট

যখন ছিল না তখন বেশ ছিল। দীর্ঘ আড়া তার, চওড়া-চওড়া হাত প্রায় ছ ফুট লম্বা,—শক্তিমান মূর্তি, এখন রোগা হয়েছে, পুষ্টিকর খাওয়ার অভাবে।

সে ভেবে দেখলে ফটোগ্রাফি শিখলে কিছু উপার্জন হতে পারে, আর বৃত্তিটাও ভাল, বেশী লেখাপড়ার দরকার নেই। লেখাপড়া ভাল না জানলে, পাস না করলে ত ভাল কাজ পাওয়া যাবে না, এইরকমই একটা কিছু ধরতে হবে। ভেবে-চিন্তে সে এক ফটোগ্রাফারের দোকানে যাতায়াত আরম্ভ করলে।

এটা-ওটা দেখে, তাদের সঙ্গে একথা-সেকথা কইতে কইতে একদিন কোন রকমে বোলে ফেললে—আমায় ফটোগ্রাফি শেখাবেন? বাবু বললেন, প্রথমে শিখতে গেলে অনেক কেমিকেল নষ্ট হবে, তার জন্য দশ টাকা যদি আগাম আনতে পারো তাহলে তোমার শেখা হতে পারে। হরিকে গিয়ে বোলতে সে বললে মাকে কিছু বলিসনি এখন,—আমি দেখি যোগাড় করতে পারি যদি কোথাও। পরদিন দশ টাকার একখানা নোট আদির হাতে দিয়ে হরি বললে,—যা এই নিয়ে মন দিয়ে শিখে নিবি,—দেখিস হারাসনি যেন।

যে ফটোগ্রাফারের দোকানে আদি শিখতে গেল তিনি বড় ভাল লোক নন। প্রথম শেখাবার মুখেই তিনি এমন রূঢ় ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন যে আদির মনটা দমে গেল। মুখ না খিঁচিয়ে কথা বলেন না। প্রথমে তাকে যা যা জানতে হবে সে সম্বন্ধে কোন উপদেশ না দিয়েই তাকে ডার্ক রুমের কাজে দিলে ঠেলে ; সে বেচারা হাঁপিয়ে ওঠে সেখানে।

ডেভেলাপ করতে করতে কেমিকেলের গন্ধে প্রথম প্রথম গা বমি-বমি করতো। তারপর মাথা টিপটিপ করে তার একটু একটু জ্বর হতে লাগলো, শেষে আদি আবার শয্যাগত হলো। মাসখানেক ভুগে যখন সে উঠলো তখন আর তার সেই ফটোগ্রাফারের কাছে যেতে প্রবৃত্তি হলো না। হরি বললে—কাজ নাই আর ওই কাজ শিখে, বেঁচে থাকলে ভগবান কাজ মিলিয়ে দেবেন। একে খাওয়ার জোর নেই তার ওপর এইসব, আদি সেরে উঠে বল পেয়ে বাইরে আসতে অনেক দিন গেল। ইতিমধ্যে সংসারের দুর্গতি চরমে পেঁাছেছে। কাপড় নেই, পরবার জামা নেই, জুতো নেই—বড় বড় ছেলেরা বসে বসে খবরের কাগজ পড়ে আর ঘুমোয়।

হরিরও একটু কাজ বেড়েছে—সে গোপনে আর এক বাড়ি কাজ নিয়েছে, কাজটা ঠিকে ; সকালে একবার গিয়ে তাদের প্রকাণ্ড একগাদা বাসন মেজে দিয়ে আসে,—আর বিকালে তিনটার সময় কলে জল এলে একবার গিয়ে সেই অতগুলি বাসন আবার মেজে দিয়ে আসে,—মাইনে সাতটাকা আর চারখানা কাপড়। বাড়ির আর কেউ একথা জানে না, জানেন কেবল বড়মা।

পুরানো ঝি, তাকে কারো কাছে কাজের হিসাব দিতে হয় না, যখন যেখানে খুশি যায়-আসে কে খবর রাখে—এখানে দরকারের সময় ঠিক হাজির দেয়, সব কাজই করে এমন কি বাবুকে দুই এক ছিলিম তামাক পর্যন্ত দিয়ে যায়। আদির জলখাবারের—দুই চার পয়সা এদিক-ওদিক খরচ হরির তবিল থেকেই আসে, মাসকাবারে মাইনে পেলেই এক মন চাল এনে একেবারে জালাজাত করে দিলে। এমন এক একদিনও গেছে এই সংসারে কোন দিকে কিছু না পেয়ে

হরির আনা সের দুই তিন ছাতু আর গুড় দিয়েই বাচ্ছাকাচ্ছা সকলকার অশনের কাজ হয়ে গেল।

হরি দেখছে মায়ের কাপড় নেই—তবুও তার মা এমন গুছিয়ে সামলে কাপড় পরে থাকে,—লজ্জায় হরি আর চাইতে পারে না তার মুখের দিকে। ইতিমধ্যে গোপীনাথবাবুর দুই একটা ছোটখাট কাজের যোগাড় হয়েছিল, কিন্তু অদৃষ্ট যখন মন্দ হয় তখন বিপরীত দিকেই হয় গতি। হাতের কাজটা অপর একজন ঠিকাদার দুশো টাকা ঘুষ দিয়ে নিজের ভাগে করে নিলে। আর গোপীনাথের মাল গোছা-বাঁধা সাইডিং-এ পড়ে পচতে লাগলো। এরকম অবস্থায় পুরানো পাওনাদার একটা মোটা টাকার নালিশ করলে, তাকে হাতে পায়ে ধরে মেটাতেও প্রায় তিন চারশো টাকা গলে গেল। তার মধ্যে কিছু টাকা বড় বৌয়ের ভাইয়ের কাছ থেকে—তার বৌয়ের গহনা বিক্রয় করে পাওয়া গেল। বাকী টাকা—হরির একটা সাড়ে তিন ভরির হার বিক্রি করে এলো। এক সময় হরি সাধ করে একটা হার গড়িয়েছিল—পরতো না বড় একটা। বড় বড় কুটুম্ববাড়িতে তত্ত্বতাওয়াস্ নিয়ে গেলে এক একবার পরতো। শেষে রেখে দিয়েছিল—আদির বিবাহ হলে ঐটি দিয়ে তার বৌয়ের মুখ দেখবে বোলে ; কিন্তু এখন এই দুঃসময় দেখে হরি সেটা আর ধরে রাখতে পারলে না। যাই হোক কোন রকমে সে বিপদ কাটলো। এখন এই উটকো বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেলেও নিত্য নিত্য অন্নবস্ত্রের কঠিন অভাব দেখতে দেখতে হরির হাড়ে কাঁপুনি আসতো। বিশেষত বড়বৌ, তার মা যিনি ; এ দুর্গতি তাঁর চরমে পেঁছে ছিল। এ দেখা তার পক্ষে অসহ্য। রাজরাণীর আজ এই অবস্থা। হা, ভগবান!

যে বাড়িতে হরি ঠিকা কাজ করে তারা বড় লোক, হরির উপর তারা সবাই প্রসন্ন,—বিশেষতঃ বাড়ির গিন্নী যিনি। হরি তাঁকে গিয়ে ধরে বসলো, চারখানা কাপড়ের বদলে তার এক জোড়া একটু ভাল কাপড় চাই।

বললে,—বারটা ব্রতটা করি মা, কুমারী আছে,—দিওমা, একটু ভাল পাৎলা দেখে এক জোড়া। এ জন্মটা ত এই রকমেই গেল, মা—আশীর্বাদ করো, আর যেন মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাতে না হয়।

গিন্নী, হরিকে অনুকম্পার চক্ষেই দেখতেন,—তার সরল, সৎ শ্রমপটু ন্যায়নুগ স্বভাবের জন্য,—আর একটু ভয়ও বুঝি করতেন তার স্পষ্টবাদিতার জন্য। যাই হোক এখন তিনি বললেন,—কেন মা, তোর মত এমন মানুষের আবার দুঃখ কি?

কথাটা শুনেই হরি যেন চমকে উঠলো, তার আবার দুঃখ কি? গোড়া থেকে তার সকল কথা, দুঃখময় জীবনের কথা কেমন করে বলবে সে, কেমন করেই বা সুখী বাবু পরিবারদের বুঝাবে? সোজা হয়ে সে উঠে বললে,—

হাঁ মা?—স্বামীপুত্তুর নেই, বাপ, মা, আপন বলতে কেউ কোথাও নেই যার,—সারা জীবনটা এই রকম রক্ত জল করে খেটে মরা বড় সুখের জীবন গিন্নী মা? বলতে বলতে তার ভিতরের আগুন জল হয়ে চক্ষু দিয়ে ঝরঝর ঝরতে লাগলো। তাই দেখে মহা অপ্রতিভ গিন্নীমা, বললেন,—

আহা, ষাট্ ষাট্,—বাছা, আমি তা মনে করে বলিনি,—না, না, মা—তুই কিছু মনে করিসনি হরি, আমার মেয়ের মতই তুই, তোর মনে ব্যথা লাগবে জানলে আমি কখনই বলতুম না, তোর সৎ স্বভাবের কথা মনে করেই বলেছিলাম মা। একটু থেমে তখন গিন্নী তাঁর বড় মেয়েটির অকাল-বৈধব্যের কথা মনে করে আবার বললেন,—আর মা! পয়সায় কি সুখ আছে? এই ত আমার মনোরমাকে নিয়ে বুকে পাষাণ বেঁধে রয়েচি;—এখানে কেউ সুখী নয় মা,—কারো অভাব মেটে না,—আমাদের মেয়ে-জন্ম পাপের জন্ম মা—কেউ যেন আমাদের দেশে আর মেয়ে হয়ে না জন্মায়।

আবার সেই মেয়ের কথা,—সেই সাত হাত মাটি নেমে যাওয়ার কথা মনে হতেই হরির মনে হাসি এলো। যে দেশের গেরস্তের ঘরে ছেলে হলে সাত হাত মাটি ফেঁপে, উচু হয়ে ওঠে,—সে দেশের ঘরে ঘরে এই নাকারা ছেলেদের দেখে তার বুকের মধ্যে একটা আক্রোশের গুরুভার জমাট বেঁধে উঠতো। সে যদি ছেলে হতো!—আঃ বিধাতা তাকে মেয়ে গড়েছেন,—কেন? এত বড় অবিচার! পুরুষের উপর ঘৃণা তার,—দেশে থাকতেই ছোটবেলা থেকে আরম্ভ হয়েছিল;—সেখানে প্রত্যেক ঘরেই স্বার্থপর নীচমনা, পেট আর টাকা-সর্বস্ব স্থূল বুদ্ধি গাঁয়ের লোকদের দেখে। কুঁড়ের রাজা তারা এমন শ্রমবিমুখ,—ঘরে খাবার থাকলে খাটতে যাবে না, কেবল পরের বাড়ি তামুক খেয়ে বেড়াবে, কাশবে, আবার খাবে তারপর ঘরে এসে ঘুমাবে। তার মধ্যে ফুটে উঠলো সেই রাত্রের স্বামীর মুখচ্ছবি, তখন থেকেই কতকটা বিজাতীয় ঘৃণা ও বিদ্বেষ জমা হয়েছিল তার বুকে, যা হয়ত হিংসায় পর্যবসিত হতো আরও কিছু দিন থাকলে। তারপর কলকাতায় আড়তের মেজবাবুর কাণ্ড,—পর পর—তার মধ্যে পুরুষের উপর বিদ্বেষই উৎপন্ন করেছে। মহেশ পাল, তার ছেলে ভৈরবের নীচ মন, স্বার্থপর, হীনবুদ্ধি যার জন্য কার্তিক রইলো না এই জগতে। এইসব কথা অবসর কালে তার মনকে আলোড়িত করে তাকে এমনভাবে ভিতরে ভিতরে শক্ত করে তুলেছিল সারা জীবনে তার পরিবর্তন ঘটেনি।

এদিকে তার বড় বাড়ির গিন্নী প্রসন্ন হয়ে মনোমত উত্তম কাপড় একজোড়া আনিয়ে দিলেন হরিকে—উপরন্তু তার যখন যা অভাব হবে তা যেন তাঁকে জানানো হয়—তিনি তা মোচন করবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। কাপড় দেখে হরির মনটা প্রফুল্ল হয়েছিল, তার নজর ছিল উঁচু। গোপনেই কাপড় জোড়াটা বাড়িতে এনে তুলে রাখলে। তারপর সময়মত একদিন তার মাকে অর্থাৎ বড়-গিন্নিকে সে নিমন্ত্রণ করলে,—মা! কাল আমি তোমায় এয়ো করবো;—কোন আপত্তি করতে পাবে না বোলে রাখচি। কাল, এয়ো-সংক্রান্তি ব্রতের দিনই ছিল।

বড়মার একটু বিস্ময়, বিশেষ একটা কৌতূহল জেগে উঠলো মনে—বললেন,—এয়ো করবি? তা বৌমাকে কর না? বৌমা,—অর্থাৎ বড় ছেলে সিতুর বৌ। ইতিমধ্যে তার বিবাহ হয়ে গিয়েছিল। উপযুক্ত ছেলে, অবস্থাও খারাপ তাই নিঃশব্দেই কাজটা হয়ে গিয়েছিল, সে নিজের পছন্দেই বিবাহটা করেছিল।

বৌটি বেশ, একটি লক্ষ্মীশ্রী ছিল তার মধ্যে। দুঃখের সংসার, বড় ছেলের বৌ, তাকে কিছু করতে পারলেন না, এ দুঃখ তো ছিলই তাই বৌমাকে এয়ো করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু যাই হোক এখন, মায়ের এই প্রতিবাদে হরি একেবারে সপ্তমে চড়ে এমন সব কথা বললে যে বড়বৌ আর কোন আপত্তি উঠাতেই পারলেন না।

পরদিন উপবাস করে হরি গঙ্গাস্নান করে যথাসময়ে কিছু উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন এনে থালায় সুন্দর সাজিয়ে, মধ্যে আলতা-সিঁদুর দিয়ে মনের সাধে বড়মাকে উৎসর্গ করে দিলে। তারপর পরম যত্নে পা দুখানি ধুইয়ে আলতা পরিয়ে, কপালে সিন্দুর দিয়ে প্রণাম করে, কাপড় হাতে দিয়ে বললে, যাও, তুমি পরে এসো, দেখে তবে আমি জল খাবো। সেই কাপড় পরা হলে, দেখে তবে তার শান্তি।

*　　　　*　　　　*

এখন আদির কথা।

এদিকে পড়াশুনো ত বিশেষ কিছু হলো না তার, কিছু শেখাও হলো না—কি হবে তার? তার উপরের যে দুটি ভাই, তারাও ডাহা বেকার বসে বাড়িতে। এই সব নাকারা ছেলেদের দেখে হরির শরীর রী-রী করে ওঠে,—বাপ কবে কিছু করে দিতে পারবে সেই ভরসায় এই কুঁড়ের দল ঘুমিয়ে কাটাচ্ছে। এই আক্ষেপ সে অনেকের কাছেই করছে, কিছুই ফল হয়নি। কি হবে এদের, —দুর্ভাবনায় হরির রাত্রে ঘুম হয় না। মেজাজটা ইদানীং ভারি খিটখিটে হয়েছে তার। গজগজ করে;—এইসব ছেলেদের দেখলে। বুড়ো বুড়ো ছেলেরা,—ছেলের বাপ হতো বিয়ে হলে, বসে কেবল গিলতে মজবুত, বুড়ো বাপের বুকে বসে দাড়ি ওপড়াচ্চে, লজ্জা নেই। নিজেদেরও কি একটু চেষ্টা চরিত্র করতে নেই? তা নয়, তোরা কি বিধবা মেয়ে হয়েই থাকবি? এই ছেলে হ'লে সাত হাত মাটি উঁচু হয়ে ওঠে। কেন তোরা বেটাছেলে হয়েছিলি রে! এইসব কথা বড় দুটিকে শুনিয়ে বলতো; তাদের আত্মসম্মানে ঘা লাগতো, তারা জ্বলে উঠতো—তারাও হরি যে ঝি, চাকরাণী, তা শুনিয়ে হরিকে নানা কথা বলতো, —তুই চাকরাণীর মতই থাকবি, তোর দরকার কি আমাদের কথায়? খবরদার, কথা বলবি না বলে দিলুম। কিন্তু শেষ অবধি হরিকে এঁটে উঠতে পারতো না,—কারণ হরির আসল উদ্দেশ্য, ওদের ভিতরে একটা তীব্র চেষ্টার প্রবৃত্তি জাগানো তা কিন্তু ঘটতে পারতো না—কারণ সব কটাই মুখচোরা! বাড়িতে কথাবার্তায়, নিজেদের মধ্যে কোঁদল-ঝগড়ায় যতটা দড়ো, বাইরে সব ভিজে বেড়াল। ওদের ঐ কথা শুনে যখন হরি বলতো;—আহা! বাবুদের মানে ঘা লেগেছে গো? আমি খুব বলবো,—তোদের মানে কেমন ঘা লেগেছে তার পরিচয় দে দিকি! বেরো না, ঘেন্না করেই বেরো না, একটা যে কোন কাজ যোগাড় না করে ফিরবো না, এই কথা বোলে রাগ করেই বেরো না বাড়ি থেকে, তবে তো বুঝি বেটাছেলে, মরদ,—তবে বুঝবো মান আছে তোদের। ব্যস্, এরপর আর কথা চলতো না হরির সঙ্গে।

মাঝে মাঝে হরি—ঐ বড় বাড়ির গিন্নীকে ধরে বসতো আদির একটা

কাজের জন্য। দাও না মা। তোমার দয়া আছে তাই বলি ;—ছেলেটা বাড়িতে বসে বসে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অমন শরীর, অমন চেহারা, কি রোগা হয়ে গেছে মা, দেখলে তোমার কষ্ট হবে। কর্তাবাবুকে বোলে দেখ না মা, একটা যেমন-তেমন ভদ্রঘরের ছেলেতে করতে পারে এমন একটা কাজ যদি করে দেন। গিন্নীর সহানুভূতি ছিল—তিনি স্বীকার করলেন বলবেন, তারপর একদিন, কতটা পড়াশুনা করেছে জিজ্ঞাসা করলেন গিন্নী। শুনেই হরির মনটা খারাপ হয়ে গেল। হরি বেশ বুঝতো ভদ্রঘরের ছেলের এইখানেই যত মাথা হেঁট, পাসটাস না করলে পরিচয়ই নেই। এতটা দুঃখ বুঝি আর কিছুতেই ছিল না। কৈ আর পড়াশুনা হলো মা, ঐ পাঁচ কেলাস অবধি পড়া,—সে কি আর বলার মতো! হরির জীবনে এ বড় দুঃখ যে তার প্রিয় বস্তুটি পাসের পড়া পর্যন্ত পড়েনি। কাজেই বড় বাড়ির গিন্নীর কাছে সুবিধা হলো না কিছুই।

এদিকে আদিও ভিতরে ভিতরে ছটফট্ করতে থাকে, সে যে কিছুই করতে পারছে না, এখানে কোথায় কি ভাবে যে একটা ভদ্রভাবের কাজ যোগাড় হয়, কোন দিকে কোন পথই সে দেখতে পায় না। অন্তরে অন্তরে সে যেন নৈরাশ্যের চাপে অবসন্ন হয়ে পড়ছে। একটু মুখচোরা তো ছিলই ; তা ছাড়া কারো কাছে কাজ চাইতে, কিংবা নিজ পরিচয় দিতে তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসতো ;—কারণ সে যে লেখাপড়া শেখেনি এটা সে ভালই জানতো, পাছে লোকে মুখ্যু বলে তাকে ঘৃণা করে এই ভয়ে সে কারো কাছে যেতেই চাইতো না। ভেবে ভেবে সে যে যথার্থই রোগা হয়ে যাচ্ছে এ দেখে হরি তাকে কতরকমে প্রবোধ দিয়ে মনে তার আশা জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা করতো।

তোর এত ভাবনা কেন বলতো ;—তুই ছেলেমানুষ, কি করবি একজন করে না দিলে পারবি কেন ? তুই ভাবিস না—দেখিস তোর কাজ হবে, খুব শীগ্‌গির হবে। এইসব বোলে সে তাকে শান্ত করতো। এমন পুরুষোচিত সুন্দর রূপটি তার দিন দিনই ম্লান হয়েই যেতে লাগলো, এ দেখে হরি কালী-বাড়িতে গিয়ে সন্ধ্যার পর মাথা খুঁড়তো,—বাঁচাও মা ছেলেটাকে, একটা কাজে লাগিয়ে দাও মা।

এমন সময় য়ুরোপে বাঁধলো যুদ্ধ। ক্রমে ক্রমে সে যুদ্ধ ভারতের তথা কলকাতার সর্বত্রই আলোচনার বস্তু হয়েই দাঁড়ালো, সকলের মুখেই যুদ্ধের কথা। জারমানি আর জারমানি। তারপর বছরখানেক পরেই তার ধাক্কা ভারতে এসে পেঁছালো। গভর্নমেণ্ট প্রত্যেক প্রদেশের উপযুক্ত বয়সের ছেলেদের যুদ্ধের জন্য তৈরী করতে আগ্রহশীল। কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুতে আরম্ভ হয়ে গেল। আদি এই যুদ্ধের প্রত্যেক খবরটা রাখতো গোড়া থেকেই। এখন যখন বাঙলার ছেলেদের উপরও এই অনুগ্রহ, যুদ্ধশিক্ষা এবং ভারতীয় সৈন্যদলে প্রবেশ করবার অনুমতি প্রচারিত হলো সংবাদপত্র বিজ্ঞাপনে—তখন আদি যেন অকুলে কুল পেল। কাকেও কিছু না বোলে গোপনে সে যথাস্থানে একদিন উপস্থিত হয়ে যা কিছু জানবার জেনে নিয়ে বাড়িতে এলো। কেন যে হঠাৎ এমন প্রফুল্ল, এমন চঞ্চল হয়ে উঠলো কেউ বুঝতে পারলে না। এ দেখে হরিও খুসী হলো, আদিকে মনমরা দেখে তার প্রাণে সুখ ছিল না।

ময়লা কাপড়-জামাগুলিতে বেশ করে সাবান দিয়ে কেচে, রৌদ্রে শুকিয়ে তারপর তপ্ত বাটি দিয়ে জামাটা ইস্ত্রি করে নিলে সে। পরদিন সকাল সকাল বেরিয়ে গেল। সারাদিন বাদে সন্ধ্যার পর ফিরে এলো,—মুখে তার একটা দীপ্তি। মায়ের কাছে এসে সে আসল কথাটা এইবার ভাঙলো। খবরটা এই যে,—সে যুদ্ধের সেপাই দলে নাম লিখিয়েছে,—আজ তার ডাক্তারের পরীক্ষা হয়ে গেল। মা খবরটা শুনে স্তম্ভিত এবং গম্ভীর হয়ে গেলেন, একটি কথাও বললেন না।

হরি তখন বাড়ি ছিল না। ফিরে এসে শুনেই সে বলতে আরম্ভ করলে ; —না না ওসব করতে হবে না আদি,—ও কাজ ভদ্দরঘরের ছেলের নয়। লেখা-পড়ার একটা চাকরী তোর হবে, নিশ্চয়ই হবে, আমি বলছি হবে :—দেখবি দুদিন বাদে। আদি, তুই যেতে পারবি না বলে দিচ্চি। তুই নাম কাটিয়ে দিয়ে আয়। সে রাত্রে তার মুখে আর অন্ন উঠলো না, যখন সে শুনলে যে একবার লেখানো হলে শয্যাগত রোগ ভিন্ন সরকারী রিক্রুটের আসামীদের নাম কাটা যায় না। আদিই তাকে একথা জানিয়ে দিলে।

আদির মুখে এখন হাসি ফুটেছে, মুখমণ্ডলে পুরুষোচিত একটা দার্ঢ্য —একটা মত্ততা তার চক্ষে! দেখে হরি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

হরি যখনই শুনলে যে কঠিন রোগে শয্যাগত না হলে তার নাম কাটা যাবে না ; তখন থেকে সে কামনা করলে আদির জ্বর হোক, একটু বেশী জ্বর হোক। রাত্রে শুয়ে শুয়ে সারা রাত মানত করলে, হে মা কালী,—ওর জ্বর দাও মা, জ্বর হয়ে ও যেন দিনকতক বিছানায় পড়ে থাকে। হঠাৎ তার ভয় হলো, কার্তিকের মত যদি হয় শেষটা—যদি—সে আর ভাবতে পারলে না। মা,—যেন ওর যাওয়া বন্ধ হয়ে যায় এমন একটু জ্বর করে দাও,—ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়ে যেন ওর নামটা কাটানো যায়।

মা, জগদম্বা,—কিন্তু বিপরীত বুঝলেন। জ্বর হল বটে কিন্তু আদির নয়,—পরদিন প্রাতে সকলেই দেখলে হরির প্রবল জ্বর,—চক্ষু লাল,—

আদির মনটা একটু খারাপ হলো বটে—তবে, ও কিছু নয়, সেরে যাবে,— এই ভেবে সে যোগাড়ে লেগে গেল। যথাসময়ে তার যাত্রার দিন এলো—সকলের, বিশেষত নির্বাক হরির কাছে বিদায় নিয়ে ট্রেনিং-এর জন্য দেরাদুন যাত্রা করলে। যাবার সময় বলে গেল, তোমাদের কোন চিন্তা নেই, আমি মাঝে মাঝে খবর দেবো, আবার ট্রেনিং শেষ হলে আসবো। জ্বর গায়ে হরি তাকে রাস্তা পর্যন্ত এসে গাড়িতে তুলে দিয়ে ফিরে এসে বিছানা নিলে।

গোড়া থেকেই রেডিওর উপর হরির অশ্রদ্ধা,—কোথাও কেউ নেই, মানুষ দেখা যায় না, কি বকবক করে বকে—কিছুই বোঝা যায় না। পাশের বাড়িতে রেডিও। আগে বাড়িখানা ওর মনিবদেরই ছিল, হরি ঐ বাড়িতেই প্রথমে কাজে লেগেছিল—এদের সে সুখের দিন হরির ভুলবার কথা ত নয়! তাই কিছুদিন থেকে আদি যখন ঐ বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে ভাব-সাব করে,—তাদের সঙ্গে মিলে গিয়ে প্রত্যহই রেডিও শুনতে যেতো,—সরকারী সকল খবর ঐ রেডিওর ভিতর দিয়েই আসে, শুধু তাই নয় যুদ্ধের ব্যাপারে য়ুরোপ, এমেরিকা, জাপান, এমন কি সকল দেশের সকল খবরই ঐ রেডিওর মুখে পাওয়া যেতো, আদি তাই যতটা

সম্ভব সুযোগ নিতে ছাড়তো না। আসল ব্যাপার ত হরি জানতো না, আড়ালে ডেকে আদিকে তিরস্কারের সুরেই বলতো, হ্যাঁরে—ও বাড়িতে কেন যাস ওসব ছাই পাঁশ শুনতে,—তোর কি একটুও লজ্জা করে না আদি? আদি বলে, কিসের লজ্জা আর দোষ কি ওদের বাড়িতে গেলে? আমি যাবো, আমার দরকার তুই কি বুঝিস? হরি চুপটি করে আদির মুখের দিকে চেয়ে রইলো। কি আর বলবে সে!

রেডিওতে যুদ্ধের খবর বলা হয়, আর আদি সেই যুদ্ধেই গিয়েছে—একথা যখন সে জানতে পারলে তখন থেকে সে ঐ বাড়ির দরজায় সকাল বিকালে ধরনা দিতে আরম্ভ করলে। কান খাড়া করে শুনতো—কি বলে তারা ঐ যন্ত্রের ভিতর দিয়ে। বুঝতেই পারে না, মুখটি চুন করে ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে। শেষে সে তাদের বাড়ির ভিতরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলে,—হাঁ গা বাবু, আমাদের আদির কোন খবর আছে? তারা বলে, না। হরির সন্দেহ হয়, হয়ত এরা বলে না তাকে বুড়ি ঝি মনে করে। হরির বয়স এখনও পঞ্চাশ হয়নি, কিন্তু অবসাদ ও মানসিক আঘাত, নৈরাশ্য তাকে আজ বুড়ির পর্যায়ে এনে ফেলেছে।

আদির চিঠি মাঝে মাঝে আসতো। দুবার কিছু কিছু টাকাও চেয়ে পাঠিয়েছিল। লিখেছে,—সেখানে যা পাওয়া যায় তা খেতেই কুলায় না! সে ছিল একটু ভোজন-বিলাসী। তারপর সেখানে কাপড়জামা জুতা প্রভৃতির জন্য, খাওয়া-দাওয়া সব নিয়ে একটা মোটা টাকা দিতো তাকে। সেথা সব জিনিসের দাম খুব বেশী; তাই তার খাওয়ায় একটু বেশীই লাগতো।

এদিকে যখন আদির শিক্ষানবিশির কালটুকু কেটে গেল, তখন হুকুম হলো তাকে প্রথমে ফ্রণ্টিয়ারে যেতে হবে। অতি অল্প কয়েকদিনের ছুটি পেয়ে সে কলকাতায় এলো। সাধারণ সৈনিক দলে সে যায়নি—গোড়া থেকেই ওখানে আর্টিলারী বিভাগে কাজের উপর তার শ্রদ্ধা, তাই সে গোলন্দাজ বিভাগেই গিয়েছিল এবং শিক্ষা নিয়েছিল। এখন প্রথমে উপযুক্ত হয়েই সে তার শিক্ষকের সুপারিশে কাজ পেয়ে গেল সীমান্তে। নূতন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে যাচ্ছে—প্রাণে তার যুগপৎ ভয় আর আনন্দের গুরুভারে উদ্বেলিত হৃদয় নিয়ে কয়েক ঘণ্টার জন্য একবার বাড়িতে সকলের সঙ্গে দেখাশুনা করতে এলো। হরি ধড়ফড় করে বিছানা থেকে উঠে এসে দাঁড়ালো তার সুমুখে। তার ঐ বেশ,—সেপাইয়ের পোশাক দেখে বিস্ময়ে যেন অবাক হয়ে কতকক্ষণ অপলক নেত্রে চেয়ে রইলো ফ্যালফ্যাল করে আদির মুখের পানে। শেষে বললে, আদি তুই রোগা হয়ে গেছিস,—ক্যানো রে? আদি বললে, খাটা-খাটুনী খুব বেশী কিনা তাই হয়ত একটু রোগা দেখাচ্ছে,—শরীর বেশ ভালই আছে। তারপর হরির হাতখানি ধরে আদি আবার বললে,—আমার জন্যে তুই ভবিসনি,—কেমন? বল্ ভাববি না?

হরির চক্ষের জল পাছে আদি দেখতে পায় তাই সে মুখটা একটু ফিরিয়ে নিয়ে বললে,—তা কি বলা যায় রে? নিজের দুর্বলতা সে আজ পর্যন্ত কাকেও দেখায়নি। যাই হোক, হরির ইচ্ছা ছিল একবার তাকে কাছে এনে বসিয়ে; তার সব কিছু কাজকর্মের কথা, খুঁটিনাটি সব কিছু শুনবে আদির মুখ থেকে।

কিন্তু আদির সময় কম, সে বড় তাড়াতাড়ি সকলকে প্রণাম করে, ছোটদের আদর করে তাদের হাতে লজেন্স, চকলেট্ দিয়ে,—হরির গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে চলে গেল। হরিও বিছানা আশ্রয় করলে।

পরদিন তার জ্বরটা প্রবলভাবেই এলো, তারপর বিকার দেখা দিলো—সে বক্‌তে আরম্ভ করলে ;—আদি তুই এত রোগা হয়েছিস,—কেন রে? অবশ্য চিকিৎসার যথাসাধ্য চেষ্টা হয়েছিল—কিন্তু কিছুতেই আর কিছু হলো না। তৃতীয় দিন ভোরবেলা, সেই প্রবল জ্বর ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে হীমাঙ্গ হয়ে তার মহাপ্রাণ দেহত্যাগ করে বেরিয়ে গেল।

আদিকে একবার দেখবে বোলেই যেন সে এ কটা দিন বেঁচেছিল।

পঞ্চমা

বাগদী ঘরের মেয়ে পাঁচি।

সে যখন হয়েছিল তার জেঠা ঈশ্বর বাগদী নাকি ঢোল বাজিয়েছিল এই বোলে যে এমন মেয়ে বাগদী ঘরে হয়না,—তাকে যেন বাবুদের অর্থাৎ তাদের গ্রামের জমিদারবাবুদের ঘরের খুকীদের মত দেখতে। কিন্তু সে ছিল একটু হাবাগোবা গোছের। বাপ তাকে কোলে নিয়ে বেড়াতো আর তার দাদা, তার নামটা ছিল মুড়ো, কাঁদতো, তাকে কোলে নিত না বোলে। বাপ তার হারা বাগদী,—যেমন লম্বা চওড়া শরীর তেমনি ষণ্ডা, লাঠিখেলায় অদ্বিতীয় ছিল। পাঁচি যখন আড়াই বছরের, তার দাদা মুড়ো পাঁচ বছরের, তার মনে আছে বাপের কাঁধে উঠে সে প্রথমে পোলের হাট ইষ্টিশানে, সেখান থেকে রেলের গাড়িতে গোচরে, কোন কুটুমবাড়িতে নিমন্ত্রণে গিয়েছিল। তার দাদাও ছিল সঙ্গে।—পাঁচ ছয়দিন পরে ফিরে এসে সে আর তার মাকে দেখতে পায়নি। বড় হয়ে মাসীর কাছে শুনেছিল যে তার মা ওলাউঠা রোগে মারা গিয়েছিল। তার মা নাকি তৃষ্ণায়—জল, জল, করে চেঁচিয়ে ছিল, কেউ তার মুখে এক ফোঁটা জল দেয়নি। তার জেঠা বলেছিল যে মারা সে যেতোই যে কালরোগে ধরেছিল, জল দিলে হয়তো ঐ চারটি দিনও বাঁচতো না : ভাগ্যে তাকে জল দেওয়া হয়নি।

মায়ের মৃত্যু দেখেনি বটে,—কিন্তু বাপের মৃত্যু নিজের চোখেই সে দেখেছিল। বাপ তাকে এতো ভালবাসতো যে তারই মুখ চেয়ে আবার বিয়ে করেনি। তার জেঠা, তাদের সমাজের কত লোক অনুরোধ করেছিল ; বিয়ের কথায় হারা তাদের বলেছিল,—সৎ মায়ের হাতে পাঁচির দুর্গতি দেখতে পারবো না। তার মামার বাড়ি থেকে তার দিদিমা তাকে নিতে পাঠালে তার বাবা তাঁকে পাঠাতে চাইতো না, তবে পাঁচি কান্নাকাটি করলে তাকে তখন পাঠাতেই হতো, —কারণ পাঁচি তার দিদিমাকে ভালবাসতো খুব, সেটা তার বাবাও জানতো।

পাঁচ বছরের মেয়ে যখন পাঁচি সেই সময় তার একবার জ্বর হলো, সাত আট দিন প্রবল কম্প জ্বর ভোগ করেছিল, তারপর একদিন রাত্রে আপনি ঘাম

দিয়ে জ্বর ছাড়ল। তারপর তার জেঠা দু' একদিন দেখে বললে, কাল অন্ন পথ্য করবে সে। তাই হারা ভাবলে যদি কিছু জাওলা মাছ পাওয়া যায় তাহলে কাল সকালেই মাছের ঝোল দিয়ে মেয়েকে ভাত দিতে পারবে। এই ভেবে রাত্রে চুপি চুপি বাবুদের মাঠের পুকুরে গেল জাল ফেলতে। পূর্ণিমার রাত্রি, নিশুতি গ্রাম। লোকের চোখ এড়াতে আর মমতার বশেই সে এ কাজ করেছিল।

যাই হোক সে নিঃশব্দে এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে অতি সন্তর্পণে একখানা জাল ফেললে। জালটা গুটোবার সময় জলের ভিতরেই তার পায়ের গোছে কি যে কামড়ালো, সঙ্গে সঙ্গেই মাথা থেকে সর্বাঙ্গ জ্বালা শুরু হয়ে গেল। দাদা গো! বলে চিৎকার করে ছুটে চললো হারা। তার চিৎকারে ছুটে ঘর থেকে ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এসে তার দাদা ঈশ্বর, দেখলে,—সজোরে পায়ের গোছটার উপর দিয়ে জালের দড়ি কতকটা বেঁধে জালটা বুকে চেপে, দাদাগো গেলুম, গেলুম করতে করতে হারাধন দৌড়ে আসছে। আর বেশীক্ষণ দৌড়াতে হলো না, তাদের ঘরের দাওয়ার নীচেই উঠানে সে পড়েই ছটফট করতে লাগলো। উঠবার শক্তি অল্পক্ষণেই আর রইল না।

দাদাগো বাঁচাও, বাঁচাও, সব জ্বলে গেল। গেলুম, গেলুম করে, সে কাটা ছাগলের মত ছটফট করতে লাগলো। ক্রমে ছটফটানিও কমে এলো। তার দাদা ঈশ্বর গালে হাত দিয়ে খানিক বসে রইলো। সে রাত্রে পাঁচি আর তার দাদা মুড়োকে ফেলে সে রোজা ডাকতে যেতেও পারলে না, ছোট ভাই পুঁটেও গেল না,—সে বলে, একলা যেতে পারবো না এই ঘোর পূর্ণিমার রেতে। রাত পোয়ালে তখন গ্রাম থেকে সকলে এসে দেখলে নীলবর্ণ শরীর, কাঠ হয়ে রয়েছে হারাধন। পাঁচি জিজ্ঞাসা করলে, বাবার কি হলো জেঠা? ঈশ্বর বললে, কাল কেউটে কামড়েচে রে আবাগী;—তারপর বললে, মা মনসা নিয়ে গেছে।

কয়েকদিন পরে পাঁচির দিদিমা এসে তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলো। মামার বাড়িতে পাঁচি ভালই ছিল। এই পাঁচ বছরেই একবার পাঁচির বিবাহের কথা উঠল, অবশ্য তার জেঠাই তুলেছিল, কিন্তু কি জানি কি মনে করে, তার দিদিমাই বেঁকে দাঁড়ালো। কিছুতেই বাড়ির মত হোল না,—সবাই জানলো ঐ দিদিমার কঠিন প্রতিবন্ধকতায় তার বিয়েটা ঘটলো না। তার দিদিমা তারপর বিয়ের কথা আর তুলতেই দেয়নি যতদিন বাড়ি বেঁচেছিল;—বলেছিল, এখন আর ছোটবেলায় বিয়ে ভদ্রঘরেও হয় না। সুতরাং তার বেশী বয়সেই বিয়ে হবে।

তার মা মরবার সময় এক ফোঁটা জল পায়নি একথা সে শুনেছিল দিদিমার কাছে। তারপর সে আরও শুনেছিল পয়সাই সবার বড়ো, তাই কেবলই শুনতে শুনতে, ক্রমে ক্রমে তারও ঐ ধারণা প্রবল হয়ে গেল। পাঁচি বুঝেছিল যে বিয়ে-থার চেয়ে পয়সাই এ জগতে বড়ো, পয়সা না হলে কখনও কোন কাজ করা যায় না—সেই জন্যই তার পয়সার ওপর একটা ভক্তি জন্মে গিয়েছিল। কি জানি কি করে সে ঐ বয়সেই বুঝেছিল যে,—পয়সা না থাকলে জীবন বৃথা; পয়সা তার চাই-ই। ছেলেবেলা থেকে তো বাবুদের বাড়ির দুর্গাঠাকুর দেখতে গিয়ে পূজার কদিন সে দু'বেলা তার বাপ জেটার বাজনা শুনে এসেছে। এখন

বড় হয়ে বছরে একবার পূজার সময়ে সে আসতো পোলের হাটে বাপের বাড়ি। তখন থেকেই মা দুর্গার কাছে সে মনে মনে প্রার্থনা করতো, হে মা দুর্গা আমার যেন পয়সা হয়, তুমি আমায় পয়সা দিও,—আর কিছু চাই না। মা জগদম্বা তার কথা শুনবেন কিনা সে তো তা জানতো না, তবে সে, তার কথা জানিয়েই খালাস। দিদিমার কাছেই শুনেছিল যে মা দুর্গার কাছে যে যা চায় মা দুর্গা তাকে তাই-ই দেন।

তার বড় ভাইটি—বয়স এখন সাত, আট বৎসর। ছেলেটি বেঁটে আর মাথাটা একটু বেশী রকম বড় তাই শিশুকাল থেকেই তার নাম হয়েছিল মুড়ো। হাবা-গোবা ছেলেটি এতই সরল যে অনেকের কাছে বোকা বলেই পরিচিত ছিল। কিছুদিন পাঠশালায় সে গিয়েছিল, এক দেড় মাসের বেশী হবে না। গুরু-মশায়ের ব্যবহারে মুড়োর মনে এই ধারণা হয়ে গেল যে গুরুর প্রধান কাজই হলো কেবল প্রহার। বিশেষত কাওরা বাগদীর ছেলের ওপর তার প্রবল রাগ। ছোট জাতের ছেলেদের আবার লেখাপড়া শেখা কেন? তার শিক্ষা আরম্ভ হলো মার। মুড়োর স্বভাবটা ঠাণ্ডা,—মার খেয়েও সে মাস খানেকের বেশী টিকে ছিল, অবশেষে একদিন গুরু মশাইএর জন্যে তামাক নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিল বলে বেদম মার খেলে। তার পরেই সে ঠিক করলে যে আর পাঠশালায় যাবে না। ঘরে এসেই খুব জ্বরে পড়লো। আর,—সেই দিন থেকে, আর কখনও পাঠশালায় যাবে না, বলে বসল। শেষে সে তার জেঠার সঙ্গেই রইলো, তাদের দলে ঢাক-ঢোলের সঙ্গে কাঁসি বাজাতে শিখলে। তারপর ক্রমে ক্রমে মাঠের কাজও আরম্ভ করলে জেঠার সঙ্গে। আর মাঝে মাঝে হাটে যেতো কিছু কিছু সওদা নিয়ে বেচতে। শসাটা কলাটা মুলোটা, কিছু মাছ কোনদিন,—জেঠা তাকে যে দর বলে দিত সে ঠিক সেই দরেই বেচে আসতো, কখন ভুল করেনি। এই ভাবে সে বেশ কাজের মানুষ হয়ে উঠলো।

মেয়েটি কি ক্ষণে জন্মেছিল তা কেউ খোঁজ করেনি, কারণ বাগদীর ঘরে পাঁজি পুঁথি তো থাকে না আর জন্ম-পত্রিকা তৈরী করবার বালাই নেই। তবে তার জেঠা ঈশ্বর বাগদী যে বলেছিল—ঐ বাবুদের ঘরের লক্ষ্মী, ভাগ্যমানী, —খুকীর মতই হয়েছে মেয়েটি,—এটা সত্যি কথা। কিন্তু প্রথমে মা, তারপর বাপকে হারাবার পর থেকেই তার জেঠার গৌরব বোধটাও চলে গেল, এখন সে হতভাগীই হয়ে রইলো তাদের কাছে।

পাঁচ বছর বয়সেই বলেছি, বাবাকে মা মনসা কোলে নেবার পর তার দিদিমার সঙ্গেই গিয়েছিল মামার বাড়ি মানুষ হতে।

তার মামাদের গ্রামের নাম মড়াপাই লক্ষ্মীকান্ত পুর, মগরাহাটের কাছে। সে গ্রামে খৃষ্টানদের বড় প্রভাব। অনেক কাওরা বাগদীদের তাঁরা আলো দেখিয়ে তাদের নূতন বিশ্বাসের ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। রাম শ্যাম যদু প্রভৃতি তাদের আর দেশী নাম নেই, এডওয়ার্ড, জন জর্জ, যোসেফ, সেমুয়েল মাইকেল, হেনরী, আর মেয়েদের, ইভা, রোসা, এনিটা, মেরী এলিজাবেথ এই রকম খৃষ্টানী নামে ডাকা হয়। পাঁচির মামারাও হয়তো খৃষ্টান হতো, তার দিদিমার জন্যে হতে পারেনি। তার দিদিমা বলে আমাদের মা দুর্গা মা কালীর মত দেবতা

আছে? শিব, শিবের বড় আবার ঈশ্বর আছে না কি ;—খৃষ্টান হয় কেনে! হ্যাঁ লেখাপড়া করতে হবে ত বটে, না হলে ভদ্র হবে কি করে। —লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা ভালোই ছিল তাদের ঐ গ্রামের স্কুলেতে। সেইখানেই আমাদের পাঁচি ফ্রক পরে কিছুদিন, প্রায় আড়াই বছর হবে বেশ ভালোভাবেই লেখাপড়া, —যাকে বলে নিয়মিত পাঠাভ্যাস, তা সত্যই সে করেছিল আর বেশ ভাল মেয়ে বলেই দিদিমণিদের নজরেও পড়ে গিয়েছিল। দিদিমণিদের আশা হয়েছিল যে ভবিষ্যতে পাঁচিকে তারা দীক্ষিত সভ্য করে প্রচারের কাজে লাগাতে পারবে। খৃষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত না হলেও তার মামাদের ছেলে-মেয়েরাও সেই স্কুলে পড়তো বলেচি। তাদের সঙ্গে,—আড়াই বছরে সে চারখানা বাঙ্গালা বই, তার মধ্যে প্রথম শিশুশিক্ষা আর কথামালা প্রায় শেষ করেছিল। যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগও শিখেছিল ধারাপাতের, শটকে কড়াকে আর নামতা তো প্রথম বছরে হয়ে গিয়েছিল। দিদিমণির নামটি ক্যাথারাইন,—সবাই কাতু দিদিমণিই বলতো, পাঁচিকে তিনি ভাল বাসতেন। তারপর ক্রমে পাঁচি দিদিমণিদের কাছে লুক লিখিত সুসমাচার আবৃত্তি শুনে নাকি সে দিদিমণির প্রতি অনেকটাই ভক্তিমতী হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ইংরাজী ফাস্টবুক শেষ হবার আগেই তাকে মামাদের ঘর ছাড়তে হ'লো। শেষ যখন দিদিমণিরা তাকে আর কিছুতেই আটকে রাখতে পারলেন না, তখন একটা মেমপুতুল দিয়ে তাকে বিদায় দিলেন। তার মনটা সেখানে বেশ বসে গিয়েছিল,—দিদিমাও তাকে বড়ই ভালবাসতো। ঐ জেঠার উৎপাত যার জন্য পাঁচিকে আর বেশীদিন সেখানে থাকতে হলো না। পাঁচিরও জেঠার উপরে বরাবরই একটা রাগ ছিল।—হয়তো সে এবারেও আসতো না,—একমাত্র তার ভাইটির টানেই সে এলো, এক সঙ্গে দু'জনে থাকবে বলে। মুড়োর উপরে তার অসাধারণ স্নেহ ছিল।—মামার বাড়িতে তার সব সুখ, কেবল ভাইটিকে দেখতে না পাওয়াটাই ছিল তার একমাত্র দুঃখ। কিন্তু জেঠা ছিল কাজের লোক, তাতে তার জেষ্ঠত্ব ছাড়বে না—কাজেই পাঁচিকে আসতেই হলো। দিদিমার দেওয়া একখানা নীলাম্বরী আর একখানা সবুজ রংয়ের হাওয়ার শাড়ী, দুটি ফ্রক, আর ধারাপাত, ফাস্টবুক, দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা, স্লেট্, পেন্সিল সব কিছুই নিয়ে তাকে চলে আসতে হলো পোলের হাটে, তার পিত্রালয়ে—তার দাদা মুড়ো আর জেঠা-জেঠীর কাছে! কাজেই যখন সে সংসারের কাজে লাগলো তখন সে সাড়ে সাত বছরের বেশ হৃষ্টপুষ্ট স্বাস্থ্যবতী মেয়ে।

এখানে এসে বুদ্ধিমতী পাঁচি তাদের সংসারের ব্যাপার সব কিছু তার সহজ বুদ্ধিতেই এক দিনে বুঝে নিলে। পরে সেও এমন ভাবে লেগে গেল, যেন সে গোড়া থেকেই তৈরী ছিল এই অবস্থার জন্য। বাপের ভিটে, বলে তার মায়া বড় কম ছিল না। তার শিশু মনে এটা সব সময়েই জেগে থাকতো যে এখানে তার মা মরেছে, বাবা মরেছে। তার ভাইটিকে, আহা,—এরা কেউ যত্ন করে না, বোকা বোলে,—তার ভাগ্যে কেবলই খেটে মরা। সারা দিনই খেটে যাও, এই খাটুনীই যেন এখানকার আকাশ-বাতাসে নির্দয়ভাবে ভরা। সেও খাটতে শুরু করে দিল, কোমর বেঁধে, অম্লান মুখে। এ যেন আর একটা রাজ্য—এখানে এসে সে কায়মনোবাক্যে লেগে গেল—আর নিজেকে এমন চমৎকার

মানিয়ে নিলে তার মামার বাড়ির তুলনায় বিপরীত এই পরিস্থিতির মধ্যে, তার জেঠাজেঠি অবাক হয়ে গেল। জেঠীমাকে সাহায্যের কাজেই তাকে বেশী খাটতে হতো।

যখন এখানে আসেনি, তখন তার জেঠাইকে বাবুদের বাড়ির গোয়াল-কাড়া ও অন্যান্য কাজে একটা বেলাই কাটাতে হতো। তাতে তার কোলের ছেলেটার শতেক খোয়ার হতো তার উপর আবার আট মাস পোয়াতি, কাজেই পাঁচিকে নাহলে তাদের চলছিল না। পাঁচি এসেই পরদিন থেকে বাবুদের বাড়ির কাজেই লেগে গেল তার জেঠাইকে দিলে মুক্তি। তারপর এখানে তার নূতন শিক্ষা শুরু হয়ে গেল। মাছ ধরতে শেখা, লাউকুমড়া, শাকবোনা, নানা ফসলের বীজ পোঁতা, ঘর নিকানো, গোবর কুড়ানো, ঘুটে দেওয়া,—ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাবুদের বাড়িতে সবাই পাঁচিকে খুবই সুনজরে দেখেছিল, তারও কেমন একটা মমতা আকর্ষণ জন্মেছিল বাবুদের বাড়ির উপরে—বিশেষতঃ ছোটবৌটির উপর তার টানছিল বেশ। একবেলা সেও ওখানে কাটাতে লাগলো, যদিও জেঠির চেয়ে তার কাজ শীঘ্রই শেষ হয়ে যেতো। সকলের কাছেই সে কাজ চেয়ে নিতো, কিন্তু কাজ হয়ে গেলে সে কখনও এক মুহূর্ত বেশী থাকতো না তাদের সামনে। তারপর কখনও কখনও বাবুদের বাড়ির বৌ'রা তাকে খোঁজ করে,—কাছে ডাকিয়ে তার মামার বাড়ির খৃষ্টানী ইস্কুলের গল্প শুনতো।

পাঁচির কুড়িটা হাঁস হয়েছিল। প্রথমে পাঁচ ছটা হাঁস ছিল, পাঁচি নিজেও ডিম বেচে অনেকগুলো হাঁস কিনেছিল হাট থেকে। ছ'টি ছিল, তাই থেকে কুড়িটা হয়েছে বছর শেষে। সে তার মামার বাড়িতে মিশনারী খৃষ্টানদের কাছে হাঁসের ডিমের চাহিদা দেখে বুঝেছিল, ওতে বিলক্ষণ পয়সা আছে। তার উপার্জনের প্রথম ও প্রধান উপলক্ষ্য হলো, হাঁসের ডিম বিক্রি করা, আর তা আনায় পাঁচটি করে, তার বাঁধা দাম। তার পাশের লোকে আনায় ছ'টা বিক্রি করছে, তা সে করবে না। মামার বাড়িতে সে যে, ঐ দরই দেখে এসেছে! জিদের বশেই হোক, বা আর কোনও কারণেই হোক তার দর ছিল বেশী,—সে বলতো, আমার ডিম বড়, এতবড় ডিম আর কারো কাছে নেই। এটা সত্য,—তার ডিম বড়ো তা ছাড়া তার প্রধান খদ্দের হলো, বাবুরা। বাবুদের বাড়ি হপ্তায় দুদিন, সকাল বেলায় দুকুড়ি বড়ো ডিম যোগানো তার বাঁধা ছিল। আর যতক্ষণ না দামটা তার হাতে আসতো, ততক্ষণ সে বাবুদের বাড়ি থেকে নড়তো না, ঐ কাছারী বাড়ির দাওয়ায় বসে থাকতো। এক পয়সাও বাকী রাখবার উপায় ছিল না পাঁচির কাছে। নগদ দাম চুকিয়ে দেওয়া বাবুদের বাড়ির নিয়ম নয়,—কিন্তু পাঁচি বড় বাবুকে ধরে ডিমের দাম নগদ আদায়ের ব্যবস্থা পাশ করে নিয়েছিল। এইভাবে কোন সরকার মশাই কখনও তার কাছ থেকে কোন সুবিধা পাইনি। বাবুদের হুকুম থাকলেও সরকার গোমস্তাদের অনেক কারচুপি থাকে কিন্তু পাঁচির সম্পর্কে কিছু করবার যো ছিল না তাদের। একবার এক নূতন সরকার এসেছিল, সে পাঁচিকে চিনতো না। ডিমের পয়সা চাইতে গেলে পাঁচি, ছোট্ট মেয়ে দেখে সরকার মশাই বললেন,—যা, যা, এখন হবে না, কাল আসিস্, কিংবা পরশু আসিস্, আর দু'এক গণ্ডা ডিম নিয়ে আসবি, বুঝলি, আমার

জন্যে ? পাঁচি ব্যাপারটা বুঝলে, বুঝে একেবারে বড় বাবু যেখানে পুকুরঘাটে মুখ ধুচ্ছিলেন সেখানে এসে উপস্থিত হলো। সঙ্গে সঙ্গে সরকারেরও ডাক পড়ল,—তারপর যখন কাছারীতে ফিরে এলেন। তখন নূতন সরকারের মুখখানা দেখে পাঁচির ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসি দেখা দিল। তখনই পাঁচির যা প্রাপ্য তা কড়ায়-গণ্ডায় চুকিয়ে দিয়ে শেষে বললেন,—আমি তোর কাছে, সত্যি সত্যিই কি ডিম চেয়েছি ? ঠাট্টা বুঝিস না ? অতঃপর, ঠাট্টা বুঝে কাজ করবার বুদ্ধি যে পাঁচির যথেষ্টই আছে, একথা সরকারটি খুব ভালই বুঝেছিলেন।

প্রথম কয় মাসে সাড়ে সাতটি টাকা হতেই, সে মনে মনে ঠিক বিশ্বাস করে ফেললে যে, সে যথার্থই একদিন বড় কাজ করতে পারবে। অন্ততঃ পুকুর কাটাতে নিশ্চয়ই পারবে। অবশ্য প্রতি মাসেই তার সাড়ে সাত টাকা তখন হয়নি। বর্ষার দিনে মাছ পাওয়া যেত না। কারণ তখন ভাসা জলে বড় একটা ধরা পড়ত না মাছ। সেই চার মাস কাঁকড়া মাছ, মুড়ী, চিংড়া সব নিয়ে সে গড়ে ছয় টাকাও জমাতে পারেনি। আবার তেমনি শীতের দিনে কোন কোন মাসে তার পনেরো টাকাও হয়েছে। পাঁচির হাতের গুণে চালকুমড়া, লাউ, তাদের বারো মাসই হতো। কিন্তু তার গাছের শাক, ডাঁটা ছাড়া তাদের সংসারে কখনও আধ্‌খানা লাউ দিত না। জেঠাকে বলতো, কিনে নাও না ? জেঠা যদি বলতো, তোদের খাওয়াচ্ছি পরাচ্ছি, আবার পয়সা দিয়া লাউ কিনবো ? কেন তুই দিবি না ? পাঁচি বলতো, কেন ? আমরা খাট্‌ছি না ? ভাইয়ে-বুনে মিলে তোমার সংসারে গতর পাত করে খাট্‌ছি,—তাইতো দুটি খেতে দিচ্ছ।

পাঁচির মুখে কথা আটকাত না। তার মনে গোড়া থেকেই এ দুঃখ বড় লেগেছিল যে তার জেঠা নিজের সংসারের জন্যই তাকে মামার বাড়ি থেকে পড়াশুনা, অমন ইস্কুলের প্রাইজ, পুতুল ছবির বই সব থেকে বঞ্চিত করে নিয়ে এসেছে। তার পড়ায় যে বেশ মন ছিল তার প্রমাণ, সারাদিন হাড় ভাঙা খাটুনির পর যখন মুড়ো, তার দাদা, সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ত, সে কিন্তু একটা ছোট কুপি আলো নিয়ে বসে বসে তার বইগুলি নিজে নিজেই বুঝে পড়তো লিখতো। তার সঞ্চিত টাকার হিসাব রাখতো, এইসব রাত দুপুর পর্যন্ত চলতো। এই অর্থ সঞ্চয় তার এমনই গোপনে গোপনে চলছিল যে তার ঘরের কেউ কখন টের পেতো না। কখনও সে নিজের জন্য একটি পয়সাও খরচ করতো না। তবে মুড়োর কাপড় জামা জুতোয় সে মুক্ত হস্তে ব্যয় করতে প্রস্তুত ছিল—কিন্তু মুড়ো জানতো তার বোনের মন, উদ্দেশ্য—। সে যত কম খরচে কাজ হয় সেইটিই চেষ্টা করতো। কখনও এক পয়সার পান বিড়ি খায়নি সে।

পাঁচির জেঠার মনেও একটা দুঃখ ছিল। সে জানত পাঁচি বেশ মন-প্রাণ দিয়ে পয়সা জমাতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু সে বেচারা তার কাছ থেকে একটা আধলা পয়সাও কোনদিন বার করতে পারেনি। ধার-কর্জ বলে চাইলেও পেতো না। তাই তার জেঠা ঈশ্বর বাগদী পাঁচির কৃপণতা দেখে কখনও কখনও ও পাড়ার শম্ভু মুচির কাছে গিয়ে—শম্ভু ছিল তার সমবয়সী বন্ধু,—দুঃখ করতো এই বোলে,—জানিস শম্ভু ! চোদ্দ পুরুষে আমাদের ঘরে যা কেউ করেনি মেয়েটা তাই

কচ্ছে। বাব্বা, কি পয়সাই চিনেছে ওটুকু মেয়ে। সময়ে সময়ে সে মুড়োকে খোসামুদি করতো পাঁচির কাছ থেকে কিছু টাকা যোগাড় করে দেবার জন্য।

সামনে পূজো, বাবুদের বাড়িতে বাজাতে হবে ঢাক্, ঢোল্ কাড়া, এসব নূতন করে ছাওয়া চাই, পুরানো বাজাগুলো সবই ফেটে ছিঁড়ে গিয়েছে, তাই কিছু টাকা তার চাইই। অন্ততঃ সাত আট টাকার কমে হবে না। এমন কঠিন দরকারের কথা যখন ঈশ্বর পাঁচিকে বললে,—আরও বললে,—সামনে ধান কাটার সময় সব টাকাই সে শোধ করে দেবেই। পাঁচির একই ভাব, তার মুখের কথা হলো টাকা কোথায় পাবো। অনেকবার বললেও সে বলে, শম্ভুর কাছে যাও না, আমার কাছে হবে না। এতোটা মাথা ফাটিয়েও পাঁচির কাছ থেকে যখন এক পয়সাও বার করতে পারল না তখন শেষে সে শম্ভুর সঙ্গে সুদ-স্বরূপ দু'পালি ধান দেবার ব্যবস্থায় একটা রফা করে, সামনের পূজোয় ইজ্জত বাঁচায়।

তাদের বাপেরা ছিল তিনটি ভাই,—ঈশ্বর, হারাধন আর পুঁটে বাগদী। পুঁটে কারো সাতে নেই পাঁচে নেই, আপনি আনে আপনি খায়, কারো ধার ধারে না। তাদের মোট দুই বিঘা জমি। নিজেরাই চাষ করে। তাতে যা হয় খাজনা দিয়ে, সারা বছরের ভাতটা এক বেলা হয়, আর বেশী কিছু হয় না। কাজেই তার জেঠা আর ভাই মুড়ো তাদের জন-মজুরি করতে হয় আর তাতে সব মানুষের কাপড়-চোপড়ের যোগাড় করে নিতে হয়। পাঁচিও সেদিকে বড় কম সাহায্য করতো না। তার নিজের ভাতটা সে বাবুদের বাড়ি থেকেই যোগাড় করতো, কখন কখনও মুড়োর ভাতটাও যোগাড় করতো একটু উপরি কাজ করে। মেয়ে-মহলে তার প্রভাব ছিল বেশি, বৌদের আর গিন্নিকে সে খুশি রাখতো—তাদের পাঁচটা কাজ করে দিয়ে,—প্রয়োজনীয় অনেক কিছুই সংগ্রহ করেছিল সে। সুধু বাবুদের বাড়িতে নয় গ্রামের মধ্যে সকল ঘরেই তার যাতায়াত ছিল অবাধ। অনাথা, বাপমা নেই বোলে গ্রামের সবাই তাকে একটু অনুকম্পার চক্ষেই দেখতো। কেউ কেউ তাকে স্নেহও করতো। তার সহজ জ্ঞানেই সে বুঝেছিল লোকে কাজ পেলে খুশি হয়। শৈশবে বাপ মা হারিয়ে সে অসাধারণ বুদ্ধিমতী, মানুষ দেখলে এবং সামান্য ব্যবহারে চিনে নেওয়া, আর সব কাজে সাবধানী, ন্যায়-অন্যায়ের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল সে। তার উপর মেয়েটার শ্রমপটু শক্ত শরীর, সৎভাবোদীপ্ত প্রসন্নতা, একটা আত্মসম্ভ্রমের গাম্ভীর্য প্রায় সর্বদা তার মুখে দেখা যেতো। তার উপর নির্ভীক স্বভাবের জন্য সে সবাইকে আপন মতানুবর্তী করে নিতে পারতো। কম কথার মানুষ সে হয়ে উঠেছিল যথার্থই কাজের লোক। তাইতেই গ্রামের লোককে সে আপন করে নিতে পেরেছিল। তার দিদিমার কাছ থেকে এখানে এসে সে বোধ হয় প্রত্যেক দিনটিতে কিছু না কিছু শিখেছে, দেখেছে বুঝেছে একদিনও বৃথা যায়নি তার।

খুবই হিসেবী হয়ে উঠেছিল সে। প্রত্যেক দিনের কাজের পর রাত্রে শুয়ে শুয়ে সে হিসেব করতো যে কাল কাদের ঘরে কোনটা নিয়ে গেলে বিক্রি হবে। ক্রমে ক্রমে গ্রামের প্রত্যেক সংসারেই পয়সার অভাবের কথাটা সে খুব ভাল করেই বুঝে নিয়েছিল। পয়সা যে কত বড় একটা শক্তি, আর অলস

বুদ্ধিহীন অকর্মণ্য লোকেরাই এ থেকে বঞ্চিত এটা সে বোধ হয় প্রত্যেক দিনই বুঝতো মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে তার কাজ কর্মের মধ্যে।

বাবুদের হাট বড়-রাস্তার ধারে। লোক্যাল বোর্ডের রাস্তা, মাটি ফেলে প্রতি বৎসর উঁচু করা হয়,—আর সেই মাটি কাটা হয়, পাশের জমি থেকে, সুতরাং রাস্তার দু'ধারে বেশ খাল তৈরী হয়ে গিয়েছে, তাতে বর্ষার দিনে পুকুর ডোবা মাঠ ভাসলে তার মধ্যে মাছ এসে পড়ে। হাটের ধারেই পাঁচিদের ঘর। পাঁচি সেখানে চাপা জাল দিয়ে মাছ ধরে, সেই মাছ হাটে বিক্রি করে পয়সা জমায়। এখানে বাপের বাড়িতে তার লেখাপড়ার সুখ ছিল না বটে কিন্তু অন্য আর একদিকে বুদ্ধির সহায়ে সে তার অভাব পূরণ করেছিল। এইভাবে পাঁচি দু'বছর যখন কাটালে, তার পুঁজিও বেড়ে প্রায় তিনশো টাকার কাছ ঘেঁষেছিল। পরিশ্রম আর কর্মতৎপরতা তাকে মাত্র এই এগারো বছর বয়সেই বেশ কাজের মানুষ করে তুলেছে। আর সবার উপর বেড়েছে বুদ্ধিতে উদ্দীপ্ত তার সুকুমার মুখের লাবণ্য। কর্তব্যনিষ্ঠ স্বভাব তার, প্রাণে আনন্দ সব সময়ে ভরাই ছিল।

বিকালে গাব বেড়ের হাট ছিল। গাছের ছটা পেঁপে পেকেছিল তাই মুড়ির ধামার উপর কলাপাতায় বসিয়ে মুড়োকে হাটে বিক্রি করতে পাঠিয়েছিল। সন্ধ্যায় হাট থেকে মুড়ো ফিরে এসে খবর দিল, পেঁপেগুলো পাঠশালার গুরুমশাই তাকে মেরেধরে জোর করে কেড়ে নিয়ে চলে গিয়েছে, একটা পয়সাও দেয়নি।

পরদিন পাঁচি বাবুদের ছোটবৌ-এর কাছে গিয়ে সব কথা বলে নালিশ করলে। তোমাদের পাঠশালার গুরুমশাই মুড়োকে রাস্তা থেকে ডেকে তার কাছ থেকে পেঁপে কটা কেড়ে নিয়ে, মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে, কত গালাগাল দিয়েছে, বলেছে,—ফের যদি এদিকে আসবি, মুড়ির ধামা কেড়ে নিয়ে বেত মেরে তাড়িয়ে দোব, ইত্যাদি,—সে যা শুনেছিল মুড়োর কাছে, নিখুঁত বর্ণনা করলে। ছোটবৌ আশ্চর্য হয়ে বললে,—সে কিরে? সত্যি? পেঁপের দামটাও দেয়নি।

আমার ভাই বলেছিল, ওসব ভাল পেঁপে এক-একটার দাম চার পয়সা ছ'পয়সা। সেই শুনে ধমকে ব'লে যে, এসব তো বাবুদের গাছ থেকে চুরি করে এনেছিস্, এর আবার দাম কি? তোদের পুলিসে দিতে হয়। এইসব কথা বলে তাড়িয়ে দিয়েছে।

পাঁচি এভাবে নালিশ করতে অন্দরে কখনই আসতো না, বাইরে বাইরে বড়বাবুর কাছেই সহজে সব কিছুই চুকিয়ে ফেলতো, কারণ বড়বাবুর যথার্থই তার উপর স্নেহ ছিল সে তা ভালই জানতো। কিন্তু সে শুনেছিল, যে বড়বাবু আজ তিনদিন অনুপস্থিত, মোকদ্দমার কাজে ডায়মন-হারবার গিয়েছেন, ফিরতে দেরি হবে। কাজেই ছোটবৌ ছাড়া তার কথা বোঝবার দরদী বন্ধু আর কেউ ছিল না। যাই হোক এখন ছোটমাকে সব কথা বলে, সে শেষে এই কথা কটাও বললে,—আমরা ছোট জাতের লোক হয়ে জন্মেছি বোলেই কি আমাদের উপর অত্যাচার হবে, আমরা বিচার পাবো না! ছোটমা, তোমার কাছে আমার বিচার চাই।

ছোটবৌ সত্যিই দরদী, পাঁচির দুঃখ যথার্থই তাঁর মর্ম স্পর্শ করেছিল, ব্যাপারটা তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন। শেষে ছোটবৌ বললেন,—তুই যা এখন, মনে দুঃখ করিসনি, সংসারে সবারই দরকার আছে, তোকেও দরকার আছে, আমাকেও দরকার আছে ভগবানের বিচারে কারো রেহাই নেই, তোর পয়সা নিশ্চয়ই তুই পাবি।

পাঁচি চলে যাবার পর, ছোটবৌ শাশুড়ীর কাছে ভাঁড়ার ঘরে কি কাজে গিয়েছিল, দেখল সামনেই চৌকীর উপর বেশ ডাগর ডাগর চারটে পাকা পেঁপে রয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করলে, এ পেঁপে কোথা থেকে এলো, মা? শাশুড়ী পুজায় বসেছিলেন, বললেন,—কেন কাল রাত্রে গুরুমশাই এনে দিয়েছেন, তাঁর ঘরের গাছের পেঁপে।

এই কথা শুনে ছোটবৌ এবার পাঁচির কাছে যা যা শুনেছিল সব কথাই বোললে। শুনে শাশুড়ী তো পাঁচির উপরেই প্রথমে চটে গেলেন, বললেন, হারামজাদী বাগ্‌দীর মেয়ে, কেবল পয়সা আর পয়সা, বাপ মাকে খেয়ে এখন পয়সাই চিনেছেন, মুখে আগুন ইত্যাদি—গুরুমশাই না হয় নিয়েছিল ও কি বলে সে কথা আবার তোমার কাছে নালিশ করতে এলো?

ছোটবৌ সব শুনে শেষে বোললে,—কিন্তু মা, গুরুমশাই অতো বড়ো একজন প্রবীণ মানুষ হয়ে কি বোলে ছেলেমানুষের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে এলেন, এটা যে কত বড় অন্যায় কাজ হয়েছে তার বিচার তো করবেন? তাছাড়া আমার মনে হয় যে, সে ঐ পেঁপের দামটাও সরকারের কাছ থেকে নিয়েছে. আপনাকে এ খোঁজ করতেই হবে। গুরুমশাই লোকটা মুরুব্বি ধরনের ছিল বটে কিন্তু কাঁচা বুদ্ধি। সে কল্পনাও করেনি যে হাটের প্রজা বাগদীদের মুড়ো তার মারের বহর ভালই জানে সে, এ সম্পর্কে তার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে। কিন্তু মুড়োর পিছনে যে পাঁচি আছে সে এ কথাটা ভেবেই দেখেনি। কাজেই সরকারের কাছ থেকে দামটা আদায় করে নিজের জন্য রেখে বাকী দুটো ভোগের গিন্নিমায়ের কাছে নিজ গাছের পেঁপে বলে চালান দিয়ে বেশ বড় একটা অনুগ্রহ পাবার ব্যবস্থা করে নিয়ে নিশ্চিন্তই ছিল। ছোট বৌর জেদেই একজন ঝি, গিন্নির হুকুমে সরকারকে ডেকে নিয়ে এলো। সরকার বললে কালই গুরুমশাই ঐচারটে পেঁপের দাম চারআনা নিয়ে নিয়েছেন সরকারী তবিল থেকে। এই বার গিন্নি রাগ করলেন গুরুমশাইয়ের উপর। যাই হোক এই তদন্তের ফলে ছোট বৌয়ের সব কিছু ভালমতে জানা হয়ে গেল। ওখানে আর কিছু না বোলে, যখন ছোটবাবুর সঙ্গে দেখা হলো তখন আগাগোড়া সকল কথাই খুলে বললেন ও শেষে ছোট বৌ এই কথা ছোটবাবুকে বললেন,—যে,এসবের বিচার করতে হবে, আর ছ'টা পেঁপের দাম গুরুমশাইয়ের কাছ থেকে আদায় করে দিতে হবে।

ছোটবাবু তো আর বড়বাবু নয়, তিনি বিলাসী, উচ্ছৃঙ্খল, নবীন এবং চঞ্চল প্রকৃতির মানুষ. তবে স্ত্রীর কাছে কতকটা সংযত। তিনি বললেন যে, আমরা পেয়েছি চারটে পেঁপে, ছ'টার দাম দোবো কেন? ছোট বৌ তখন বললেন,—গুরুমশাই মিথ্যা কথা বলেচেন, উনি নিজে দুটো নিয়ে আর চারটে

তোমাদের বিক্রি করেছেন আর মাকে বোলেছেন গাছের পেঁপে খেতে দিয়েছি এতো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। ছোটবাবু এখন এখানে এইকথা বলে উড়িয়ে দিলেন যে, গুরুমশাইয়ের কথা মিথ্যা মনে করা নিয়ম নয়। ছোটলোক, বিশেষতঃ ছোটজাতের মেয়ের কথা মিথ্যা হতে পারে এইভাবেই এর বিচার করতে হবে। শুনে ছোট বৌ বললে, ওসব অবিচার চলবে না, ছোট জাতের মেয়ে বোলেই আরও ন্যায়বিচার করতে হবে। এটা তো জানা উচিত যে ভগবানের কাছে ন্যায়বিচার—তাঁর কাছে জাতের বিচার নেই। ছোটবাবু বিস্মিত এবং কতকটা দম্ভভরে বললেন,—ভগবানের বিচার ভগবানের কাছে হবে, আমাদের বিচার আমাদের মতেই হবে। এইকথা বলে বাইরে চলে গেলেন। পাঁচি ছোটবাবুকে উপরে যেতে দেখে আর ঘরে চলে যায়নি, সে ঐখানেই ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছিল। সে জানতো ছোটবাবু এসব শুনে নিশ্চয় বাইরে এসে এর একটা বিচার করবেন। হলোও তাই। তিনি গট গট কোরে একেবারেই কাছারীতে এসে পেঁছালেন। পাঁচিও ঠিক জায়গায় উপস্থিত, সে'তো বিধানের অপেক্ষায়ই দাঁড়িয়ে আছে। ছোটবাবু পাঁচিকে দেখতে পেলেন, তার নির্মল মুখের দিকে চেয়ে তাঁর কি মনে হলো, কে জানে,—তিনি পাঁচিকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ—

তোর কটা পেঁপে ছিলরে, পাঁচি?

পাঁচি বললে,—ছ'টা। তখন সরকারের দিকে ফিরে সরকারকে বললেন,—দেখ, ওকে ছ'টা পেঁপের দাম ছ'আনা দিয়ে দাও, আর গুরুমশাইয়ের মাইনে থেকে ছ'আনা কেটে সরকারী তবিলে জমা করে দেবে।

ব্যস, বিচার হয়ে গেল। পাঁচিও চলে গেল পয়সা নিয়ে। ছোটবাবু সেইদিকে চেয়ে রইলেন। তারপর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চলে গেলেন, আপন মনে। কি ভাবলেন কে জানে?

এই ভাবে কর্মজীবনে পাঁচির আরও তিনচার বৎসর কেটে গেল,—এখন পাঁচির বয়স চোদ্দ,—কিশোরীর পবিত্রতা তার মুখের লাবণ্য হয়েই ফুটে উঠেছিল;—তার মুখে এবং চক্ষে ছিল তীক্ষ্ন বুদ্ধির জ্যোতি। এসব তার ভাবনার বিষয় হয়েছিল। এখন থেকেই তাকে ভিতর বার সকল অবস্থায় বড়ই সামলে চলতে হত। তার সহজ বুদ্ধিই তাকে প্রেরণা দিতে আরম্ভ করলে। এ বয়সে, এমনভাবে সকল দিকে লক্ষ রেখে চলা, মোটেই সাধারণ মেয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। তার অবস্থাই তাকে এতটা সচেতন করে তুলেছিল।

* * *

মুসলমান রাজাদের সময় বাংলায় রাজ-সরকারের দপ্তরে কায়স্থরা যে কাজের জন্য বিখ্যাত হয়েছিল এবং প্রাধান্য লাভ করেছিল, ব্যবসা-ক্ষেত্রে মালামালের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে সেই আধিপত্য লাভ করেছিল কয়ালরা। তারা ধান, চাল, ভুসিমালের বাজারে প্রধান হিসেবী বলেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বাঙলার মহাজনরা শুধু সে সময় নয় বরাবরই, দেশের ব্যবসা কেন্দ্র কেন্দ্রেই বহু সহস্র টাকার ভুসি-মালের কারবার করতো। প্রত্যেক সাধারণ মহাজনের একজন দুজন করে কয়াল, বড় হলে চার পাঁচ জনও কয়াল থাকতো। তারা মালের ওজন, দরবাটা কষে মনিবের কারবার নিখুঁতভাবে চালাতো। মোটকথা তারাই ছিল মহাজনের গতি-

মর্যক্তি। হিসাবনিকাশের কাজে তাদের দক্ষতা ছিল অসাধারণ। কয়ালদের সেকালে খুব কদর ছিল। তখন থেকেই ব্যক্তি-বিশেষের গুণগত বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচয় অর্থেই কয়াল উপাধি ব্যবহার হোত, পরে উহা পদবীরূপে বংশ-পরম্পরায় থেকে গেল। এখন কয়ালের ছেলে হলেই সে কয়াল, যথার্থ কয়ালী করুক আর নাই করুক। যেমন ব্রাহ্মণ হয়েছে বংশগত উপাধি।

যাই হোক এখন এই গ্রামে ত্রৈলোক্য কয়ালের পূর্ব পুরুষ কয়ালী করে বেশ দু পয়সা করেছিল, জমি-জায়গাও তাদের কম ছিল না। কিছু বেশী রকমের সম্পত্তি না হলেও জমিদারবাবুদের নিচেই তাদের খাতির ছিল। কিন্তু ত্রৈলোক্য কয়ালের বাবা আর খুড়োতে মিলে বিবাদ-বিসম্বাদ করে, মামলা ঢুকিয়ে প্রায় সবই শেষ করে এনেছিল, আরও কিছুদিন বাঁচলে হয়তো বংশের বাতি-গুলিকে পথে দাঁড় করিয়ে রেখে যেতে হতো। বিধাতার ইচ্ছায় সাত আট দিনের আড়াআড়িতে বাপ আর খুড়ো দুজনে পরলোক যাত্রা করলেন—কেবলমাত্র পঁচিশ বিঘা জমি, একটা ভদ্রাসন, তিন বিঘার বাগান-ঘেরা বেশ বড় একটি পুকুর, এইটুকুই অবশিষ্ট রেখে।

ত্রৈলোক্য কখনও কয়ালের কাজ করেনি যেমন তার বাপ খুড়োরাও করেনি। তবে ত্রৈলোক্য কাজটা বুঝতো এবং দরকার হলে করতে পারতো কারণ সে ছিল মেধাবী ছাত্র,—আর সে ছাত্রবৃত্তি পড়েছিল। কিন্তু ঐ পঁচিশ বিঘা জমির খাজনা বাড়তে বাড়তে এই বাবুদের আমলে এত বেশী বেড়ে গেছে, যা প্রতি বৎসর ফসল ভাল না হলে, খাজনা দিয়ে ঘর-সংসার চালানো দায়, সবাই জানে। তার সংসার বেশ বড়ই ছিল—সধবা, বিধবা, পিসি-খুড়ি, ইত্যাদি নিয়ে প্রায় চোদ্দ পনেরো জন লোক। এইসব প্রাণীগুলির আহার তাকেই যোগাতে হতো, যেহেতু তার উপরই ভার দিয়েছেন ভগবান। এই ভেবেই কায়মনে সে ভগবৎ নির্দেশ পালন করতো, কখনও সে এ নির্দেশ এড়াতে চেষ্টা করেনি। কাজেই ঐ পঁচিশ বিঘা জমিতে ফসল যখন ভাল হোত না, ভগবান বাদ সাধতেন, তখন এতগুলি প্রাণীর কেমন করে অন্ন জোটানো যায় সেই চিন্তাই বড় হয়ে দাঁড়াতো। তার উপর খাজনা আছে। তখন কতক জমি বন্ধকী দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। আমাদের এই ধর্মপ্রাণ আশাবাদী অক্ষর, নিরক্ষর সকল শ্রেণীর মধ্যেই এই সংস্কারই প্রবল যে,—ঘরের লক্ষ্মীকে কখনও বিক্রয় করতে নেই, করলে ধরিত্রীর অভিশাপ,—তথা অনিবার্য ভাবেই অশান্তির জের টানতে হবেই। যদিও এর পিছনে একটা এই আশা থাকে যে পরে শোধ হবে। আশায় মরে চাষা। সেই আশাই আর তার পিছনে মরণটাই চাষার একচেটে হয়ে আছে। সেই আশায় সে বন্ধক দেয় ফলে সুদসুদ্ধ মরণকে ডেকে এনে সর্বস্ব খোয়ায়। ভগবান উপরে বসে বসে দেখেন। শেষে কর্মফল বলে আসামীর মনেতে তার মীমাংসা হয়ে যায়। অন্য প্রদেশের কথা জানি না তবে সোনার বাংলার দক্ষিণে চব্বিশ পরগনা জেলার, হাজিপুর মহকুমার অন্তর্গত গ্রামের মধ্যে এ ব্যাপার প্রত্যেক চাষার ঘরেই ঘটে থাকে। যাঁরা পল্লীগ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন তাঁরা অবশ্যই এসব ব্যাপার জানেন। আমি বাল্যকাল থেকে যৌবনের অনেকটাই পল্লীগ্রামে শুধু কাটিয়ে নয়, মানুষ হয়েই এসেছি,—কৃষক, গৃহস্থদের ভাঁড়ার

আর রান্না ঘরের মধ্যে অবাধে যাওয়া-আসা করেছি, কাজেই তাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল খুব বেশী এবং সেই কারণে এই সত্যটুকু লেখা আমার পক্ষে সহজ।

ত্রৈলোক্য বেশ একটু ধর্মভীরু লোক। বাল্যকালে পাঠশালায় পড়া-শোনায় ভালো ছিল। সে ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়েছিল কিন্তু পাস করেনি—পরীক্ষা দেয়নি। তারপর তার বিবাহ হয়ে গেল। এইখানেই হলো ঠিক ঠিক সংসার আরম্ভ। ক্রমে সন্তানাদির আগমন,—মহা ব্যস্ত হয়ে পড়লো ত্রৈলোক্যনাথ সংসার নিয়ে। এর মধ্যেই সে কাশীদাসী মহাভারতখানি চারবার এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণ দুইবার শেষ করেছে। পঞ্চমবার চলছে মহাভারত পড়া। তার ধারণা ছিল যে, মহাভারত পড়লেই যথার্থ ধর্ম লাভ হবে। সহজ বুদ্ধি ছিল তার, কখনও কাউকে সে প্রবঞ্চনা করেনি। অতিরিক্ত অর্থ লোভ ছিল না তার। তার ধারণা ছিল, মানুষের অভাবঘটিত বিপদ যখন আসে, কঠিন সময় যাকে বলে, তখন হয়ত অর্থের অভাব হয় সত্য কিন্তু ভগবানও অমনি সেটি পূরণ করে দেন। না হলে মানুষ বাঁচতে পারতো কি, না কঠিন কঠিন দুঃসময় এড়িয়ে যেতে পারত। তাই জমিদার বাবুদের নায়েব মশাই যখন জানালেন যে, আড়াই বছরের বাকি খাজনা দিতেই হবে, না হলে তিন বছর পূর্ণ হবার চার মাস আগেই নালিশ চলবে, তাই-তো সে উমেশ হালদারের কাছে টাকা হাওলাৎ আর তা না হোলে জমি বন্ধকির ব্যবস্থা নিয়ে গিয়েছিল।

ত্রৈলোক্য কয়ালের জমি উর্বরা শক্তিতে বাবুদের নীচেই। তার পঁচিশ বিঘার মধ্যে বারো বিঘা ছিল নিজ হালেই চাষ, বাকীটা ধান ভাগে দেওয়া। যে বছর পুরা ধান পাওয়া যেতো সে বছরে সেতো বড়লোক। কিন্তু উপরি উপরি তিনটি বছর পুরা ফসল তো হয়নি, তার মধ্যে গত বৎসর আবার অর্দ্ধেকও নয়, কাজেই ত্রৈলোক্যের বড়ই টানাটানি। দেনাও কিছু হয়েছিল। তবুও পরিশ্রমের অন্ত ছিল না ;—তখন প্রতি হাটে সে বিশ পঁচিশ মন চাল কিনে পরের হাটে বিক্রি কর্ত্তো, সামান্য হলেও তাতেই তার কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলতো। কিন্তু জমিদারের খাজনা বাকী, কেমন করে দেবে সেই দুর্ভাবনায় তার প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, রাত্রে তার ঘুম নেই কদিন।

বাবুদের পোলের হাট, খালের ধারে বোলে জলপথে অনেক মাল আনাগোনা করে। এ অঞ্চলে ধানচালের এতবড় কেন্দ্র আর নেই। সোম শুক্কুরের হাট, আজ হাটবারে কিছু ধার-কর্জ করবে আশায় সে বোধ হয় প্রত্যেক মহাজনের কাছে হাত পেতেছে। সবাই তাকে চেনে, মানে-গণে—ভাল লোক বোলে একটা খাতির আছে তার ;—কিন্তু টাকা ধার পাওয়া অন্য কথা। তা ছাড়া জমি বন্ধক দিয়ে ধার করা, তাতে সময়ও লাগে। আড়াই শো টাকা ধার দেবার মত গ্রামে কে বা আছে? হাটের বেলা নিরাশ হয়ে ত্রৈলোক্য পাশের গ্রাম বদ্দিপুরে গেল গোপাল মোড়লের কাছে। কিন্তু মোড়ল কর্তার নিজের হাতে কিছু নেই, তার এক আল্লাদে নাতি আছে সেই তার ওয়ারিসান ; এখন থেকেই সব কিছুই তারই খবরদারিতে চলে। নাতির মনোমত হলো না ত্রৈলোক্যের সর্ত্ত, সে বলে শুধু হাতে টাকা নিলে চোটার সুদ দিতে হয়। তার ভয়ানক টাকা বাড়াবার লোভ সেজন্য চোটার সুদ তার বড়ই লোভের জিনিস। শেষে

সব জায়গায় নিরাশ হয়ে সে বাল্যবন্ধু উমেশ হালদারের কাছে এলো ; উমেশ বলে, ভাই আর লজ্জা দিসনি আজ তেরো পালি ধান ধার করে তবে সেদ্ধ করবার ব্যবস্থা হয়েছে। অবসন্ন শরীর মন,—ত্রৈলোক্য ঘরে ফিরে স্নানাহার সেরে হুঁকোটা নিয়ে বসলো দাওয়ায়,—তামাকটা শেষ করে ভাবছিল—একটু গড়িয়ে নিয়ে বিকালের দিকে একবার হাজিপুরে যাবে কারণ এই ছিল তার সব শেষ, ভরসা নয়, আশা। এমন সময় পাঁচি এসে ঢুকলো তার অঙ্গনে,—মুখে তার যেন একটু অপ্রতিভের হাসি।

বয়স্ক লোকের মধ্যে সংসারে পাঁচির এক জেঠামশাই ছাড়া আর তো কেউ নেই কাজেই গ্রামের যত বয়স্ক লোক তারা সবাই পাঁচির জেটা, সংক্ষেপে সেটা জেটান্‌শাই। এই সম্পর্ক এবং সম্বোধনটাই সে বুঝতো ভালো। আজও এখন পাঁচি জেটান্‌শাই বোলে ঢুকলো, ত্রৈলোক্যের উঠানে।

এত বেলায় কি মনে করে, পাঁচি! এখনও ঘরে যাসনি? বাবুদের গোয়ালের কাজ সারতে দেরি হয়ে গেল বুঝি?

এবার পাঁচি সপ্রতিভ মানুষ,—সে বললে, কাজ আগেই হয়ে গিয়েছিল,—এখন এ পথে যাচ্ছিনু,—তা বলি দেখে যাই জেটান্‌শাই কি কত্তেছে,—তাই এনু।

ত্রৈলোক্য স্নেহের সুরে বললে, তা বেশ করেচিস—আয়, বোসনা ঐখানে। পাঁচি ঐখানে বসে ত গেলই কিন্তু একটিও বাজে কথা না বোলে একেবারে কাজের কথাটা পেড়ে বসলো, ত্রৈলোক্যেকে বিস্ময়ে অবাক করে দিয়ে।

হেঁ গো জেটান্‌শাই তুমি উমেশ হালদারের কাছে টাকা হাওলাৎ করতে গিছিলে ;—কেনো গো?

আশ্চর্য ত্রৈলোক্য বললে, তুই কেমন করে জানলিরে পাঁচি?—

পাঁচি সব সময়েই একেবারে সোজা রাস্তায় চলে,—এখনও সে সোজাই বললে,—

আমি যে তখন বাবুদের গোলা বাড়িতে দেলে ঘুঁটে দিচ্ছিনু, কাজ কচ্ছিনু।

উমেশ হালদারের ঘর, আঙ্গিনা বাবুদের গোয়ালের ঠিক পিছনে। মধ্যে একটা চার হাত উঁচু পাঁচিল গোলা বাড়ির শেষ প্রান্তে, তার মাঝে দু একটা ছোট ঘুলঘুলিও আছে দক্ষিণে। কাজেই আজ তাদের দুজনের কথাবার্তা ওর কানে গিয়েছে বুঝেই ত্রৈলোক্য বললে,—ওহো, তাই বল,—তারপর একটু ভেবে আবার বললে,—তা তুই কি করবি বলদিকি সে কথা শুনে?

পাঁচি জেদ ধরলে,—যেন একটু আবদারের সুরেই বললে,—বলো না জেটা, দেখি যদি কিছু পারি কত্তে!

কথাগুলো ভাল লাগলো না,—ত্রৈলোক্য মনে মনে একটু অসচ্ছন্দবোধ করলে। মেয়েটা বাচাল হয়েছে আজকাল,—বয়সের গুণ যাবে কোথা,—না হলে ওর এতটা সাহস কিসের? সে বললে, যা, যা, ছেলেমানুষী করিসনি,—ঘরে যা, আমার কাজ আছে—বোলেই হুঁকাটি রাখবার জন্য উঠবার চেষ্টা করলে।

পাঁচি হটে না, তবুও বললে,—সে হবে এখন, বলো না তুমি জেটা,—তোমার কতটা দরকার।

এবার ত্রৈলোক্য সন্দিগ্ধভাবেই স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করে বসল,—আমার সাড়ে তিন শো টাকার দরকার,—কেন, তুই দিবি নাকি? কতক পরিহাস কতক উপেক্ষাও ছিল তার কথায়।

পাঁচি বললে,—হাঁ জেটা, তা তো দিতে পারি। ত্রৈলোক্য বললে, যা যা, মস্করা করিস না, ঘরে যা; এখন একটু ঘুমবো।

জেটামশাই. তোমার সাথে মস্করা করছি আমি! এইকথা বললে তুমি?

শেষে পাঁচির চক্ষে জল দেখা দিলে। ত্রৈলোক্যর ইচ্ছা হলো পাঁচিকে একেবারে পাঁজাকোলা করে তুলে একটু আদর করে, কিন্তু বাগদীদের মেয়েকে তো ছোঁবার প্রথা নেই তাদের সমাজে—জাতে তারা কতো বড়ো। কাজেই সে পারল না। মনে মনে ভাবল একি সত্য? ও সাড়ে তিন শ' টাকা ধার দিতে পারে? ত্রৈলোক্য যথার্থই বিস্মিত হলো, বললে,—হাঁরে পাঁচি সত্যি বলছিস তুই? তুই কোথায় পাবি এত টাকা?

পাঁচি কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে, কেন আমার কি টাকা নি? আমি কি মামার বাড়িথে' এসে হাঁসের ডিম বেচিনি,—চিড়ে মুড়ি ভাজিনি? আমি কি মাছ বিক্রি করিনি? আমি কি বিলে, কাকড়া, কচ্ছপ ধরিনি, এতদিন এ সব বিক্রি করিনি.—লাউকুমড়ো এসব? কতোবার তো কিনেচ আমার থে, কেনোনি তুমি? তুমিই কি শুধু? গেরামের লোক সবাই তো কিনেচে?

ত্রৈলোক্য দেখলে, আর অবিশ্বাস করবার উপায় নেই। তখন বললে,—তুই আমায় অবাক করলি যে? তাইত পাঁচি, তোর অত টাকা আছে? আমি ভাবতেও পারিনি। আচ্ছা পাঁচি, এত অল্প বয়সে তুই কেমন করে টাকা চিনলি? এবুদ্ধি তোকে কে দিল? পাঁচি বললে,—দেবে আবার কে? আমরা গরীব, ছোট নোক, বুইতে কি পারি না যে টাকা না হলে কোন কাজই হয় না! এ বুদ্ধি আমাদের থাকতে নেই জেটা? তোমরা নেকা-পড়া শিখেছ জান আর মুখ্যু বোলে কি জানতে নি আমাদের।

যাই হোক তখন টাকাটা পাঁচি গোপনে দেবে, সহজেই স্বীকার করলে বটে, কিন্তু যে চুক্তিটা করলে সেটা বড় সহজ নয়,—আর তা শুনেই ত্রৈলোক্যের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, এত ছোট মেয়েকে এ বুদ্ধি কে দিল? সে ভাল মতেই জানতো যে, তাকে বুদ্ধি দেবার কেউ নেই। তার দাদাতো নয়ই—তার আপন খুড়োও নয় জেটাও নয়। কারণ তাদের বুদ্ধির দৌড় গ্রামের কারো জানতে বাকি নেই। মনে মনে ত্রৈলোক্য অনেকটাই ভাবলে শেষে মনে করলে,—মা জগদম্বার লীলা, সবই তো তাঁরই ইচ্ছাতে হচ্ছে। এবার বোধহয় মা বাগদীদের ঘরে এই মেয়েটির উপর প্রসন্ন হয়েছেন। হারার সুকৃতি ছিল হয়তো কিছু।

পাঁচি প্রথমে, সাড়ে তিনশো টাকার বদলে সুদ আসল করে সবটাই চাইলে চাল, পাইকারি দরে। অর্থাৎ যে দরে সে বেচে সে দরে নয়, যে দরে কেনে সেই দরে। যে কয়বার হাটে চাল দিয়ে শোধ করতে পারে, সেই কয়বারেই শোধ

দেবে—তাড়াতাড়ি নেই। এটা খুব শক্ত নয়। শক্ত যেটা সেটা পরে সে—বললে, আমায় চাল দিয়ে তারপর রেলীর বাবুদের কি সোডার বাবুদের দেবে। পোলের হাটে তখন দুই বড় মহাজন চাল কিনতো, এক রেলী আর অপরটি নূতন এসেছে সোডার স্মিথ বলে একটি জার্মান ফার্ম।

ত্রৈলোক্য অতটা তলিয়ে দেখেনি। প্রথমে চট করেই বললে, আচ্ছা। বলবার পরেই যখন পাঁচি বললে,—ঠিক ত জেঠানশাই? তখন তার চমক ভাঙলো, বললে,—পাঁচি! তুই কত চাল কিনবি? তুই কি মহাজন হবি নাকি? পাঁচি অম্লান বদনে তখন বললে, না হলে টাকা বেশী হবে কি করে জেটা?

তখন ত্রৈলোক্যের মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছে, মেয়েটা তাকে অবাক করবার জন্যেই যেন আজ তার ঘরে এসেছে।

বলিস কিরে পাঁচি? বলে বড়ই ছটফট করতে লাগলো সে। একবার সে ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো, তারপর আবার বসলো। বললে, আচ্ছা যা জিজ্ঞাসা করি ঠিক বলবি? তুই কি চাল ধরে রাখবি,—না বিক্রি করবি? পাঁচি সেই রকম আন্তরিকতার সঙ্গেই বললে,—আমরা গরীব লোক, ধরে বেশীদিন রাখতে পারব কেনো জেঠা,—অল্প পুঁজি, চট্‌পট্‌ বিক্রি না করলে চলবে কেন? একহাট, বড় জোর, দুহাট। ত্রৈলোক্য তারপরই জিজ্ঞাসা করলে, কাদের বিক্রি করবি?

কেন, রেলীদের বেচব?

এতক্ষণে সে বুঝলে, পাঁচি অল্প দিনে পুঁজিকে বাড়াবার বেশ ভাল পথ পেয়েছে। তার মত পাঁচি দু-দশ মন চাল কিনে ফড়েগিরি করতে চায় না, ভেবে তার মুখটি চুন হয়ে গেল। পাঁচি যদি মহাজনিতে নামে, আর যদি পুরো একটা হাটের চাল কিনে নেয়, আর দু'হাট ধরে রাখতে পারে তাহলে তাদের মত ফোড়েদের আর ধান চালের কারবার করে খেতে হবে না। সে যেন কাতর হয়ে পাঁচিকে বললে, পাঁচি! তোর কারবার হাটে হাটে দেখা-শুনা এসব করবে কে?

কেন জেটানশাই, তুমি রয়েচ তো? তুমিই দেখবে, আমার যা কাজকর্ম, তাই তো তোমায় ধরেচি গো। ত্রৈলোক্য যেন অকূলে কূল পেলে। তার সব ধারণা ওলটপালট হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে সে বললে,—পাঁচি! তোর কত টাকা আছে রে? আমাকে সত্যি করে বল?

আজ আর বোলব না জেঠানশাই, টাকা বড় খারাপ জিনিস। তবে তোমাকে আমি পরে সবই বলবো, এখন তোমায় ধর্মভার দিয়ে দিলুম, তুমি আমার জন্যে দু'তিন খেপ হাটে কেনা-বেচা করো,—দেখি, বুঝি, তারপর সব বলবো। একজন সহায় যে, আমার চাই, জেঠা, তাই তো তোমাকে ধরেছি। ত্রৈলোক্য বুঝিল বুদ্ধিমতী উদারহৃদয়া পাঁচি তার লোকসান হতে দিতে চায় না। অথচ নিজের প্রাধান্যও বজায় রাখবে। পাঁচি আজ ত্রৈলোক্য কয়ালের কাছে যা দাবী করলে তা ত্রৈলোক্য সারা জীবনে কখনও কাকেও দেয়নি। তার অবশিষ্ট জীবনের সুখ-শান্তি এখন ঐ মেয়েটির হাতে। যখন কাজের কথা সব শেষ হলো তখন কয়াল তাকে জিজ্ঞাসা করলে,—আচ্ছা সত্যি বল দিকি পাঁচি, তুই এই হাটে হাটে চাল কিনে একচেটে রেলীদের সঙ্গে কারবার করবি, এ মতলব তোকে কে দিলে?

পাঁচির ডাগর ডাগর চোখ দুটি যেন জ্বলে উঠলো। সে বললে,—আমায় আবার বুদ্ধি দেবে কে জেটা? ফি হাটে যেখানে তোমাদের কাঁড়ি কাঁড়ি চাল ঢেলে মাপা হয় তারপর বিক্রি হয়, আমি তো ঠিক তার কাছেই বসে মাছ বিক্রি করি, দেখোনি আমাকে?—বসে বসে আমি দেখতুম যে, ওতে কি রকম লাভ হয়। ঐসব ফড়েদের কান্নাকাটি, মহাজনদের বাক্চাতুরী, মুটেদের মারামারি, গণ্ডগোল, রেলীর বাবুদের আসা যাওয়া সব দেখিনি বছরের পর বছর? আজ ছ'সাত বছর ধরে এক নাগাড়ে রোজই তো দেখতিছি, এতদিন ধরে দেখেও আবার কারো কাছে আমায় শিখতে হবে জেঠামশাই। আমার বলে, মন পড়ে রোয়েচে হোথায়!

ত্রৈলোক্য জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় রে?

কেন? ঐ চালের আড়তে। তুমি কি মনে কর জেটা, চিরকালই আমার ঐ পচা মাছ ঘাঁটবার ইচ্ছে? বাগদীর মেয়ে বলে কি ঘেন্না-পিত্তি নেই? চিরকালটা কি ঐ করবো?

মনে মনে ধন্য ধন্য না বলে পারলে না ত্রৈলোক্য।

আমরা জানি কিন্তু পাঁচি যা বললে প্রায় সবই সত্য হলেও তারই হাত দিয়ে সব চাল রেলীকে বিক্রির বুদ্ধিটা সে বাবুদের গোয়াল বাড়িতে আজই ঐ ত্রৈলোক্যর কাছেই শুনে এসেছে সকালবেলায়। যখন সে উমেশকে সব কথাই খুলে বলছিল। অর্থাৎ ফি হাটে আগে চাল সব ফড়েদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে রেলীকে বিক্রির জন্যই তো ত্রৈলোক্যের একটা মোটা টাকার এত দরকার, না হলে শুধু খাজনার তো খুব বেশী টাকা নয়, একশো টাকার মধ্যেই। বন্ধু উমেশের কাছে ত্রৈলোক্য সব কথাই খুলে বলেছিল। কাজেই তারপর কি করতে হবে ভেবে নিতে পাঁচির একটুও দেরি হলনা। মতলবটা তার নিজের মধ্যে তৈরীই ছিল, আজ সকালে ঐ ব্যাপারে ঠিক যেন ভগবান তাকে হাতে করে সুযোগটা তুলে দিলেন। উমেশ হালদারের আঙ্গনায় টাকার সম্বন্ধে যা যা কথা হয়েছিল, এমন কি উমেশের কাছে টাকা না পেলে বাবুদের বাড়ির দারোয়ানদের কাছ থেকে চোটার সুদে ধার করবে একথাও শুনেছিল। উমেশ তাকে টাকা দিতে পারেনি কিন্তু চোটার সুদে সাড়ে তিন শো টাকা ধার নেওয়া মানে সর্বনাশ ডেকে আনা এ কথা তাকে বুঝিয়েছিল। সে ধার এ জীবনে শোধ করতে হবে না তাকে। প্রতি হাটে আসল প্রতি টাকায় দু পয়সা সুদ,—সপ্তাহে দু বার হাট, মাসে আটটা হাট,—তাহলে প্রতি টাকায় মাসে চারানা সুদ,—যখন উমেশ বললে, কত টাকা রোজগার করবে তুমি যে সাড়ে তিন শো টাকার প্রতি টাকায় মাসে চারানা সুদ দেবে? পাঁচি এসব শুনেছিল। হিসেবটা দেখেই ত্রৈলোক্য,—অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে চলে এলো উমেশের কাছ থেকে।

এখন পাঁচি পেয়ে গেল সুযোগ। আসলে ভাগ্যদেবী এখন পাঁচিকেই যেন ধান চালের কাজে টাকা খাটাবার এবং বাড়াবার সুযোগটা দিয়ে দিলেন। পাঁচির জীবনে আজ একটি বিশেষ দিন,—সেও বুঝেছিল তার টাকা বাড়াবার ব্যবস্থা হওয়ার জন্য ততটা নয়, আসলে ত্রৈলোক্যকে একমাত্র সহায় ও বন্ধুরূপে পাবার জন্য। পাঁচি জানতো ত্রৈলোক্য যথার্থই সৎ, তার সততা এ গ্রামের মধ্যে

কারো অজানা নেই সেইজন্য সেও আত্মসমর্পণ করলে। আবার আজই সকালে ঐ ত্রৈলোক্য কয়ালের মুখেই উমেশের কাছে বলতে শুনেছিল যে, নগদ টাকা হাতে যার, কারবার তার। পাঁচির বয়স এখনও পনেরো হয়নি।

এই কয় বছরে, নানা প্রকার শ্রম এবং নানা দ্রব্য উৎপন্ন এবং বিক্রি করে অত্যন্ত গোপনে তার নয় শো বাহান্ন টাকা জমেছিল। খরচও কিছু হয়েছিল তার দাদার কাপড় ইত্যাদিতে, সেও এমন বিশেষ কিছু বেশী নয়। বড় গোপনেই ছিল তার পুঁজি, জগতের দ্বিতীয় ব্যক্তির সন্ধান পাবার সম্ভাবনা ছিল না। তার ব্যবহার বা আচরণে কোথাও এমন কিছুই ছিল না যাতে কেউ ভুলেও সন্দেহ করবে যে তার হাতে কিছু অর্থ আছে। কথা তো সে খুব কমই কইতো কারো সঙ্গে, তাও বিশেষ দরকার বুঝলে তবেই। ছেলেবেলা থেকেই সে একটু হাবাগোবা গোছের ছিল তাইতেই সে লোক সমাজকে এড়িয়ে নিজ গন্তব্যে স্থির ছিল। পরিচ্ছন্নতা ছাড়া বিলাসের নাম গন্ধও তার মধ্যে ছিল না। তার সংযত প্রকৃতিই ছিল তার রক্ষা কবচ।

বালিকা পাঁচির ব্যক্তিত্বের কথা, তার বুদ্ধি ও কর্মশক্তি শুধু কয়াল ত্রৈলোক্য নয়, এখন থেকে হাটের সবারই জানবার একটা সুযোগ হলো। কারবারও আরম্ভ হলো শুক্রবারের হাট থেকে।

তখনও ঐ হাটে রেলীর অফিস খোলা হয়নি, গুদামও ছিল না,—মগরা থেকে বাবুরা ডোঙায় আসতেন, মাল কিনিতেন আর ডোঙাতেই চালান হয়ে যেতো। সেদিন রেলীর খরিদ-বিভাগের বাবু পান চিবোতে চিবোতে বাঁ হাতে কোঁচা ধরে ডান হাতে সিগারেট—ছড়িটা বগলে করে সাড়ে নটার সময় এসে শুনলেন যে হাটের যতো চাল পাঁচি নামে এক বাগদীর মেয়ে প্রথমেই আজ কিনে নিয়েছে ; আর একটি চালও নেই, এমন কি নগদ টাকা নিয়ে থোলে ছালা বেঁধে চাষীরা পর্যন্ত ঘরে চলে গিয়েছে।

কোঁচা পকেটে গুঁজতে গুঁজতে,—লাটি ঠুকে মহা তম্বি লাগালেন—ম্যানেজার বাবু ;—শেষে শুধালেন, কোথায় তার আড়ৎ, তার কে আছে এখানে ?

ত্রৈলোক্য এগিয়ে এসে নমস্কার করে বললে,—আজ্ঞে, আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

বাবু বললেন,—আসল মতলবটা কি ? ধরে রাখবে না ছাড়বে ?

মাথা চুলকে ত্রৈলোক্য বললে, আজ্ঞে দর পেলেই ছাড়তে হবে বৈকি। পাঁচির বিশেষ আদেশ ছিল দু আনা হলেই ছাড়বে। কিন্তু তুমি তার উপর কয়ালীআনা প্রতি মণে আধ আনার বেশী চাপিও না,—খবরদার। দর শুনে বাবু বুঝলেন,—মহাজন মোটেই লোভী নয়। তক্ষুনি বাবু আড়াই আনায় রফা করে মাপতে হুকুম দিলেন। বেলা দুইটার সময় পাঁচির মূলধনের উপর প্রায় ষোল টাকা আর ত্রৈলোক্যের নগদ চার সাড়ে চার টাকা ঘরে উঠলো। অবশ্য দ্বিতীয় হাটেও হলো দ্বিগুণ, ক্রমশঃ হাটে হাটে বেড়েই চললো।

এই ভাবে তিন বৎসর চললো পাঁচির চালের কারবার, কখনও রেলী কখনও বা সোডার স্মিথের সঙ্গে। একদিন চুপিচুপি নিজে হিসাবে বসলো সে। দেখা

গেল নয়শো বাহান্ন টাকার কারবার এই তিন বছরে প্রায় আট হাজার থোক মূলধন হয়েছে, আর চার হাজার টাকা আন্দাজ কারবারের ভিতরে দাদনে রয়েছে। খরচের খাতে পাঁচির, মাসে মাত্র একবার অমাবস্যায় কালীঘাটে যাওয়া, তার দাদা, জেটি ও খুড়িকে নিয়ে, তাতে তার দশ থেকে বারোটাকা খরচ হতো ; সারাদিন থেকে, সেখানে রান্নাবাড়া করে, মহাপ্রসাদ খেয়ে সবাই মিলে রাত্রে এসে ঘরে পেঁৗছে যেতো। এই বিলাস তার একমাত্র বিলাস, এ ছাড়া তার দাদার কাপড়, জামা জুতো, ছাড়া খরচের ব্যাপার আর কিছু ছিল না!

আগে থেকেই পাঁচির আরও একটি ছোট কারবার ছিল। গ্রামের কয়েক ঘর প্রজার কাছ থেকে সে দু'তিনটি নৈবাছুর যোগাড় করেছিল, আজ, প্রায় দু'টি বছর থেকে তারা দুধ দিচ্ছে, গ্রামে, হাটে, কখনও কখনও বাবুদের বাড়িতে তার বেশ চাহিদা, তা ছাড়া কয়েক ঘর ব্রাহ্মণের ঘরে তার রোজ দুধের যোগান ছিল ;—তা থেকেও বেশ অনেকগুলি টাকা সে করেছিল। তার ভাইও তাকে সাহায্য করতো,—বিচালি কেটে দিতো আবার দরকার হলে যোগান দিতেও যেতো যেদিন পাঁচি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতো। ভাই-বোন এক হয়ে কাজ করেছে। সেদিকে পাঁচি খুব সতর্ক, সে জানতো যে এই টাকা সবটাই তার একলার নয়, মুড়োরও অংশ আছে। সে কথা তাকে যখনই বলতো, তখন মুড়ো,—ধেৎ,—তুই আমায় আলাদা টাকার কথা বলিসনি পাঁচি, ও আমার ভাল লাগে না। তুই যা বুঝবি তাই করবি আর আমায় যা বলবি আমি তাই করবো, এইটাই আমি বুঝি ভাল। তার এই রকম সোজা কথা। তার ছিল স্পষ্ট কথা,—আমি মুখ্যু তা মুখ্যু থাকাই আমার পক্ষে ভালো—মুখ্যুর হাতে পয়সা ভাল নয়।

পাঁচির একখানি বেশ মোটা দুশো পাতার একসারসাইজ বই অর্থাৎ খাতা ছিল। গোড়া থেকে তার আজ কয় বছরের আয়ব্যয়ের হিসেব তার মধ্যেই ছিল। আবার চালের কাজ আরম্ভ করে অবধি খাতার বিপরীত দিকে আলাদা হিসাব চলছিল। ত্রৈলোক্যের কাছেও একটি হিসাবের খাতা ছিল। তারপর এখন থেকে মাছ বেচা উঠিয়ে দিয়েছিল—কেবল মুড়ি, চিড়ে, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি বাগানের কাজ সমান চলছিল। তারও পৃথক হিসাবই ছিল। তার সঙ্গে ব্যয়ের হিসাব, টাকার জমা ও খরচ তাও পৃথক ছিল। এইভাবে আরও দু'বছর কাটলো পাঁচির। হাতে এখন প্রায় পনেরো ষোল হাজার টাকা জমেছে।

এই টাকার সম্বন্ধে আরও একটু কথা আছে। হাজার হোক পাঁচি যে সমাজের মানুষ তাতে মনের কথা, গোপন উদ্দেশ্য কিছু পাছে প্রকাশ হয়ে যায় তার সাবধানতাও সেই ভাবের ছিল বুঝতে হবে। কথা তিনকান হলেই আর গোপন রাখা যাবে না এ সংস্কার ছিল তার বদ্ধমূল। তার টাকার কথা একমাত্র ঐ কয়ালের সঠিক পরিমাণ জানবার কিছুটা সম্ভাবনা ছিল। তবুও পাঁচির ভয় ত্রৈলোক্য পাছে কথায় কথায় কাকেও বোলে ফেলে যেহেতু মানুষটা সরল এই ভেবে তাকে মা কালীর নামে শপথ করিয়েছিল সে কখনও কারো কাছে যাতে কোন কথা প্রকাশ না করে। তখনই সরল বুদ্ধি পাঁচি ত্রৈলোক্যকে কারণটিও খুব ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছিল এই বোলে ;—দেখো জেঠা,—টাকা জিনিসটা যত লোভের জিনিস এমনটি আবার কোন জিনিসই নয় ;—তাই ও জিনিসটা যতো

ভালো করতে পারে মন্দও ততটাই করতে পারে সেই জন্যই পুঁজির কথা কখনও কাকেও বলতে নেই।

তার সবার বড়ো আপন ছিল ঐ ভাইটি,—কিন্তু মুড়োকেও কখন জানতে দেয়নি তার হাতে কত আছে। মুড়োকে তার অবিশ্বাস ছিল না, তার বেলাও ভয় ঐ সে অত্যন্ত সরল, কথায় কথায়, পাছে সে কারো কাছে প্রকাশ করে ফেলে; তার দাদার খোলা প্রাণটাই সে ভয়ের চোখে দেখতো। আসলে মুড়োর যে বিষয়ে জ্ঞান নেই—তার সম্বন্ধে কোন কৌতূহলও নেই,—কল্পনাও নেই! মুড়োর বন্ধুবান্ধব যারা প্রকারান্তরে নানা কৌশলে তাকে প্রশ্ন করেও কোনক্রমে তাদের কিছুই জানবার সুবিধা হয় নি যে, পাঁচির হাতে কত টাকা আছে—আর কোথায় আছে।

এই যে পাঁচির টাকা রাখবার জায়গা, তার কোষাগার যে কোথা, এক ভগবান ছাড়া আর কারো জানবার সম্ভাবনা ছিল না। সে নিশ্চিন্ত হয়ে যেখানে সেখানে যেতো, এমনই ভাবটা লোকে দেখতো যেন তার বিশেষ কিছু নেই,—সে নিশ্চিন্ত, তার যেন কোন বন্ধনই নেই।

তবে প্রতি মাসে ঐ অমাবস্যায় সে কালীঘাটে যেতো, কখনও মুড়ো থাকতো আর কয়াল জেঠা থাকতো, তবে এক রাত্র বাস করে পর দিনই ফিরে আসতো।

পাঁচির জীবনে দিদিমার প্রভাব ছিল অসাধারণ। পাঁচির দিদিমা কালী-ভক্ত ছিল, দিদিমার সঙ্গে সে অনেকবারই কালীঘাটে গিয়েছিল। তার সঙ্গে সঙ্গে মা কালীর উপর কেমন একটা টান জন্মেছিল। ভগবান বলতে তার মনে মা কালীর মূর্তি ফুটে উঠতো। ঐ কালী উপলক্ষ্য করেই তার প্রাণ কলকাতার পানেই টানছিল। তার পক্ষে ঐ একটা বিষয় অর্থাৎ একটা পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা ছাড়া এখানে পড়ে থাকবার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। সে বুঝেছিল এখানে কখনই স্বাধীনভাবে তার কর্ম প্রসারিত করতে পারবে না। তার নিজের জীবনের সার্থকতার সুযোগ এখানে কখনও হতে পারবে না, এখানকার বায়ুমণ্ডল কোন-রকমেই তার অনুকূল নয়। এই যে জমিদারের জমিতে বাস, কতবড় দুর্ভোগ তা সে হাড়ে হাড়ে বুঝেছিল। সে আরও বুঝেছিল যে ঐ জমিদারবাবুদেরও সংসারেও ভাঙন ধরেছে, এতদিন কখনও টিকে থাকতো না যদি বড়বাবু না থাকতেন। ঐ বড়বাবুর ধর্মবুদ্ধি আর মেজবাবুর কর্মবুদ্ধিই এদের বাঁচিয়ে রেখেছে।

এখন থেকেই যেন সে একেবারেই নিজেকে লুপ্ত করে ফেললে। তার কারবার সবই ঠিক চলতে লাগলো, কেবল পাঁচিকে বিশেষ কোন উপলক্ষ্য ব্যতীত কেউ গ্রামে দেখতে পেতো না। সে দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে নিজের কর্মটুকু শেষ করে এখান থেকে সরে পড়বার ব্যবস্থায় মন প্রাণ ঢেলে দিলে।

পাঁচির নিজের বিদ্যালাভের ঝোঁক বরাবরই অন্তরে অন্তরে চাপাই ছিল। তার সঙ্গে মুড়োকেও একটা স্বাধীন কাজে লাগানো এ ইচ্ছা তার প্রবল ছিল।

গোড়া থেকেই বুদ্ধিমতি পাঁচি বুঝেছিল যে লেখাপড়া শিখে ভদ্রলোকেরা চাকরীই করে আর মুখ্যু শ্রমজীবী যারা,—গতর খাটিয়ে খায়,—কারো দুঃখই ঘোচে না, না চাকরীতে না পরিশ্রমে। তার জেঠা, খুড়ো, মাস মাইনেতে জন মজুরি

করে কেবল ভাত আর কাপড়ের দুঃখও ঘোচাতে পারেনি। তার এখন ভাবনা তার দাদাটির কি হবে। তাকে কেমন করে মানুষ করা যায়। লেখাপড়া তো কিছুই হলো না,—তার কাজে অবশ্য সে প্রাণ দিয়ে খেটে যাচ্ছে,—কিন্তু তাতে তার নিজের কি হলো ? তাকে এখন নিজস্বভাবে একটা এমন কাজে লাগাতে হবে যাতে তার নিজের কাজ বোলে দম থাকে, আপন বুদ্ধিতে উন্নতি করতে পারে। এই বয়সে,—সে এই সংসারের অনেক কথাই ভাবতো। আমার কাজে তাকে আটকে রাখা তার নিজের উন্নতির পথ বন্ধ করা। সে বেশ করে ভেবে চিন্তে, শেষে ত্রৈলোক্য জেঠার সঙ্গে পরামর্শ করে, মুড়োকে একদিন ডেকে বলল, আচ্ছা দাদা, আমাদের এই হাট তলায় একখানা ছোট কাপড়ের দোকান করলে কেমন হয়, তোমার কি মনে হয়, চলবে ?

শুনেই মুড়ো আনন্দে লাফিয়ে উঠলো,—বললে, কাপড়ের দোকান ?—তুই কর পাঁচি খুব ভাল চলবে,— দেখিসনি এখনকার গ্রামের লোক কাপড় কিনতে সেই ঘাটেশ্বরার হাটে যায় ? তারা গলাকাটা,—ভয়ানক বেশী দাম নেয়,—এখানে হলে কত ভাল হয় আর দূরে যেতেই হয় না, সস্তাও হবে।

পাঁচি বললে, এখানে তুমি সস্তায় দেবে কি করে ?

মুড়ো বললে, কেন,—ত্রৈলোক্য জেঠা কলকাতা থেকে পাইকারী দরে আনবে আর আমরা খুব কম লাভ রাখবো,—তা হলে ওখানকার চেয়ে সস্তায় দিতে পারবো।

পাঁচি ভারি খুসী হলো মুড়োর কথা শুনে, ব্যবসাবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে গেল তার কথায়, সুতরাং তাই-ই করলে। মাসখানেকের মধ্যে মুড়োকে সে একখানা ছোট কাপড়ের দোকান করে দিলে। তাকে বুঝিয়ে দিলে যে, এই থেকে তাকে উন্নতি করতে হবে। এটা যেন সে মনে রাখে। ঐ কাপড়ের দোকানের সঙ্গে তাকে লাগিয়ে রাখলেই সে কারবারটা নিজ বুদ্ধি আর কর্ম শক্তিতে দাঁড় করাতে পারবে তার এ বিশ্বাস প্রবল ছিল। এদিকে তার একটা বেশ শান্তি হলো বটে কিন্তু তার প্রাণের সাধ যেটি তার নিজের লেখাপড়া ভাল করে শেখবার ইচ্ছা তার প্রাণের গহ্বরে পাথর চাপা দেওয়া রইলো এখন। একথাটা ভেবে তার একটা নিঃশ্বাস পড়েছিল। এখন বাকি কাজ সেরে সে কেমন করে এই শ্বাস-বন্ধকর বায়ুমণ্ডল ছেড়ে কলকাতার মুক্ত হাওয়ার মধ্যে গিয়ে সহজে নিজ সাধগুলি পূর্ণ করতে পারবে। সেইজন্য তার অন্তরে একটা ছটফটানি নিরন্তর চলতে লাগলো।

এখন আর এক উৎপাত তাকে খানিক উদ্বিগ্ন করে রাখলে। সে লক্ষ্য করছিল কিছুদিন থেকে গ্রামের কয়েকজন জোয়ান ছেলে তার পিছনে লেগেছে। তারা ভদ্রঘরের বটে কিন্তু স্বভাবে প্রকৃতিতে চাষাদেরও বেহদ্দ। পাঁচির সংযত এবং গম্ভীর স্বভাব, অত্যন্ত স্বল্পভাষী সেতো ছিলই, তার সঙ্গে এ অঞ্চলে সবার উপর একটা সৎভাবের প্রতিপত্তি থাকায় তাদের সাহসটা কিছুতেই কার্যকারী হতে পারছিল না।

ইতিমধ্যে তাকে বিবাহ করতে তাদের স্বজাতির মধ্যেই দুই একজন এগিয়ে এসেছিল। তার ভাল ধান চালের কারবার, হাতে নগদ বেশ কিছু

আছে, তার উপর সুন্দর রূপ, পরিচ্ছন্ন বেশভূষা তাদের জাতিভাইদের বিপরীত—এইসব দেখেই তারা পাঁচির জেঠা ঈশ্বরকে ধরেছিল। জেঠা বলে, ও বাবা ও কেউটে সাপ, ও কালনাগিনী মেয়ের কাছে এগুবে কে ;—তোমাদের দরকার হয় তোমরা গিয়ে বোলে দেখো না। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার কারো এ সাহসটা হলো না, তার সামনে এসে কথাটা উত্থাপন করে। ওদিকে বিয়ের কথা যাই হোক,—এখন গ্রামের ছেলেদের দিকে লক্ষ্য করে পাঁচি মনোমত বেশ মাঝারী সাইজের ইস্‌পাতের ছোরা একখানি সংগ্রহ করে যত্ন করে সব সময়েই সঙ্গে রাখতে আরম্ভ করে দিলে। বাগদীর মেয়ে সে আত্মরক্ষার সাহস তার কম ছিল না।

যাই হোক মন তার উচাটন হলেও তিনটি কাজে সে আটক পড়েছিল, প্রথমটা তার বেশ কিছু ধন সঞ্চয়, আর দ্বিতীয় আশা, গ্রামেই বেশ বড় একটি পুকুর প্রতিষ্ঠা ;—যেহেতু মা তার জলের তৃষ্ণা নিয়ে মরেচে, দিদিমার মুখে শুনেচে, তাকে এক ফোঁটা জল কেউ দেয়নি। দশ হাজার টাকার মত লাগবে। বাবুদের তো এখন পড়ন্ত দশা, পুরানো পুকুর কাটিয়ে গ্রামের জলকষ্ট দূর করতে পারে না। বড়ই জলকষ্ট তাদের, গ্রামে মোটে একটি পুকুর বাবুদের —বাবুরা সকলকে জল নিতে দেয় না। গ্রামের সব লোক মাঠের পুকুর থেকে জল খায়। আর তৃতীয় কাজটি—তার ধান চালের ব্যাপারে যে টাকা দাদন দেওয়া আছে তা উশুল করা। ত্রৈলোক্য বলেছে—এ বৎসরের শেষে ফসলের মুখেই তা অনেক উঠে আসবে।

গ্রামের জলকষ্ট সে বরাবরই দেখছে। সে মামার বাড়ি থেকে যখন আসে, তখন তাদের স্কুলে যে নিয়মে পরিষ্কৃত জল খাওয়া হতো, মামাদের ঘরেও সেই মত ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। সেটা এই যে, লম্বা তিনটি খাড়া বাঁশ, মাথায় তিন কোণা এককরে বাঁধা, মাটিতে তিনটি পা একমাপে পৃথক পৃথক পোতা,—তিন কোণ, লম্বালম্বি দাঁড় করিয়ে তাঁতে চারটি বড় কলসী পর পর রাখার ব্যবস্থা। উপর থেকে প্রথমে মাথার কলসীতে পুকুরের জল, তার নীচে কয়লা, তৃতীয়টিতে বালি, নীচের কলসে পরিষ্কৃত জল ;—তিনটি কলসীর তলায় সরু ফুটো ;—এইভাবের ব্যবস্থায় তারা জল খেতো। খ্রীস্টানদের এই নিয়ম সারা গ্রামে চলেছিল। এখানে এসে ঐ নিয়মেই তাদের নিজের ঘরে জল পরিষ্কৃত করে নেওয়া ও খাওয়া হতো। কিন্তু এ গ্রামে সে রকম ব্যবস্থা নেই। বাবুদের বাড়িতে সে যখন ছোট বৌকে সব বুঝিয়ে বলেছিল, ছোটবৌ তো কর্তা নয় সে তার শাশুড়ীকে বুঝিয়ে বললে,—শাশুড়ী সে কথা শুনে তখন রাম রাম, বলে কান গঙ্গা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলে দিলেন,—বললেন, মাগো, ছোট বৌমা তুমি বল কি? ঐ বাগদীর মেয়ে যে রকম করে জল খায়, আমরাও ঐরকম করে জল খাবো? হোক না পরিষ্কার, জল নারায়ণ, সব জলই পরিষ্কার। কাপড়ে ছেঁকে খেলেই তো হয়। শাশুড়ীকে বোলে কোন ফল হল না দেখে সে স্বামীকে বললে,—স্বামী বললেন, কাজ কি অত গোলমালে, একটু ফটকিরি দিয়ে যখন কাজ হয়, অত হাঙ্গামা করার প্রয়োজন কি?

যৌবনোদ্‌গমে পাঁচির যে একটা আকর্ষণের কথা বলেছি এটা গ্রামের মধ্যে এক শ্রেণীর আলোচনার বিষয় ছিল ; পাঁচিও এটা জানতো আর সেজন্য সে

খুব সাবধান হয়ে চলছিল। কিন্তু যারা তাকে শিশুকাল থেকে দেখছে, এমন কি তাদের রক্ষক বোলে যাদের জানতো তাদের মধ্যেও যে এমন একটা বিকৃত দৃষ্টি হতে পারে তাই দেখে শুধু আশ্চর্য নয় তার প্রাণে একটু ভয়ও যেন এসে গেল। বাবুদের ঐ ছোটবাবু, যখন পাঁচি ছয় সাত বছরের, তখন থেকে দেখেছেন, লক্ষ্যই করেননি, কিন্তু এখন,—যৌবনোদ্গমে তাকে দেখে ছোটবাবু একটা অস্বাভাবিক আকর্ষণ অনুভব করলেন। একদিন ছোট বৌয়ের ঘর থেকে আসবার পথে সিঁড়িতে এক ঘটনা ; যে ব্যাপার ঘটেছিল, তাতে কেবল সে ছোটবাবুর দিকে এমনভাবে চাইলে তাতেই তিনি সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন, বললেন, না, না, পাঁচি তুই কিছু মনে করিস নি, আমার অন্যায় হয়েছে। বুদ্ধিমতী পাঁচি সেটাকে আর বাড়তে দেয়নি, তারপর ও একথা কাকেও জানতে দেয়নি। সে আজ অনেক কিছুই বুঝলে। বাবুদের বাড়ি,—বিশেষ ছোটবাবুদের ঘরেতে যাতায়াত তখন থেকে সে খুবই কমিয়ে দিলে।

একদিন ছোটবৌ বললে,—পাঁচি আজকাল তুই আর তেমন আসিস না, কেনরে? পাঁচি বললে,—কখন আর আসি বলুন, দু'টোর আগে তো খাওয়াই চোকে না, তারপর মুড়ি ভাজতে বসি, তারপর হাট আছে। ছোটবৌ বললে, —ওসব তো আগেও ছিল, নতুন কিছু নয়, তবে হঠাৎ আসা বন্ধ করলি কেন, তোর কি বর জুটেছে নাকিরে?

আমাদের আবার বর কি, ছোট মা?

হাঁরে পাঁচি, তোর বিয়ে করতে ইচ্ছা হয় না।

পাঁচি বললে,—আগে আগে হোত এখন আর হয় না। বেটাছেলেদের স্বভাব দেখে আর ভাল লাগে না। নাই বা বিয়ে হলো, ছোট মা, আমি বেশ ভালোই তো আছি।

তোদের বরগুলো বড় মদ খায়, না?

তা ধর, সারাদিন খাটে-খোটে—একটু যদি খায় তো দোষ কি?

সেজন্যে নয়,—তবে?

তারা ঘরের বৌকে মনে করে, ছাগল, গরু, যা খুশি তাই করে, সেটা আমার ধাতে সয় না। গালাগালি করে, বিশ্রী বিশ্রী কথা বলে, ওসব ভাল লাগে না। একেবারে মুখ্যু সব।

ও তুই তাহলে পণ্ডিত বর চাস।

পণ্ডিত নাই হলো, একটু লেখাপড়া কি জানতে নেই। মামার বাড়িতে তো আমাদের জন্যে কেমন ইস্কুল করে দিয়েছে। মেয়েদের আলাদা, ছেলেদের আলাদা। কেন ছোট মা, বাবুরা কি এখানে মেয়েদের জন্যে ইস্কুল করে দিতে পারে না?

তবেই হয়েছে,—বাবুরা নাকি তোদের জন্যে পাঠশালা করে দেবে? নিজেদের ছেলেরা পড়ে একটা পাঠশালে—ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পাঠশালা, আর একজন আছে বাড়িতে ছেলেদের পড়ায়, তার জন্যে সে মাইনে পায় না সব মাসে।

পাঁচি বললে,—বাবুদের তো পয়সা আছে ছোট মা। তাঁরা কেন একটা

বাঁধা ইস্কুল করে দেয় না, যেখানে গ্রামের সব ঘরেরই ছেলেরা লেখাপড়া শিখতে পারবে। বছর বছর বেশ সরস্বতী পূজা হবে। কি সুন্দর যে হয় তা হলে, না ছোট মা?

তা তো হয় পাঁচি, কিন্তু কে দেবে, কেউ দেবে না। বাবুরা সব কলকাতায় যাতায়াত করে—মকদ্দমা, তিন নম্বর চার নম্বর ডিক্রী জারি করতে করতেই জীবন কাটিয়ে দিলে, তাদের দ্বারা কোনো ভরসাই নেই রে। এখন যদি তুই পারিস ঐ রকম একটা ইস্কুল করতে, চেষ্টা কর। যদি হয়, তোর দ্বারাই হবে।

পাঁচি ব'লে,—ছোট মা! আমরা গরীব, ছোট জাত, মুখ্যু বলে ঠাট্টা কোরচ বুঝি? বলতে বলতে পাঁচির চক্ষু দুটি ছলছল করে উঠল। তা দেখে ছোট মা বললে,—হাঁরে পাঁচি আমার কথাটা কি ঠাট্টার মত শোনালো;—এই কথায় তোর মনে কষ্ট হলো; এতে দুঃখ পাবার কি আছে বল? এখন কিছু ভাল কাজ ছোট জাতের যারা তারাই তো করচে, তুই কি খবর রাখিস না? সখিমণির অমন পুকুরটা কে কাটিয়েছিল? বদ্দিপুরের হাইস্কুল, কোন বড় জাতের বামন ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিয়েছিল? এইসব ভেবেই না বলেছি,—যদি হয়তো তোর মত একজন মানুষের দ্বারাই হবে। আমার মনে যা বিশ্বাস তাই তো বললুম।

পাঁচি এ রকম একটা কিছু করবার কথা ঠিক না ভাবলেও তাদের মত গরীবের ছেলেদের লেখাপড়া শেখার বাধার কথা ভুলতে পারেনি, সত্য। মনে মনে জগদম্বার কাছে এই প্রার্থনা এখন করলে যে, হে মা জগদম্বা, তুমি আমায় এমন পয়সা দাও যাতে আমি একটা ইস্কুল করতে পারি। সেখানে গ্রামের সব ছেলে পড়তে পারবে। ইতর আর ভদ্র বোলে কিছু থাকবে না, সবাই হবে ভদ্র। যার যতদিন ইচ্ছা পড়তে পারবে। কিন্তু তার মনের ভিতর তখন—প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পুকুর কাটিয়ে জলকষ্ট দূর করা।

ভদ্রলোকের গ্রামের দিকে লক্ষ্য নেই; ছোটবেলা থেকেই সে দেখে আসছে গ্রামের এই জলকষ্ট, কিন্তু বাবুদের মন পড়ে আছে কলকাতায়। জলকষ্ট যদি দূর করতে হয় ভদ্রলোকের সাহায্য কতকটা পাওয়া যাবে এই উদ্দেশ্যে সে গোপনেই এগিয়ে খোঁজখবর করেছিল, ফলে ক্রমে ক্রমে গ্রামের ভদ্র নামে যারা চক্ষু-কর্ণহীন তাদের উপরে তার একটা বিতৃষ্ণা এলো। এ পর্যন্ত পাঁচি ঘুণাক্ষরে তার উদ্দেশ্যের কথা কাকেও জানতে দেয়নি। এর ফলেই কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে তার কলকাতায় কালী দর্শনে যাওয়াটা বেড়ে গেল। ত্রৈলোক্য একটা বিষয়ে কিছুতে মনস্থির করতে পরছিল না; এই মেয়েটি,—এতটা নগদ টাকার ভার, কেমন করে সহ্য করছিল। কোন কাজে বেচাল নেই, মুখে একটা দম্ভ অহঙ্কারের কথা নেই, বিলাসব্যসন নেই সকাল সন্ধ্যা একইভাবে নির্ধারিত কাজগুলিতে সময় কাটে তার। তার মনের গুমট সহ্য করতে না পেরে একদিন ত্রৈলোক্য তাকে স্পষ্টই বোলে ফেললে; দেখ পাঁচি, তুই যা করচিস, যেমন করে নিজেকে ঢেকে রেখেচিস আমি হ'লে পাগল হয়ে যেতাম। তোর মধ্যে টাকার গরম লাগে না, এতবড় আশ্চর্য আমি আর দেখিনি।

পাঁচি বললে, জেঠা, আমার দাদাকে দেখেছ? আমি তারই বোন জেনো। দু'জনেই মুখ্যু তাই আমাদের গরম নেই।

অবশেষে সে সকল ব্যাপার নিজের কানে শুনে একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলবে এইভেবেই একদিন মুড়ো ও ত্রৈলোক্যকে সঙ্গে করে বাবুদের পুরোহিত অম্বিকা ভট্‌চাজের বাড়ি হাজির হলো। পুরোহিত পাঁচিকে দেখেই প্রথমে বোসতে বললেন উঠানে। উঠানটা অপরিষ্কার,—দেখেই তো মুড়োর অসহ্য হলো, তার দিদি কি একটা ফেলনা মানুষ? মুড়ো বললে—এখানে কি বসা যায়, মানুষ কখনও এখানে বসতে পারে?

পুরোহিত বললে,—তোর যে বড় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা দেখতে পাই, বামনের বাড়িতে কোথায় বসবি শুনি? একসঙ্গে এই দাওয়ায় বসবি নাকি? পাঁচি মধ্যস্থ হয়ে বললে,—ওর কথা শোনেন কেন ঠাকুরমশাই? ওকি জানে,—যা তুই, ওখানে বসতে পারিস তো বোস, না হলে চলে যা। আমরা যে বাগদী, আমরা কি দাওয়ায় বসতে পারি?

পাঁচির কথাটা শুনে ঠাকুর মহাশয়ের বোধহয় মনুষ্যত্বের মর্মে আঘাত লাগল,—তিনি কি বললেন মৃদুস্বরে তা বোঝা গেল না। পাঁচি ত্রৈলোক্যকে বললে,—কথাটা বলো না জেঠান'শাই, আমাদের সেই কথাটা।

মর্মাহত হয়ে, একটু এগিয়ে প্রণাম করে ত্রৈলোক্য সংক্ষেপেই বললে,—পাঁচি একটা পুকুর প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাই কিরকম খরচ জানতে এসেছে।

বহুদিন পর একটা শিকার পাওয়া গিয়েছে, আনন্দে ঠাকুর মশাইয়ের প্রাণটা নেচে উঠল। তৎক্ষণাৎ বললেন,—ও, এইজন্যে, তা বোস না পাঁচি, না হয় দাওয়ায় উঠেই বোস না? তাতে কি হয়েছে বোস্ বোস্ উঠে বোস্। তোর দাদাকেও বসতে বল না।

পাঁচি বললে,—না ঠাকুরমশাই, আপনি বলুন, আমরা এখান থেকে শুনতে পাব। তিনি ধীরে ধীরে বলতে আরম্ভ করলেন,—জমি কিনে পুকুর কাটাতে যে খরচ তা তো আছেই,—তারপর সেই পুকুর প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি হোম, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, দান দক্ষিণাদি করে কমপক্ষে দু'হাজার টাকা আন্দাজ, কিছু বেশীও হতে পারে। এই কথা বলে, ঐ টাকার কথায় তার প্রতিক্রিয়াটা দেখবার জন্যই পাঁচির মুখের দিকে চাইলেন। শেষে বললেন,—তারপর আরো একটা ব্যাপার আছে, পুকুর কাটিয়ে প্রতিষ্ঠা করবার পর একজন ব্রাহ্মণকে দান করতে হবে, তবে সে পুকুর সবাই ব্যবহার করতে পারবে। পাঁচি বললে,—জমি কিনে পুকুর কাটিয়ে প্রতিষ্ঠা করবার পরও আবার ব্রাহ্মণকে দান করতে হবে কেন?

বিরক্ত হয়ে পুরুৎমশাই বললেন,—তোরা একে মেয়েমানুষ, এসব বুঝতে হলে মগজের দরকার বুঝলি? সহজ নয় এ ব্যাপারটা, গুরুতর ব্যাপার বুঝলি? বাগদীদের পুকুরে কে নামবে বল? ভাল জাত যারা তারা ও জল ছোঁবেই না, সেইজন্য একজন ব্রাহ্মণকে দান করা, তখন ওটা হবে বামুনের পুকুর। এবার বুঝতে পারলি আমার কথা? মহা গম্ভীর পাঁচি বললে,—হ্যাঁ।

এখন বাগদীর ঐ পুকুর নেবে কে? মাথা নাড়তে নাড়তে ব্রাহ্মণ বললেন,—বামুন হয়ে বাগদীর দান নেওয়া এটাও একটা কথা বটে। তবে কিছু বেশী

করে দিয়ে-থুয়ে যদি কোন সৎ ব্রাহ্মণকে রাজী করাতে পারিস্ বুঝলি কি না?
পাঁচি কি একটা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ মুড়ো বলে বসলো,—একজন ব্রাহ্মণকে দান করলে, জলটা কি মিষ্টি হয়ে যাবে নাকি?
ঠাকুরমশাই অগ্নিশর্মা হয়ে মুড়োকে,—পাজী, নচ্ছার, মুখ্যু, ছোটলোক বলে শেষে বললেন, ছোটলোকের পয়সা হলে লঘু গুরু জ্ঞান থাকে না,—বলতে বলতে হাঁপাতে লাগলেন।
পাঁচি বললে,—ঠাকুরমশাই, ঐ বোকাটার কথায় রাগ করবেন না। যখন সব শুনলাম তখন শেষটুকুও শুনে যাই বলুন কে ব্রাহ্মণ বাগদীর দান নেবে এবং কত টাকা দিলে রাজী হবে—সেটা আলাদা খরচ তো?
ঠাকুরমশাই বড় গম্ভীর হয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করবার পর বললেন,—একজন ভাল যজন-যাজনশীল অধ্যাপক ব্রাহ্মণ, তাকে বোধহয় দেড় হাজার দু'হাজার দিলে রাজী হতে পারে, তাঁর আবার সন্তুষ্ট মনে নেওয়া চাই। তাঁরই নামে সংকল্প হবে কি না, বাগদীর নামে তো আর সংকল্প হতে পারে না। তারপর একটু একটু চিন্তিতভাবেই বললেন, তবে আমাকে যদি বল, এক গ্রামে থাকি, হাজার খানেকে আমি রাজী হতে পারি। দানেরও একটা ক্রিয়া আছে কিনা, শাস্ত্রমত সব করতে হবে, যা তা করে ছেড়ে দেওয়া তো যায় না।
এখন তাহলে আমরা আসি ঠাকুরমশাই, বলে প্রণাম করে পাঁচি উঠল। মুড়ো প্রণাম না করেই আগে বাইরে চলে গিয়েছিল। ঠাকুরমশাই কল্যাণ হোক, বলে, ঘরে প্রবেশ করলেন।
বাইরে বেরিয়ে মুড়ো বললে,—পাঁচি আমার একটা কথা শুনবি?
পাঁচি বললে,—বল না, তোমার কথাটাও শুনেনি; অবশ্যি কি করবো তা ভগবানই জানেন।
মুড়ো বললে,—আমার কথা তো শুনবি না, বলে কি হবে বল?
তার কথাটা শুনে করুণ নয়নে পাঁচি ভাইকে একবার দেখে নিলে তারপর বললে, আচ্ছা বলেই দেখ না শুনি কি না। মুড়ো তবুও বলে, আমার মাথায় হাত দিয়ে বল। পাঁচি দৃঢ়ভাবেই বললে,—তা বোলব না। অমনি বল,—দিব্যি করা আমার অভ্যাস নেই জান তো?
মুড়ো বললে,—আমি বলি কি পুকুর কাটিয়ে যাসনে শালা বামুনদের পেট ভরাতে। অত টাকা তুই শুধু শুধু খরচ কেন করবি? একটা টিউবকল কর হাটের ওপর, দু'তিনশো টাকায় হবে না, হয় চার-পাঁচশো বড় জোর হাজার টাকায় একটা খুব ভাল কল হবে। এখন এই টিউবকল হয়েছে, তার কি পরিষ্কার জল—তাতে অত প্রতিষ্ঠার হাঙ্গাম দরকার হবে না। জল কোনদিন নোংরা হবে না, পুকুরের মতই অগাধ জল—। মুড়োর কথা শুনে ত্রৈলোক্য জেঠা পাঁচির দিকে চেয়ে বললে,—বড় মন্দ কথাটা মুড়ো বলেনি পাঁচি? আমারও মনে হয় ঐটিই সবচেয়ে ভাল।
পাঁচি বললে, কিন্তু পুকুরে জল সহজভাবেই যেমন ব্যবহার করা যায়, ওতে কি আর তা হবে? পুকুরের ধরনই আলাদা। মুড়ো বললে,—বেশ হবে, বেশ হবে, ধরন ভালই হবে। আবার যদি পুকুরের কথা বলো তাহলে গলায় দড়ি

দিয়ে মরব। তোর অত টাকা খরচ করে পুকুর কাটাতে হবে না। আমরা যেন শ্যাল-কুকুর আর কি, ওরা বামুন বলে যা মনে করবে তাই হবে।

কথায় কথায় তারা ত্রৈলোক্যের বাড়ির কাছে এসেছে, দেখে সে বললে,—আচ্ছা, আমি তাহলে এখন যাই পাঁচি।

এবার মুড়ো বললে,—আচ্ছা পাঁচি, বামুনদের এত তেজ কি করে হল বল দিকি? ওরা ছাড়া আর সব ছোটলোক, এ বুদ্ধি ওরা পেল কি করে?

পাঁচি বললে,—লেখাপড়া শিখে হয়েছে। তা নয়ত আবার কিসের তেজ?

তবুও মুড়ো বললে, সে যদি বলিস তো লেখাপড়া তো আমরাও শিখতে পারি ইচ্ছা করলে, আমাদের যে ইস্কুলে নেয় না, তুই বরং একটু চেষ্টা করে ইস্কুল কর, সেখানে কেবল বাগদীরা পড়বে, বামুন চামারদের ছেলেরা ঢুকতে পারবে না। পাঁচি স্থির হয়ে বললে,—দাদা! তুমি থামো, ওসব কথা বলতে নেই। মা সরস্বতীর দুয়ারে বামুন বাগদী নেই। বিদ্যে সকলের জন্যে, যে শিখবে তারই। শেষে মুড়ো বললে, পাঁচি চল, কলকাতায় যাই আমরা, সেখানে—

প্রাণের গুহ্য যে কথা, তা মুড়োর মুখে শুনে পাঁচি কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলে না। তার স্বাভাবিক সংযত কণ্ঠে, চিন্তিত মনে পাঁচি বললে,—যদি শেষ অবধি তাই করতে হয়,—টিউবেলটা কোথায় করা যায় বল দিকি?

কেন হাটে, ঠিক আমাদের ঘরের কাছেই। শুনে পাঁচি বললে,—তাহলে যে গ্রামের লোকেরা আসতে পারবে না।

চুলোয় যাক্ গ্রামের লোক,—তাদের বামুনের পুকুর আছে।

পাঁচি বললে,—এমন একটা জায়গায় করলে হয় যেখানে গ্রামের লোক,—

বাধা দিয়ে মুড়ো রেগে বললে,—তুই তাহলে গ্রাম গ্রাম করেই মর;—গ্রামে আমাদের থাকতে দেয়নি,—হাটের পাশে থাকতে দিয়েছে, আমাদের কি ওরা ভালবাসে না খেতে দয়,—তুই যে কেবল গ্রাম গ্রাম করে ভেবে সারা হচ্ছিস? চিন্তিত মনে পাঁচি বললে,—তুমি কি দেখোনি, গরমের দিনে কোথা থেকে ওরা জল নিয়ে আসে—তখন পুকুরগুলো তো সব শুকিয়ে যায়।

আর হাটে হলে, কত লোক আসবে যাবে, ব্যবহার করতে পারবে, গ্রামের চেয়ে ঢের বেশী লোক তো আসবেই আর আমাদের বাগদী যে ক'ঘর আছি—কত সুবিধা হবে, আর তুই কি না বলছিস,—

পাঁচি চমকে উঠে বললে,—তাতেও বলবে ঐ কথা?

কেন বলতে বাধা কি? যারা বাগদীদের পুকুর ছোঁবে না, তারা টিউবেল ছোঁবে কেন? লজ্জা হবে না? শুনে পাঁচি বললে,—দাদা,—ওসব কথা তুমি বোঝ না, ধর্ম নিয়ে কথা আমরা বুঝি না। বামুনদের হাতেই ধর্ম, আমাদের মানতেই হবে। না মেনে উপায় নাই যে? মুড়ো বললে,—মানতে হয় তুই মানগে যা—আমি ওসব জানি না, বোলে চলে গেল ওদিকে। চিন্তিত মনে পাঁচি মনে মনে ভাবলে,—কাল তাহলে জেঠাকে আর একবার জিজ্ঞাসা করে দেখব।

পরদিন পাঁচি সকালে হাটে এসে ত্রৈলোক্যকে ধরলে যে, আমায় রেলীদের

বাবুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দাও। ত্রৈলোক্য অবাক হয়ে বললে,—সে কি রে? রেলীর বাবুদের সঙ্গে তুই দেখা করে কি করবি, তারা ভদ্দর লোক।

তা হোক তুমি আমার নাম করে বলবে, আমি তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে চাই। ত্রৈলোক্য ভাবলে, এবার বোধহয় পাঁচি আমার অন্ন মারবে, হয়ত প্রত্যক্ষ বাবুদের সঙ্গে দেখা করে—নিজেই কারবার চালাবে। ত্রৈলোক্য একটু দমে গেল। তার ভাব দেখে পাঁচি ভেতরের কথাটা বুঝে ফেললে, একটু হেসে বললে,—না না ব্যবসার জন্যে নয়, আমার অন্য কথা আছে জেঠা,—তুমি আমার হাত, হাতকে কাটবো নাকি?

রেলীর ভার ছিল ত্রিলোচন বসু নামে একটি ভদ্রলোকের উপর। তিনি মধ্যে মধ্যে হাটে আসতেন। এখন এই হাটে তাঁদের একটা অফিস ও গুদাম হয়েছিল, প্রতি হাটে একজন লোক সেখানে থাকতো; ত্রিলোচনবাবু যেদিন আসতেন না, সেদিন একজন সহকারী কর্মচারীকে পাঠাতেন মগরা থেকে। পাঁচি, সকলকেই চেনে। তারাও সকলে পাঁচিকে চেনে কিন্তু সাক্ষাৎ ব্যবহার ছিল না। ত্রৈলোক্য যখন বুঝলে ব্যবসার ব্যাপারে নয়, তখন বিশ্বাস করে তাকে রেলীর গুদামে নিয়ে গেল।

সেদিন হাটে ত্রিলোচন এসেছিল। প্রথমে ত্রৈলোক্য গিয়ে পাঁচির কথা বলতে, তিনি তক্ষুনি বাইরে এসে দাঁড়ালেন। তিনি মনে করেছিলেন পাঁচি একজন বৃদ্ধা বা প্রৌঢ়া বিধবা নারী,—কিন্তু সুমুখে তাকে দেখে একেবারে চমকে উঠলেন। পাঁচির মাথায় কাপড় ছিল না সুতরাং পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল।

তিনি গিয়ে দাঁড়াতেই পাঁচি জোড় হাতে, মাথাটি নিচু করে যেভাবে উচিত প্রণাম করে দাঁড়ালো, আশ্চর্য হয়ে তিনি দেখলেন, যেন সাধারণ ভদ্রঘরের বেশ শিক্ষিত মেয়ের মত উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, মুখে লক্ষ্মীশ্রী মাখান, বিশেষ তার ভাসা চক্ষু দুটি যা দেখলে হাল্কাভাবের মানুষ মনেই হয় না। কেমন একটা স্নেহমিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। ভারি ভালো লাগল তাঁর অদ্ভুত এই বাগদীর মেয়েটি দেখে। তিনি প্রণাম গ্রহণ করেই জিজ্ঞাসা করলেন,—কি মা! আমার কাছে কেন এসেছ আমি কি করিতে পারি?

পাঁচি বললে,—আমরা বড়ই দুঃখী মানুষ, বাবুদের হাটের প্রজা,—ছোট জাত, সেজন্যে আমরা মনে করলে একটা কোন ভাল কাজ করতে পারি না। এখানে এমন কেউ নেই যে, একটু স্নেহের চক্ষে দেখে, তাই আপনার পায়ে এসে পড়েচি, আমায় আপনার মেয়ের মত মনে করে যদি একটু দয়া করেন, তাহলে একটা কাজের মত কাজ করা যেতে পারে।

ত্রিলোচন বললে,—কি কাজ করতে চাও, বলো? আমার যা সাধ্য তা আমি নিশ্চয় করবো।

আমার কথা অনেক,—বিশেষ করে এখন আপনার কাজের ঝঞ্ঝাট এ সময় হবে না। আমার উপস্থিত একটা জলের ব্যবস্থা করতে হবে এই গ্রামে। তাছাড়া আজ আরও কথা আছে। আজকের কাজ যখন আপনার শেষ হবে, তখন যদি শোনেন তাহলে ভাল হয়। তিনি বুঝলেন এই বুদ্ধিমতী মেয়েটি তার কথা সকলের সামনে এভাবে বলতে চায় না।

তিনি বললেন,—আচ্ছা তাই হবে, তখন তোমায় ডেকে পাঠাব ; এখন তাহলে তুমি এসো।

পথে আসতে আসতে ত্রৈলোক্য বললে,—হাঁরে পাঁচি, পরামর্শ বুঝি আমরা তোকে দিতে পারতুম না,—তুই কি না গেলি কলকাতার বাবুদের কাছে পরামর্শ করতে ?

ত্রৈলোক্যের কথা শুনে পাঁচি প্রথমে কথা কইলে না ;—তারপর সে যে কথা বললে,—সেটা সত্যই একটা নিরীহ অভিমানের কথা মাত্র। তবে এমন অভিমান যে পাঁচির মধ্যে আছে পূর্বে দেখা যায়নি। আসলে তার এই ভাল কাজটার অর্থাৎ পুকুর-প্রতিষ্ঠার সাধটি এখন টিউবওয়েলে পরিণতিতে সে প্রাণে কম আঘাত পায়নি, কাজেই যখন ত্রৈলোক্য তাকে কলকাতার বাবুদের কাছে পরামর্শ নেবার কথা বোলে খোঁচা দিলে সে তখন আর মনের কথাটা চেপে রাখতে পারলে না। তার সহজ সুরেই বললে,—দেখো জেঠা, আমরা হলুম বাগদী, ছোট জাত,—তোমরা বড় জাত, পয়সার কাজ ছাড়া আর যত কিছু কাজে আমরা অপবিত্র তোমাদের কাছে। বেশী কথা কি, আমাদের এই দেহটার ছাওয়াও তোমাদের কাছে অপবিত্র,—তখন তোমাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে গেলে, ধর্মে বাধবে না কি ?

তার এভাবের কথাটার তাৎপর্য সরল ত্রৈলোক্য প্রথমে ধরতেই পারেনি, তাই পাঁচির কথায় সে একটু উষ্মা প্রকাশ করেই বললে,—আর কলকাতার বাবুদের বুঝি তোকে বাগদী বোলে মনে হবে না ?

পাঁচি তখনি, তার উত্তরে অতি সহজভাবেই বললে,—এমন তো কিছু এখনও বুঝতে পারিনি, জেঠা ; যে ক'বার বাবুদের সঙ্গে—তোমার সামনেই তো দেখা হয়েছে হাটে, বাগদীর মেয়ে বোলে তাদের কথায়, ব্যবহারে কোন ঘেন্না বা অশ্রদ্ধার পরিচয় পাইনি তো — তাছাড়া কলকাতায় কত রকমের কাজ, —আর সেখানে শুনেছি কত কত কলকারখানা ; সেখানে কতো জাতের কত দেশের মানুষে কাজ করে ;—বাবুদের সে-সব ভাল জানা আছে, সেখানে কাওরা, বাগদী বোলে পরিচয় নয়, কাজের সঙ্গে কাজের লোকেরই পরিচয়। তাছাড়া এখানকার লোক, কলকব্জার ব্যাপার,—তোমরা ঐ বাবুদের চেয়ে কি বেশী বোঝ ? তাইতো ঐ কাজটার জন্য ওঁদের ধরেচি, জেঠা !

এখন পাঁচির কোন কথারই প্রতিবাদের ভাষা নেই ত্রৈলোক্যের মুখে। তাই দেখে পাঁচি শান্তভাবেই বললে, কাজটা ওঁরা যদি দাঁড়িয়ে থেকে বুঝে-সুজে করে দেন তাতেই বা তোমার ক্ষতিটা কি, তোমার হাত থেকে কি কিছু বেরিয়ে যাচ্ছে ?

চমকে উঠলো কয়াল পাঁচির এই কথাটা শুনে। এটাতো নির্ঘাত সত্য। ও যদি বিচক্ষণ বাবুদের হাত দিয়ে তাঁদের খবরদারীতে কাজটা করায় সত্যই তো, আমাদের তাতে ক্ষতি কিছুই নেই বরং কাজটা কলকাতার বাবুদের ধরে করবার ব্যবস্থা করে পাঁচি মহা বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে। এইসব কথা ভেবে সে আবার শ্রদ্ধাবান হয়ে উঠলো পাঁচির প্রতি।

এখন সে আবার বিপরীত ভাবতে আরম্ভ করলে ;—কার অন্নে তার

সংসার চলছে আজ ক'বছর,—ঐ বাগদীর মেয়ে যদি তাকে এক কথায় সাড়ে তিনশো টাকা—করকরে, হাতের উপর গুণে না দিতো, সেদিন চোটার সুদে যদি তাকে ধার করতে হতো—এই তিন বছরে সুদে-আসলে তার কি পরিণাম হতো ভেবে তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। তার বদলে তার জমিদারের আড়াই বছরের খাজনা শোধ,—মাসে মাসে সংসার খরচের টাকা পঁচিশ থেকে কোন কোন মাসে পঞ্চাশ টাকা আসছে, কাপড়ের দোকান থেকে ছেলের হাত দিয়েও পনেরো বিশ টাকা প্রতি মাসেই আসছে। আজ গ্রামের মধ্যে সচ্ছল সংসার তাদের, সবাই জানে। সবই তো ঐ বাগদীর মেয়েরই অনুগ্রহে। এইসব তার মনে উঠে নিজেকে পাঁচির তুলনায় কত ছোট সে কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠল, বড় কাতর হয়েই বললে,—তুই কিছু মনে করিসনি, পাঁচি,—তোকে মেয়ের মতই মনে করি,—তাই বলেছি ও কথাটা—ইত্যাদি বোলে পাঁচিকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলে।

আসলে ওটা ওর নিজেরই সান্ত্বনা। এ কথাটা তার বুদ্ধিতে না আসুক কথাটা বোলে মনটা কতক ঠাণ্ডা হলো—অপরাধ থেকে যেন মুক্ত হলো। এ পর্যন্ত পাঁচি তাকেই মুরুব্বি ধরে বাজারের কাজে নেমেছিল, সবাই জানতো পাঁচির কাজ ত্রৈলোক্যেরই কাজ। কাজের বিষয় পাঁচি জানে ত্রৈলোক্য আর ত্রৈলোক্য জানতো বুদ্ধির খেলা যা কিছু তা পাঁচিরই,—এই সত্য সে যেমন বুঝে এমন আর কেউ বুঝে না,—তবুও পাঁচিকে এমন ভুল বুঝলে কি করে? আশ্চর্য মানুষের মন!

রেলীর বাবুদের কাছ থেকেও পাঁচি নলকূপের কাজে নামবার জোর সমর্থন পেয়েছিল। যে বুদ্ধিতে মুড়ো তাকে টিউবকল করবার পরামর্শ দিয়েছিল রেলীর বাবুরাও তাকে ঠিক সেইদিক থেকে সেই পরামর্শই দিলেন। তখনই তার মুড়োর বুদ্ধির উপর একটা শ্রদ্ধাও হলো,—তাকে বোকা বোলে বুঝে এসেছে লোকে, তার বুদ্ধির যথার্থ পরিচয় লোকে যে পায়নি। লোকে কেবল বাইরেই দেখে।

পুকুর হলো না পাঁচির,—তার যে দুঃখ তা এখন অনেকটা কম হয়ে গেল যখন নলকূপ করাই সাব্যস্ত হলো। কিন্তু পুকুর হলে একটা স্থায়ী কাজ চিরকালের মত—একটা কাজের মতই কাজ হতো একথা তার মনের ভিতরে মাঝে মাঝে উঁকি দিতে লাগলো বটে কিন্তু উপায় নেই। আসলে—সে যথাসর্বস্ব দিয়েও পুকুর-প্রতিষ্ঠার কাজে নামতে রাজিও ছিল,—কিন্তু ঐ যে কথাটা, উপরি আরও হাজার দেড় হাজার টাকা দিয়ে ঐ পুকুরটি একজন বামুনকে দান করতে হবে তবে তার জল শুদ্ধ হবে, বামুনেরা ছোঁবে;—কথাটার মধ্যে তারা ছোট জাত বোলে যে ঘৃণা, এটা বেদনা হয়ে লাগলো পাঁচির সরল এবং নির্মল প্রাণের মধ্যে। এইখানেই সে মুড়োর সঙ্গে একমত আর এইটিই প্রবল বাধা হয়ে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার সকল আশাই উলটে দিলে। তার সঙ্গে আরও কিছু করে ফেললেন তার মনের বিধাতা,—এই যে বামুন বৈদ্য কায়স্থ কৈবর্ত কাওরা বাগদী ডোম এইসব ছোট বড় জাতের ঢেউ কোথা থেকে উঠেছে আর তার মীমাংসাই বা কোথা, এইসব নিয়েই এক প্রশ্ন নিরন্তর তার

অন্তরক্ষেত্রে জেগে রইল। বোধহয় জীবনের প্রতিটি দিনে প্রতিটি কর্মের মধ্যেই জেগে রইল।

আরও বিশেষ যে কারণে পাঁচির বুদ্ধি ভিতরে ভিতরে পেকে উঠছিল,—যে জন্য সে টিউবওয়েল প্রতিষ্ঠায় সহজেই রাজি হয়েছিল। ছোটবাবুর ব্যাপার দেখে অবধি সে বুঝেছিল এ গ্রামে তার থাকা হবে না, তাকে এ পাপ জমিদারের সম্পর্ক ছাড়তেই হবে। ত্রৈলোক্যকে সে ভাবিয়ে তুলেছিল যে, তার ধানচালের কারবার যেটা তার প্রাণ, সেটা কলকাতা অর্থাৎ কালীঘাট থেকে কেমনভাবে চালানো যেতে পারে। তাছাড়া পুকুর কাটাতে অনেক দিন লাগবে নলকূপ অল্পদিনেই হয়ে যাবে। আরও এইজন্য নলকূপের ব্যবস্থায় সে সহজেই রাজী হয়ে গেল। তার প্রচ্ছন্ন মনের আর এক খবর যা মুড়ো ছাড়া আর কেউ জানতো না,—সেটা তার লেখাপড়া শিখবার প্রবল ইচ্ছা,—মামার বাড়িতে তাদের ইস্কুলের দিদিমণিদের মত শিক্ষিত তাকে হতেই হবে। এখান থেকে না যেতে পারলে তার কোন সম্ভাবনাই নেই।

এখন থেকে সে তার বড় ভাইটিকে পরামর্শদাতার গৌরব দিতে একটু বেশী ব্যগ্রই হয়েছিল। এতে ত্রৈলোক্য একটু মৃদু ঈর্ষান্বিত হলেও সে বুঝে দেখলে এতে তার আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা তো নেই-ই বরং কিছু কাজ বাড়ায় আর্থিক লাভের দিকটাই বেশী, কারণ পাঁচির এ গুণটির কথা পাঁচির বড় শত্রুরাও স্বীকার করতো যে, কারো পরিশ্রম কখনও বৃথা বা অল্পমূল্যে ফাঁকি দিয়ে সে কখনও নেয়নি। দুর্দিনে গ্রামের কেউ মজুরি করতে গেলে পাঁচির কাছেই আগে যেতো। জনমজুরদের অভাবে বাবুরাও একবার পাঁচিকে শাসিয়েছিল যে, তারজন্যই মজুর পাওয়া যায় না, আর এই যে মজুরির দর বেড়েছে এর জন্যই পাঁচিই দায়ী।

পাঁচি বলে, আমি কি ধরনের মানুষ যে মজুরের দর বাড়াতে যাবো,—জিনিষপত্রের দর আগুন হয়েছে, মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে, তাইতেই মজুরির দাম বেড়েছে। ধান-চালের বাজার দেখেই তো মানুষের জীবন-যাত্রার মান ঠিক বুঝা যায়। বাবুরা এটুকু বুঝতে পারেন না এ বড় আশ্চর্য কথা তো।

অনেকদিন বাদে এবার বাবুদের মেজবাবু দক্ষিণের আবাদ থেকে এসেই খুব তম্বি লাগিয়েছেন—লাটের কিস্তির সময় এসেছে, টাকা চাই। মেজবাবু পাঁচির পুকুর প্রতিষ্ঠার কথা পুরুত অম্বিকা ভট্চাজের মুখে শুনে বললেন,—ওর ইতিমধ্যে এত পয়সা হয়েছে যে, পুকুর কাটাবে? এত পয়সা হলো কি করে?

পুরুত ঠাকুর সর্বজ্ঞ, অনেকটা মোসায়েব শ্রেণীর লোক, বাবুদের গোপন আড্ডায়ও গতিবিধি আছে, কাজেই সকল খবরই খুব খাঁটি রকম জানেন, বললেন,—হবে না? কাঁচা বয়েস, দিনে-রাতে রোজগার চলছে যে—যদি পুকুর কাটিয়ে পাপের ভার একটু কমান যায় তাইতো লেগেছে এ কাজে,— আমার কাছে তো সেইজন্যে এসেছিল। তার ভাইটা আবার গুরু-পুরুত মানে না। তার ওসব ইচ্ছা নয়, কিন্তু পাঁচির মন রয়েছে। খোঁজ-খবর সব নিলে, বোধহয় আসছে মাসেই কাজ আরম্ভ করবে। আপন মনেই ঠাকুরমশাই বলে যেতে লাগলেন,

ফন্দিবাজ মেজবাবুর মনে একটা দাঁওয়ের আশা জাগিয়ে তুলতে আর তাঁকে প্রসন্ন করতে।

মেজবাবু বললেন,—পুকুরটা কাটাবে কোথায়, কার জায়গায় ? পুরুত নিছক কল্পনার আশ্রয় নিয়ে বললেন,—বড় রাস্তার ধারে, রসিক হালদারের কাছ থেকেই চার পাঁচ বিঘা জমি কিনে নেবে, বোধহয়।

কে তাকে ও জমি নিতে পরামর্শ দিলে ? আমাদের জমিটায় এনে ফেলতে পারলেন না ? পুরুত বললেন,— বোধহয় ত্রৈলোক্য কয়ালের পরামর্শে, ঐ লোকটাই তো ওর ধান-চালের কারবার দেখা-শোনা করে, পায়ও বেশ মোটা রকম। ওরই মতলবে মাগী কাজ করে কি না।

ডাকাও তো একবার এখনি সে হারামজাদাকে, ও জমি নিতে কে পরামর্শ দিয়েছে দেখতে হবে!

চৌথি আহির দেউড়ীতে ছিল, মেজবাবু তাকে জোর গলায় হুকুম দিলেন, —ত্রৈলোক্য কয়লাকে এক্ষুনি ধরে নিয়ে এসো।

ত্রৈলোক্য এসে পড়লে—হয়তো তাঁর আর সুবিধা হবে না এই ভেবে,— আজ্ঞে তাহলে এখন আসি, এই বোলেই সাঁটে নমস্কার সেরে গুটি গুটি সরে পড়লেন পুরুতমশাই।

অল্পক্ষণেই কাঁধে গামছা ত্রৈলোক্য এসে উপস্থিত। জোড়হাতে প্রণাম করে বললে,—আমায় ডেকেছেন মেজবাবু ?

মেজবাবু রুক্ষস্বরে বললেন,—প্রায় সাড়ে তিন বছরের খাজনা আর কতদিন ফেলে রাখা যায় ? ত্রৈলোক্য বললে,— আজ্ঞে হুজুর আড়াই বছরের খাজনা তো সেদিন শোধ করে দিয়েছি, কেবল গত সনের অর্ধেকটা বাকি আছে।

এ্যাঁ আড়াই বছরে শোধ করেছো ? কবে করলে ?

আজ্ঞে তখন আপনি লাটে ছিলেন, আপনি নায়েবমশাইকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন না ?

দাখিলা পেয়েছ ?

আজ্ঞে কাঁচা চিঠি পেয়েছি—নায়েবমশাই বলছেন, এ মাসের শেষে পাকা দাখিলা পাবো।

হন্‌হন্‌ করে মেজবাবু কাছারীতে চলে গেলেন, একেবারে নায়েবমশায়ের কাছে গিয়েই সোজা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ত্রৈলোক্য কয়াল আড়াই সনের খাজনা দিয়েছে ? নায়েব বললে,—আজ্ঞে হ্যাঁ, আর কাঁচা রসিদ দিয়েছি।

তুমি জান ও টাকা পেল কোথায় ? ওর তো ফসল হয়নি গত বছর ?

আজ্ঞে বোধহয় পাঁচি দিয়ে থাকবে। ও পাঁচির কারবার দেখে কি না ? বাবু বললেন,—ওকে যেন পাকা রসিদ দেওয়া না হয়, একেবারে তিন সনের সবটা নিয়ে নালিশ হবে।

নায়েব বললে,—ওযে, বড়বাবুকে ধরে আমার সঙ্গে পাকা রসিদ পাবার দিন ঠিক করে গেছে। বড়বাবুর হুকুম, সই সবই হয়ে গেছে।

আঃ ওকে এসব বুদ্ধি কে দিল ? ওটা চিরকালই সোজা লোক ছিল। পাশেই বড়বাবুর ঘর, ঘরে ঢুকেই জেষ্ঠাকে,—বেশ একটা হুমকী দিয়ে মেজবাবু

জিজ্ঞাসা করলেন,—তুমি ত্রৈলোক্য কয়ালের আড়াই সনের খাজনার পাকা রসিদ দিতে হুকুম দিয়েছ? বড়বাবু একটু চমকে গেলেন, বললেন,—হ্যাঁ, কিন্তু কেন? ও যখন সুদে-আসলে নগদ করকরে একশো দশ টাকা দিয়ে গেল ঐ অসময়ে, কি বিপদে পড়েছিলুম তখন ঐ দুঃসময়ে, তুমি ছিলে দক্ষিণে, তোমার কাছ থেকেও কিছু পাওয়া গেল না, তো ঐ টাকাটা তখন পাওয়া গেল। সহজে যেমন পাওয়া গেছে, রসিদটাও তেমন দেওয়া উচিত নয় কি?

তা হলে বাকি সনের খাজনা আদায় হবে কি করে?

ফসল যখন হয়নি, তখন না হয় ধীরে ধীরে দেবে, আর তাছাড়া মাত্র আধ সনের বাকি। কত প্রজাদের দু'সন তিন সনের খাজনা এখনও বাকি রয়েছে তাদের তুলনায় এটা এমন কি বেশী?

ওকে হাতে রাখা দরকার যে,—

কেন?

বাগদী পাঁচি পুকুর কাটাবে। যাতে ও আমাদের জমি নেয়—তার ব্যবস্থা ওকে দিয়েই যে করাতে হবে।

ওকি করবে?

ওযে, পাঁচির মুরুব্বি। ও বেটা রসিকের জমিটা নিতে পরামর্শ দিয়েছে। এখন যদি পাঁচি আমাদের জমি না নেয়,—তাহলে,—

বাধা দিয়ে বড়বাবু বললেন,—পাঁচি পুকুর কাটাবে কে বললে?

তাইতো শুনছি। আমাদের জমি হলে বেশ মোটা টাকা সেলামী আদায় করা যাবে, জায়গার দাম ছাড়া।

বড়বাবু বললেন,—দেখ, খোঁজ-খবর করো, ওকে হাতে রাখা শক্ত হবে না—

সেই রকম হন্‌হন্‌ করে মেজবাবু আবার আটচালায় ফিরে, জোরগলায় ত্রৈলোক্যকে বললেন,—পুকুর কাটাবার জন্যে পথের ধারে ঐ রসিক সরকারের জমি নিতে পাঁচিকে কে পরামর্শ দিলে?

কে আপনাকে এখবর দিয়েছে? পুকুর কাটান হবে কিনা এখনও তো স্থির হয়নি, তবে ও আমাকে সঙ্গে করে পুরুত ঠাকুরের বাড়ি গিয়েছিল এইমাত্র; কিন্তু মতলব যা কিছু সব তার নিজের, ও কারো সঙ্গেই পরামর্শের ধার দিয়েও যায় না। ওকে আপনারা চেনেন না বাবু, ও আলাদা মানুষ। ছেলেমানুষ হলেও ওর যুক্তি পরামর্শ সব নিজের।

আচ্ছা শোন্, ও যদি পুকুর কাটায় তাহলে যাতে আমাদের জমিটা নেয় সেই চেষ্টা করবি।

ত্রৈলোক্য বললে,—আপনি বুঝতে পারবেন না, মেজবাবু? ও কারো পরামর্শ নেয় না, নেবে না। ওর নিজের মন যা চাইবে তাই সে করবে,—সেই ভাবেই করে আসছে। তা ছাড়া ও পুকুর কাটাবেও না।

মেজবাবু একটু যেন দমে গেলেন, বললেন, কেন?

ত্রৈলোক্য বললে,—পুরুতমশাই তাকে যেভাবে একটা বেয়াড়া ফর্দ দিলেন,

—একটা দেড় দু'হাজারের উপরি খরচ দেখালেন তাইতেই ও বিরক্ত হয়ে গেছে,— বোধ হয় টিউবওয়েলেই কাজটা শেষ করবে।

এবারে মেজবাবু অন্য কথা ভাবলেন, চিন্তিত মনে জিজ্ঞাসা করলেন, ওর কত পয়সা হয়েছে, টাকা, টাকা কতটা করেছে জানিস কিছু?

ত্রৈলোক্য বললে,—আজ্ঞে সে খবর কেউ জানে না। তবে চার, পাঁচ হাজার টাকার ফি হাটে চালের কারবার চলছে, এটা জানি। আমায় দয়া করে রেখেছে! রেলীর বাবুদের সঙ্গে ও কথা বলে নিজে তাদেরও হাত করে রেখেছে। আমায় আবার কবে জবাব দেয়, তাহলে আসছে সনে চাষ করবার খরচও থাকবে না। মেজবাবু তৎক্ষণাৎ বললেন,—তাই নাকি? ও আবার এত বড় কেলেবর হয়ে উঠলো কবে তাতো জানি না; শুনিওনি কারো কাছে। দিনে রাতে কারবার করে নাকি?

ত্রৈলোক্য জিব কেটে,—ও কথা বললে জিব খসে যাবে বাবু! ভুলেও ওকথা যেন মনে আনবেন না। আর, যদি কাকেও বলতে শোনেন তাহলে কানে নেবেন না। সে মিথ্যে, আমার চেয়ে ওকে কেউ বেশী জানে না। ওর সম্বন্ধে, মন্দ একটা কথাও কেউ বলতে পারবে না। ওযে হারা বাগদীর ঘরে কেমন করে এলো আমি তাই ভাবি। আপনাদের অন্দরমহলে বৌমারা সবাই ওকে জানেন ভালো। রাজ্যিসুদ্ধ লোককে ও আপন করে রেখেছে। ওকে যে সবাই ভালবাসে।

মেজবাবু বললেন,—মাগীর নাকি ভারি তেজ শুনেছি, আমাদের প্রাধান্য মানতে চায় না?

ত্রৈলোক্য বললে;—তেজ ওর আছে সত্যি বাবু, তবে কারো অধিকারে ও যায় না, অন্যায় কখনও কিছু করে না, সহ্যও করে না। ও বলে সবার সঙ্গে সদ্ব্যবহারেই সম্বন্ধ, অন্যায় কেন সহ্য করবো? উপকার করতে পারি ভাল, অপকার কারো কখনও করবো না। জমিদারের সঙ্গে ঠিক মত খাজনা দেওয়ার সম্বন্ধ কিন্তু রাজা-প্রজা সম্বন্ধ নয়। কোথায় ওর মামার বাড়ি;—সেখানে খৃস্তানী ইস্কুলে ও পড়তো তারাই সব শিখিয়েছে।

যাই হোক ত্রৈলোক্য এইসব খবর দিয়ে নিজ ঘরে গেল; প্রণাম করে যাবার সময় বলে গেল,—দোহাই বাবু, পাকা রসিদ যেন পাই,—আমি বড় গরীব।

ত্রৈলোক্য জেঠাকে সহায় করে ইতিমধ্যে পাঁচি, এক লপ্তে একশো বারো বিঘা ধান জমি কিনেছিল, সুন্দরবন অঞ্চলে। তখনও বেশ সস্তা ছিল জমিগুলি। গভর্নমেণ্টের সঙ্গেই তার বন্দোবস্ত, মধ্যে জমিদার নেই। গত বৎসর থেকে তার চাষ হচ্ছে। সেই ধান বাবদে সে এবার আড়াই হাজার টাকা পেয়েছে। ত্রৈলোক্যেরও কম লাভ হয়নি। সে জমি উর্বরা, নূতন হাঁসিলি জমি, পরে আরও বেশী আয়ের সম্ভাবনা আছে। ত্রৈলোক্যই তাকে ধান ভাগে চাষ করবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। আধা-আধি ভাগ, চাষীরা নিজ ব্যয়ে চাষ করবে ফসল যা হবে অর্ধেক পাওয়া যাবে। কেবল আড়াই শো টাকা, হাল গরু প্রভৃতি চাষের প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য পাঁচিকে দিতে হয়েছিল। পাঁচি সে টাকা আর তাদের কাছ থেকে দাবী করেনি; সেই জন্য তারা পাঁচির অনুগত

এবং বাধ্য হয়েছিল। পাঁচির প্রাণটা মমতায় ভরা, চাষীদের যাতে সচ্ছলে সংসার চলে, যাতে তারা ভাল থাকে তাদের অভাবে পড়তে না হয় সেদিকে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

এই জমি খরিদ ব্যাপারে গত বৎসর থেকেই তার সঞ্চয় হুহু করে বেড়ে যাচ্ছিল,—তাতে তার বাহ্য ব্যবহারে তিলমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেনি। জমির কথাও তার গোপন ছিল। তার ভাই মুড়ো সেও জানতে পারেনি প্রথমে, তারপর গোপনে একদিন পাঁচি এ সম্বন্ধে সকল কথাই তাকে বললে,—আর একথাও জানিয়ে দিলে যে, তার সুন্দরবনে ঐ জমি নেওয়ার কথা প্রকাশ হলে—তাদের এখানে থাকা ভার হবে। জমিদার বাবুদেরও নজর পড়বে, শেষে তাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে। মুড়োও বুঝেছিল। তার বুদ্ধি ছিল ;—তা ছাড়া এখন পাঁচির, দাদার সাহায্য দরকার, একা ত্রৈলোক্যের পক্ষে সব কিছু করা সম্ভব নয় ;—তাই এই দুজন লোক ছাড়া এখনও তার জমি কেনার কথা কেউ জানতো না।

*   *   *

অত্যন্ত গরীব নকুড় বাগদী, গ্রামের চৌকিদার, তিন চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর করে। তার সামান্য এক বিঘা জমি, বাবুদের কাছেই খাজনা করে নেওয়া। জমিটা তার উঁচু, সেইজন্য বেশী বরষা না হলে তার জমিতে ধান হয় না, কারণ উঁচু জমিতে জল থাকে না, শুকিয়ে যায়। তাই সে পাশের খাল থেকে জল নিয়ে ফসল ফলাবার চেষ্টা করে। লম্বা গভীর খাল বারোমাস জল থাকে। বারোমাস ডোঙা চলে হাটের মালামাল যাতায়াত করে। আগে আগে, খালের ধারে যাদেরই জমি তারা খালের জল টেনে নিয়ে চাষ করতো। সম্প্রতি বাবুরা নিয়ম করে দিয়েছেন, খালের ধারের কোন চাষী, তার জমিতে খালের জল নিতে পারবে না, নিলে জরিমানা দিতে হবে। উপরি উপরি তিন বছর ধান না হওয়ায় নকুড় এবারে খালের জল চুপি চুপি কয়টি প্রতিবেশীর সাহায্যে বেশ খানিকটা নিজের জমিতে চালান করেছিল। বাবুদের টের পাবারও সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু অম্বিকা ভটচায্যের ছেলে ঠিক খবরটা ভটচাজকে দিয়ে এসেছে। ফলে বাবুদেরও কানে উঠতে দেরি হলো না। নকুড়কে তলব হলো কাছারীতে,—বিচার সভা বসলো, রায়ও বেরোলো, নকুড়ের পনেরো টাকা আর সহযোগীদের চারজনের দশ এই পঁচিশ টাকা জরিমানা হলো। তিন দিনের মধ্যে আদায় চাই। খবর দেওয়ার জন্য ভটচায্যের তার মধ্যে থেকে পাঁচ টাকা পাওনা হলো।

নকুড়কেই সব টাকাটা দিতে হবে। কিন্তু এত গরীব সে কোথা পাবে টাকা? বাবুরা বলে তা আমরা কি জানি,—জমি বাঁধা দিয়ে দিবি। জমি বন্ধক দিলে আর খালাস করতে হবে না এ জীবনে, একথা সবাই জানে।

খবরটা যথাকালে পাঁচির কানে গেল। মুড়োকে দিয়ে পাঁচি নকুড়কে বোলে পাঠালে রাত্রে নিশুতি হলে নিশ্চয় একবার পোলের হাটে তাদের ঘরে এসে যেন সে পাঁচির সঙ্গে দেখা করে।

স্বজাতি বৎসল পাঁচি নিজের জেঠাকে এক পয়সা কখনও দেয়নি কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে জেঠিকে দিতো, আর তার নাম করতে বারণ শুধু নয় দিব্যি

দিয়ে ছাড়তো। কারণ পাঁচি তার বিপদ বুঝতো, জানাজানি হলে বিপদ বা অশান্তির সীমা থাকবে না। যাই হোক এখন এমন কৌশলে পাঁচি নকুড়কে টাকাটা দিলে যাতে লোকে জানলে ত্রৈলোক্যই নকুড়ের জমি বাঁধা রেখে টাকাটা দিয়েছে।

এইভাবে পাঁচির কাজ চলতো, তার প্রচ্ছন্ন দাত্রীমূর্তি কেউ দেখতেও পেতো না, হাবাগোবা মেয়েটি নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখবার কৌশলটি এমন জানতো তাকে কেউ সন্দেহ করতেই পারতো না। তার খুড়ো জেঠারা তাকে এক নম্বর কেরেট, কঞ্জুস এই সব বলতো,—পাঁচির চরিত্রের এদিকটা তাদের কল্পনারও বাইরে।

সম্প্রতি কিছুদিন থেকে পাঁচি যেন একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। আগেই বলেছি কয়টা ছেলে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা করছিল। সে সাবধানেই আছে কিন্তু তারা একটু যেন বেশী বেশী তার দিকে লক্ষ্য করছিল। তাই একদিন পাঁচি বাবুদের ছোট বৌকে গোপনে সব কথাই বলতে গেল। কিন্তু সংকোচবশতঃ খুলে সব কথা বলতে পারলে না এই ভেবে যে, তাকে এ বিপদ থেকে বাঁচাতে পারবে কি ছোটবৌ। তার সাধ্য কি? তবুও যথাসম্ভব আভাসে তার উপর নজরের কথা বললে এবং এই ব্যাপারের গুরুত্ব কতটা তাও বললে, এর চেয়ে বাড়াবাড়ি ভাল নয়। এখন থেকে একটা বিহিত না হোলে তাকে এ গাঁ ছেড়ে চলে যেতে হবে, এইটুকু ও জানালে। ছোটবৌ বুঝলে পাঁচি একটু ভয় পেয়েছে। সুন্দরী ছোটবৌ মানুষটি শুধুই যে সরল ও দয়াবতী ছিল তা নয়, পাঁচির উপর তার মমতার সীমা ছিল না। স্বামীর সাহায্য সে পাবে না তা ছোটবৌ জানতো,—তাই আজ ছোটবৌ তাকে ভরসার কথা বলতে পারলে না। পাঁচি তা বুঝলে। কিন্তু আজ ছোট বৌয়ের কাছে এসে পাঁচি আর একটা কিছু পেয়ে গেল, সেটাও কম নয়। তাতেই তার ঐ ভয়টা অনেক পরিমাণেই হাল্কা হয়ে গেল। সৎ বস্তুর প্রভাব এমনই হয়ে থাকে। বিশেষতঃ পাঁচির জীবনে তা অনেকবারই হয়েছে।

বাবুদের ন'কর্তা কলকাতায় থাকেন, ছুটির সময় তাঁর মেয়েরা এসেছিল। তাদের সঙ্গে পাঁচির দেখা হয়ে গেল। কি চমৎকার তাদের স্বভাব, সুন্দর ব্যবহার। বড় মেয়েটির এখনও বিবাহ হয়নি, প্রায় তারই বয়সী—একটা পাস করেছে, দ্বিতীয় পাসের পড়া পড়ছে এখন। ছোট মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী সেও পাসের পড়া পড়ছে। তারা পাঁচিকে খুব ভালবেসেছে, তারা অনেক গল্প করলে পাঁচির সঙ্গে। ছোটবৌ-এর মুখে পাঁচির চালের ও দুধের কারবারের কথা শুনে ওরা ওকে খুব সুখ্যাতি তো করলেই বরং আরো খুশি হয়ে বললে, পাঁচি, তুই ভাই আমাদের চেয়েও কাজের লোক, আমরা লেখাপড়াই করতে পারি কিন্তু তোমার মত অমন বুদ্ধি ও চেষ্টার ফলে ব্যবসায় কাজে আমাদের বুদ্ধি যায় না। সেদিকে আমরা বোকা একথা স্বীকার করতেই হবে। শুনে পাঁচির মন উৎসাহ ও আনন্দে ভরে উঠল। লেখাপড়ার দিকে তার যে কতটা মন পড়ে আছে তারাতো তা জানতো না, জানলে আশ্চর্য হতো নিশ্চয়। আত্মবিশ্বাস ছিল তার প্রবল, এখনও তার বয়স বেশী মোটেই নয়, যত্ন করলে লেখাপড়া নিশ্চয়ই

শিখতে পারবে। এ ধারণা তার দৃঢ়ই ছিল। কিন্তু কলকাতায় না গেলে সে কাজটা সুবিধা হবে না,—সেইজন্য কতোদিনে এখানকার কাজ শেষ করে কলকাতায় গিয়ে বোসে লেখাপড়ায় মন দিতে পারবে এই ভাবনায় এখন থেকেই সে দিন গুনছে। এক মুড়ো ছাড়া এর হদিস আর কেউ জানতো না।

এবারে পোলের হাটে ধুমধাম করে বারোয়ারী কালীপুজা হয়ে গেল। পাঁচি সাধারণভাবে চাঁদা, যা তাদের সকল মহাজন দিয়েছে তার উপর এক পয়সাও দেয়নি। কিন্তু বিপদ করলে তার ভাই মুড়ো। কি জানি ফিকিরটা কে তার মাথায় ঢুকিয়েছিল, সে গোপনে পাঁচিকে ধরে বসলো ভূষণদাসের অভিমন্যু বধ যাত্রা দিতে হবে,—অর্ধেক চাঁদা আদায় হয়েছে বাকীটা তাকেই দিতে হবে। পাঁচি অবাক, সে কি দাদা, আমরা কি ধনের মানুষ যে আড়াইশো টাকার অর্ধেক দেবো, তুমি ওদের কথা শুনো না। আমরা দুঃখি্য মানুষ, আমাদের ওসব রোগ ভাল নয়। প্রায় তাকে ঠিক করে এনেছিল পাঁচি কিন্তু মুড়ো ভয়ানক যাত্রা ভালবাসে, তার উপর এই হাটের সেও একজন মুরুব্বির মত। তার বিশ্বাস ছিল পাঁচি রাজি হয়ে যাবে, তার কথা ঠেলতে পারবে না। এখন আবার তার আত্মসম্ভ্রমবোধ হয়েছে। তাকে যারা নাচিয়েছিল তারা বুঝিয়ে দিলে এতে তাদের অপমান, মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। শেষে সে মোক্ষম অস্ত্রটা ছাড়লে, বললে,—পাঁচি, আমি কখনও তোর কাছে কিছু আব্দার করিনি এই আমার শেষ। পাঁচি মর্মপীড়িত হয়ে বললে, ষাট্ ষাট্ অমন কথা আর বোল না দাদা,—আমার মাথায় হাত দিয়ে বলো আর কখনও মুখে আনবে না? মুড়োর আব্দার রাখতেই হলো। যাই হোক ফলে গ্রামে যা বাবুদের দ্বারা হয়নি তাই হলো তাদের ক্ষমতায়।

সারা অঞ্চল, পাঁচ সাতখানা গ্রামের লোক ভূষণের অভিমন্যুবধ যাত্রা শুনলে।

এই সূত্রে পাঁচির সম্মান বেড়ে গেল।

একদল তাকে দেবীর কৃপাপ্রাপ্ত অসাধারণ নারী হিসাবেই দেখতে আরম্ভ করলে, তার মধ্যে ত্রৈলোক্য কয়ালই তাদের প্রধান—সেই ওটা আবিষ্কার করে। অপর দল যারা যৎপরোনাস্তি নীচ মনোভাবাপন্ন, তারা দুর্নাম আরোপ করে খুশী হলো। পাঁচি কোনটাই গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি ;—কারণ গ্রামের লোকেরা ছেলেবুড়ো সব প্রত্যেকেই কে কি প্রকৃতির তা সে ভালোমতোই জানতো, সেটা প্রায় তার বারো বৎসরের অভিজ্ঞতা,—তার সে অভিজ্ঞতার মূল্য ছিল।

বারোয়ারী উৎসবের পরের কথা। এক সপ্তাহ পরে এক রাত্রে, তখন প্রায় দুপুর হবে,—ঈশ্বরের ঘরে ঈশ্বর, পুঁটের ঘরে বৌ ছেলেপুলে নিয়ে পুঁটে ঘুমোচ্ছে ; কেবল পাঁচি তার ঘরের মধ্যে আলো জ্বালিয়ে লেখাপড়ায় ব্যস্ত। তার ঘরখানি বেশ পরিচ্ছন্ন, একটি সাদাসিধে কেরোসিনের অর্থাৎ দেবদারু কাঠের টেবিল আর টুল তার সামনে—তারই উপরে বসে পাঁচি হিসাবে মনোযোগী। দেয়ালে একখানা চকচকে রামদা, অপর দেয়ালে একখানা ভোজালে ;—এক কোণে একটা বর্শা। পরিষ্কার বিছানা পাতা তক্তার উপর ঘরের সামনে দাওয়ার উপর একখানা মাদুর পাতা, তার উপর মুড়ো অকাতরেই ঘুমাচ্ছে। সে ঘরে শুতো না, বরাবরই দাওয়ায় শোয়, আর পাঁচির ঘরের সামনের দাওয়াই তার প্রিয়—

ঠিক যেন পাঁচির গার্ড সে। সারা দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর সন্ধ্যার পর ক্লান্তিতে সে আর সংজ্ঞা রাখতে পারতো না, ভাত খেয়েই সে পোড়তো আর মড়ার মতই ঘুমাতো। এখন, যখন পাঁচি ঘরের ভিতর আলো জ্বালিয়ে তার সারাদিনের হিসাব-নিকাশ করছিল, গ্রামের ঈশান হালদারের ছেলে ফটকে এসে দরজা থেকে ফিস্‌ফিস্‌ করে ডাকলে,—ছোটবাবু ডাকছে, পাঁচি, একবার বাইরে এসো।

পাঁচি প্রথমটা অবাক, তারপরই যেন সহজভাবে বললে,—এত রাতে কেনরে, আমায় ডাকছে,—ছোটবাবু কোথায়?—সে বললে,—ঐ গাছতলায়। একটু ভেবে পাঁচি বললে,—আচ্ছা যা, যাচ্ছি। ফটকে চলে গেলে, পাঁচি সব গুছিয়ে রেখে, তারপর আলো হাতে নিয়ে বাইরে দাওয়ায় রাখলে, তারপর মাথার বালিশটা উলটে তার তলা থেকে খাপেভরা একটা নেপালী কুরকী বার করে, কোমরে কাপড়টা জড়িয়ে, খাপ খোলা কুরকীটা বাঁ হাতে নিয়ে বাইরে এসে বেশ জোর গলায় ডাকলো, কৈ গো ছোটবাবু, কোথায়? ছোটবাবু একটা কাশির শব্দ করে উত্তর দিল, একটু দূরে খালের কাছ থেকে, তারপর আস্তে আস্তে বললে —এই যে, পাঁচি এইদিকে, এসো। গলার আওয়াজে পাঁচি বুঝলে বেশী মাত্রায় পানের ফলে এই অবস্থাই সম্ভব। আওয়াজ লক্ষ্য করে পাঁচি এগিয়ে গেল। দেখলে ছোটবাবু গাছের গুঁড়িতে একটা হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে, এগিয়ে এসে পাঁচির একটা হাত ধরতে গেল, পাঁচি একটু সরে এসে বললে, —ছোটবাবু তোমার এখনও চৈতন্য হল না এতটা উচ্ছন্ন গিয়েছ?—একটু লজ্জা-ঘেন্না কিছুই নেই? পাঁচির কথায় ছোটবাবু কোন উত্তর করলে না, ঘাড় হেঁট করে এমনভাবে বসে রইলো যেন বড়ই মন দিয়েই শুনছে কথাগুলো, কিন্তু পাঁচি বুঝলে ওটা নেশার ঝোঁক। তখন পাঁচি আবার বললে,—সেদিন ছোটমার ঘর থেকে আসবার সময় সিঁড়িতে আমায় ধরতে গিয়েছিলে—ছোটমার মনে দুঃখ হবে তাই আমি সেটা চেপে গিয়েছিলুম,—তাই বুঝি সাহস বেড়ে গিয়েছে? আজ একেবারেই ঘরে এসে উঠেচো। অমন সুন্দর বৌ ঘরে থাকতে, এসেছ কিনা বাগদীর মেয়ের কাছে, ছিঃ ছিঃ!

ছোটবাবু বললে,—তুই আর ধর্ম কথা শোনাতে আসিসনি পাঁচি, তোকে আমি কত ভালোবাসি তা জানিস? পাঁচি অধৈর্য হয়ে বললে,—তা আর জানি না, তোমাদের ভালবাসার কথা, শ্যাম মোড়লের বিধবাকেও তো ভালোবেসেছিলে, তারপর তার গর্ভ করে দিয়ে, কাছারীতে আনিয়ে মিছিমিছি গ্রামের দু'তিন-জনকে মারধোর ক'রে শেষে দণ্ড, জরিমানা করে তাদের গ্রামের বাইরে বার করে দিলে। বড়বাবু ভালোমানুষ, তিনি জানতেন না আসল কথা কিন্তু মেজবাবু আর গ্রামের সবাই তো জানতো কে ও কাজ করেছে? সে বেচারার যে কি হলো, কোথায় বা গেল তা কেউ জানে না, এর কি কোন বিচার নেই? তোমাদের কাছে নেই কিন্তু উপরওয়ালার কাছে আছেই।

কে,—কে তোকে এসব কথা বলেছে? সব মিথ্যে কথা। ওসব কথা ছেড়েদে। আমি তোকে চাই, আমি তোকে ভালবেসেছি, তোকে না পেলে পাঁচি আমি পাগল হয়ে যাব। তুই আমায় দয়া কর, ছোটবাবু এই বলে পাঁচির

ডান হাতটা খপ করে ধরে ফেললে। পাঁচি তার নিঃশ্বাসে মদের গন্ধ পেলে, —তখন কিন্তু আর কিছুই বললে না। ছোটবাবু হাতখানা টিপতে টিপতে বললে, তোর হাতটা কি শক্ত রে পাঁচি ; এ যেন বেটাছেলের হাত।

পাঁচি বললে,—আমার মুখ তোমার ভাল লাগে ছোটবাবু? বাবু তৎক্ষণাৎ বললে,—তোর ঐ চোখ রে, তোর ঐ চোখে কি আছে জানিস? বলতে বলতে ধীরে ধীরে গাছটার তলায় ঢিবির উপরেই এসে বসে পড়ল। পাঁচির হাত তখনও ছোটবাবুর হাতে ধরা আছে—সে চুপটি করেই ভাবছিল। আর ছোটবাবু তার হাত ধরে মনে মনে ভাবছিল, বনের পাখি বোধহয় এখন বশ হলো। সে বাঁ হাত দিয়ে পাঁচিকে জড়িয়ে ধরে বললে,—তোর চোখ দুটোই আমায় মেরেছে রে পাঁচি। তুই ও চোখ পেলি কোথায়? পাঁচি ধীরে ধীরে তার ডান হাতটি ছাড়াতে ছাড়াতে বললে,—আমিও মোরেচি গো ছোটবাবু,—তোমায় কি দেখে মরেছি জানো? ছোটবাবু অন্ধকারে তাকে দেখবার চেষ্টা করে বললে,—তাহলে তুইও আমায় ভালোবাসিস, সত্যি বল্‌লি, পাঁচি?

নিশ্চয়, ভালোবাসি, বলে—ছোটবাবুর নাকটিতে হাত বুলোতে বুলোতে বললে,—আমি তোমার এই নাকটি দেখেই মোরেচি। কি চমৎকার নাকটি তোমার, এ রাজ্যে এমন কারো আছে? পাঁচির সাহস দেখে পাঁচি নিজেই ভয় পেয়ে গেল। কামান্ধ পশুর এই নগ্ন মূর্তি দেখে সে কখনও এতটা নিকটে এসে অভিনয় করতে পারতো না দিনমান হলে, ভাগ্যে এটা রাত্র। তার অঙ্গ-স্পর্শের প্রভাব,—ছোটবাবু কিন্তু বিশ্বাস করলেন তার কথাটা, তার খড়্গ-নাসার সুখ্যাতি তিনি বাল্যকাল থেকেই ঘরে-বাইরে শুনে আসছেন। এই অবস্থায় যখন তিনি পাঁচিকে বিশ্বাস করে তাঁর আঙুলগুলি পাঁচির গালের উপর চালনা করে আর পাঁচির আঙ্গুলগুলিকে নিজের খড়্গ-নাসার উপরে স্পর্শসুখ অনুভবের অধিকার দিয়ে তার উদ্দাম ভোগতৃষা নিবৃত্তির নিশ্চিত পূর্ব লক্ষণ বুঝে নিশ্চিন্ত ছিলেন তখন পাঁচি, বিশ্বাসঘাতিনী তার আর একটা হাত নিয়ে এসে তার নাসার উপর কি যে করলে,—ছোটবাবু যন্ত্রণায় দাঁড়িয়ে উঠেই নাকে হাত দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন—কি করলি রে সর্বনাশী. উহুঁ হুঁ হুঁ কেটে দিলি, এ যে রক্ত! তার নেশা ছুটে গেল।

পাঁচি ততক্ষণে বিদ্যুৎগতিতে নিজেকে নিরাপদ স্থানে এনে ফেলেছে। সেইখান থেকেই বললে,—ও কিছু নয় ছোটবাবু,—তোমার ঐ সুন্দর নাকের উপর ভালবাসার একটু চিহ্ন করে দিলাম ভুলতে পারবে না আর কখনও। জমিদার বোলে আর কোন অসহায় প্রজার মেয়ের রূপ-যৌবনের উপর অনুরাগ দেখিয়ে তাকে সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে যেও না—শ্যাম মোড়লের বিধবাকে যেমন করেছিলে। তোমার বিচার এখনো হয়নি কিন্তু হবেই, তার জন্য তৈরী থেকো।

পাঁচি শুধু ডগার উপরে সামান্য একটু অংশই কেটে দিয়েছিল। নাকে-মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ছোটবাবু তাড়াতাড়ি চলে গেল, যাবার সময় পাঁচিকে কেবল বললে,—আচ্ছা। তোকে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াবো। তার দাঁত কড়-মড়ানিটা পাঁচি শুনতে পেলে। ভয় পেলে না পাঁচি।

পাঁচি তার ঘরে গিয়ে কুরকীটা ধুয়ে-মুছে যথাস্থানে রেখে, আবার খাতাপত্র নিয়ে বসলো। যখন তার হিসেব আর পড়ালেখা শেষ করে উঠল, তখন পূর্বদিক ফরসা হয়ে এসেছে। তা হোক তবুও পাঁচি ঘণ্টা খানেক ঘুমিয়ে নিলে।

যাই হোক এক সপ্তাহের মধ্যেই ছোটবাবু আমাদের সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন এবং চশমা ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন ভালো দেখাবার জন্য, কিন্তু ভালো দেখায় কিনা তা তিনি বুঝতে পারেন নি। কারো সঙ্গে সামনাসামনি হলে হাতের আঙুলগুলি তাঁর উঠতো গিয়ে নাকের ডগায়—তবে এটা সত্য কথা আর তিনি ও কাজে নামেন নি।

পাঁচি কিন্তু এত করেও ছোটবাবুর কোপ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারলে না। ছোটবাবুর সঙ্গে রাত্রে তার দেখা হওয়া অবধি আজ কয়েক দিন একটা লোক অনবরত তার অনুসরণ করছে। লোকটাকে সে চেনে না, কখনও তাকে দেখেনি কারণ সে এ গ্রামের নয়। তাই সে লোকটাকে দেখিয়ে মুড়োকে জিজ্ঞাসা করলে, লোকটাকে চিনিস? হাটের ধারে মাঠের উপর লোকটা তখন একটা বাওলা গাছের নীচে বসেছিল। মুড়ো অনেকক্ষণ ঠাহর করে দেখবার পর বললে, ওযে উলটোনের হামিদ আলি। পাঁচি বললে, ঠিক দেখেছিস্—ওকে জানিস? মুড়ো বললে, শুনেছি ও ডাকাতের সর্দার, ঘাটেশ্বরার হাটে যে সেদিন দাঙ্গা হয়েছিল ঐ তো করেছিল। বাবুদের বাড়িতে ওর যাতায়াত আছে, চৌথার কাছে আসে জানি, আর কিছু জানি না।

*   *   *   *

পরদিনের কথা। তখন প্রায় সন্ধ্যা,—পাঁচি তাদের তুলসীতলায় দীপ জ্বালিয়েই একবার খালের ধারে খোঁয়াড়ে হাঁসের তদারকে গেল, হাঁস সবগুলো ফিরে এসেছে কিনা দেখে-গুণে এলো,—তাড়াতাড়ি ফিরে যখন আসছে—হঠাৎ দু'তিনজন ষণ্ডা-গুণ্ডা গোছের লোক এসে পিছন থেকে তাকে জড়িয়ে, মুখে কাপড় গুঁজে, তার হাত দুটোকে পিছন দিকে বেঁধে, একেবারেই তাকে তুলে নিয়ে চললো।

পাঁচি দেখলে চার পাঁচটা লোকের সঙ্গে সে পারবে না, কাছেও কেউ ছিল না, ঈশ্বর এখনও ফেরেনি, মুড়ো ঘাটেশ্বররায় গিয়েছিল জানতো—সেও এখন নেই, কাজেই সে বৃথা কোন চেষ্টাই করলে না। তারা তাকে নিয়ে ডোঙায় তুললে। ডোঙার মধ্যে একজন ছিল,—পাঁচিকে তারা ভিতরে শুইয়ে দেবার পরই সে একটা কি এনে পাঁচির নাকের উপর ধরলে। অল্পক্ষণেই পাঁচির আর কোনও জ্ঞান রইলো না, তার দেহ এলিয়ে পড়লো।

*   *   *   *

পরদিন সকালে নিলাম্বরপুর গ্রামে খালধারে তাকে অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া গেল। ত্রৈলোক্য ও আর সবাই মিলে তাকে নিয়ে এলো ঘরে। মুড়ো কাঁদতে কাঁদতে যখন পাঁচিকে তার বিছানায় শুইয়ে দিলে তখন পাঁচির দেহে প্রাণের কোন লক্ষণ ছিল না।

পাঁচির এই যে গুরুতর আঘাত, শুধুই পাঁচির নয় হাটের উপর বাবুদের যত প্রজা ছিল তারা সবাই ছোটবাবুর দুষ্ট চরিত্র-ঘটিত সকল ব্যাপারই জানতো,..

তারা সবাই ত্রৈলোক্যকে দিয়ে বাবুদের জানিয়ে দিলে, এ তারা কোনমতেই সহ্য করবে না,—ছোটবাবুর এই অত্যাচারের প্রতিবিধান তারা করবেই। ত্রৈলোক্যই ছিল ব্যবহার-জগতে পাঁচির ডান হাত, একথা সবাই ভালোরকমই জানতো। মুলে, সেও সবাইকে বুঝিয়ে দিলে, আজ অসহায় বাগদীর মেয়ের উপর যেটা হয়েছে কাল তোমার-আমার ঘরে যে হবে না একথা কে বললে? কাজেই তারা এর প্রতিশোধ নেবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠলো। সব খবর উত্তমরূপে জেনে নিয়ে রেলীর ত্রিলোচন বাবু হলেন সহায়। আসামী কে জানাই ছিল, সাক্ষী-সাবুদ নিয়ে তাকে চালান দিলেন কুলপীর নূতন দারোগা,—তিনি বাবুদের কীর্তি-কাহিনী আগেই শুনেছিলেন সকল কিছু। আর ঐ হামিদালী বিখ্যাত জেল ফেরত আসামী ছিল ;—তার পূর্বাপর অপরাধের তালিকা চমৎকার সংগ্রহই ছিল। প্রথমে ডায়মণ্ডহারবারে ডেপুটির কোর্টে মকদ্দমা দায়ের হলো, সেখান থেকে আলীপুর জেলা জজের সেসানেই গেল মকদ্দমাটা। এঁরা তাই-ই চেয়েছিলেন, আসামীর গুরুদণ্ডই তাঁদের কাম্য। এই মকদ্দমার ফল যা হলো, তাতে সবাই সন্তুষ্ট হলো। ঐ অপরাধীর পাঁচ বৎসর, তার সঙ্গী দুজন, তাদের তিন বৎসর করে জেল হলো।

পাঁচি, এই ঘটনার পর থেকে কিছুদিন সহজে ঘর থেকে বার হতো না, কি ভাবতো তা সেই জানতো। কাজে-কর্মে ত্রৈলোক্য এসে সব কিছু বুঝিয়ে দিয়ে যেতো ;—বাকী যা কিছু মুড়োকে দিয়েই হতো। প্রায় একটি মাস সে লোক-চক্ষের অগোচরে ছিল। এই এক মাসেই সে তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করে ফেললে,—কাকেও কিছুই বললে না। তারপর কিছুদিন আগে সে যেমন ছিল তেমনিই চলতে লাগলো। একটা কর্ম তাকে এখানে আরও কিছুদিন থাকতে বাধ্য করলে, সেটা ঐ টিউবওয়েলের ব্যাপার।

এখন একটার পর একটা কাজ বড় কৌশলেই শেষ করে ফেলতে লাগলো পাঁচি।

তার প্রাণে ছট্‌ফটানি বেড়ে গেল একদিনের ব্যাপারে। হাটে সেদিন ন'বাবুর দুই মেয়ে এসেছে হাট দেখতে, সঙ্গে চৌথী দারোয়ান আছে পিছনে। হাট দেখতে কি পাঁচিকে দেখতে, ঠিক বলা যায় না। তবে এসেছিল এরা এটা ঠিক। কারণও একটু ছিল।

ছোটবাবুর কীর্তি-কলাপের পর থেকে পাঁচি বাবুদের বাড়ি যাওয়া-আসা একেবারেই বন্ধ করেছিল। ঐ বাড়ির ছোট বৌটির কি জানি কেন পাঁচির উপর একটা দরদ, আর পাঁচিরও ততটাই মমতা যাকে বলে, তা কম ছিল না। দুই পক্ষেই এটা একটু প্রবলই ছিল? ছোটবৌ-এর নিজ সন্তান ছিল না, বাড়ির যত ছেলে সবারই সে ছিল মা, আর পাঁচি ছোটমা বোলে গিয়ে দাঁড়ালে তাকে আর বাগদীর মেয়ে বোলে মনে করত না। যাই হোক পাঁচি যাওয়া বন্ধ করলেও ছোটমা তাকে স্মরণ করতে ভোলেনি।

বাবুদের বাড়ির ঝি বিলাসী। ছোটবৌ গোপনে তাকে প্রায়ই পাঠাতো পাঁচির ঘরে। হঠাৎ পাঁচি যাওয়া বন্ধ করলে কেন এ রহস্য ভেদ করতে না পেরে সে অস্থির হয়ে উঠছিলো।

তারপর পাঁচিকে একরাত্রে ধরে নিয়ে যাওয়া, পরদিন অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া এসব খবর শুনে পাঁচিকে দেখবার জন্য ছোটবৌ ব্যাকুল, বড়ই উতলা হয়ে উঠলো। ছোটবাবুকে ধরে বসলো একবার পাঁচিকে দেখবার ব্যবস্থা করে দাও। কেঁদে সে চক্ষু দুইটি ফুলিয়ে ফেললে, পাঁচির উপর কি ভয়ানক পীড়ন গিয়েছে একথা মনে করে—তার প্রাণ কেঁদে উঠে। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না। জানতেও পারে না তার বর্তমান অবস্থা। কোন উপায় না করতে পেরে কেমন মন-মরা হয়ে রইল কিছুদিন।

তারপর আদালতের মকদ্দমার কথা, বিচারে আসামীর জেল হওয়ার কথা শুনলে। মনটা তার কতক শান্ত হলো বটে। কিন্তু পাঁচিকে একবার এখানে আনানোর ব্যাপারে,—ছোটবাবুকে কিছুতেই সে বাগাতে পারলে না। পাঁচির কথা শুনলেই ছোটবাবু বিষম ধমকে ওঠেন,—কে সে তোমার, তার জন্য এত দরদ কিসের, একটা বাগদীর জাত-কুল খাওয়া মেয়ে বৈ তো নয়। শেষে ছোটবাবুর ঐ বিপরীত মূর্তি দেখে ভয়ে সে আর পাঁচির নামগন্ধও করতো না, ছোটবাবুর কাছে। এমনই সময়ে ন'বাবুর মেয়েরা এলো কলকাতা থেকে। তারাও পাঁচির খোঁজ করলে। শেষে তাদের সঙ্গে ছোটবৌ গোপনে পরামর্শ করলে। তারা তো এখানকার মেয়ে, ঝিউড়ি, বড়বাবুও তাদের ভালবাসেন,—সুতরাং হাটবারে হাট দেখবার নাম করে বড়বাবুর অনুমতি নিয়ে তারা হাট দেখতে আসবে আর পাঁচির খোঁজ নেবে ;—এই ভাবের একটা ষড়যন্ত্র হলো তাদের মধ্যে।

পাঁচি সেদিন সকালেই ঐ বাবুদের সঙ্গেই টিউবওয়েলের সকল ব্যবস্থা পাকা করে এইমাত্র হাটে ফিরে এসেছে। সোমবারের হাট, খুবই জিনিস-পত্রের আমদানি, লোকজনও প্রচুর। ঐ দিনেই চালটা ধানটা আসে বেশী। পাঁচি তার গোলার সামনেই দাঁড়িয়ে। তখন তারই চাল মাপা হচ্ছিল, রামে-রাম, দুইয়ে দুই, তিনে তিন,—তাই দেখছিল। ধবধবে সাদা একখানা খদ্দরের শাড়ী পরা, বেশ চমৎকার আঁটসাঁট করে কোমরে আঁচলটা জড়ানো। তার কপালে মুখে ঘাম,—পরিশ্রমের গৌরবে দীপ্ত মুখখানি দেখতে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। কানে-কলম ত্রৈলোক্য কয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে যে মাপের কাজ চলছিল সে তখন সেইদিকেই লক্ষ্য করছিল তাই প্রথমে তাদের দেখতে পায়নি। কিন্তু বড়ো মেয়েটি পদ্মা,—তাকে দেখতে পেয়েছিল সবার আগেই। ছোট বোনকে সে দেখালে ঐ দেখ পারুল,—ঐ দেখ,—আমাদের পাঁচি নয়? তাইতো ঐযে পাঁচি! তারা দ্রুত পা চালিয়ে এসে পাঁচির হাতটি ধরে ফেললে, বললে,—পাঁচি! কেন ভাই তুমি এতদিন যাওনি, আমাদের বাড়িতে কলকাতা থেকে আমরা এসেছি। চলো, ভাই, আজ যেতেই হবে।

এক নিঃশ্বাসে পারুল কথাগুলি বলে তাকে ধরে টেনে নিয়ে যায় আর কি!

পাঁচি একেবারেই স্তম্ভিত, ব্যাপার কি ?—এযে একেবারেই অপ্রত্যাশিত! আনন্দ তার হলো, এদের দেখে, তাই সে একটু ম্লান হাসলে—বললে, আমার কথাটা যে তোমাদের মনে আছে আমি ভাবতেও পারিনি। মেয়ে দুটি যেন

একটু নিরিবিলি জায়গায় পাঁচির সঙ্গে কথা কইবে এইটিই চাইছিল, তাই এদিক-ওদিক দেখে বড়টি বললে, চলো না পাঁচি, তোমাদের ঘরে যাই। সেখানে একটু বসব, একটু কথা কইবো, চলো না ভাই ;—তাকে অনুরোধ করতে লাগলো।

পাঁচি দেখলে বিপদ, বাবুদের বাড়ির মেয়েরা পাঁচির ঘরে যাবে, হাটের মধ্যে চক্রসংধানী কতো লোক আছে তারা এই বিষয়টি কিভাবে বাবুদের আবার পাঁচির বিরুদ্ধে লাগাবে, বাবুদের মেয়েরা তো এসব জানে না কিন্তু পাঁচি তো খুব ভালই জানে,—সে তো এখানকারই মেয়ে। সে বললে,—আমার তো এখান থেকে নড়বার জো নেই দিদিমণি, আমার চালমাপা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে যে। এখন তোমরা হাট দেখে-শুনে যাও পরে এক সময় আমি তোমাদের বাড়ি গিয়ে দেখা করে আসবো। পাঁচির কথায় তারা আশ্বস্ত হলো না ; বড়টি চুপি-চুপি তার কানের কাছে বললে,—তা হবে না, তুমি এখনি চলো ভাই, কাকীমা, তোমার জন্যেই আমাদের কত সাধ্যসাধনা করে পাঠিয়েছে, ছোট কাকী যে তোমায় কত ভালোবাসে তা যদি জানতে, তা হলে কখনই এমন চুপচাপ থাকতে পারতে না।

পাঁচি দেখলে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব কথা হওয়াও ঠিক নয়, দূরে দরোয়ান, চৌথী আহীর দাঁড়িয়ে, বড়বাবুর হুকুমে সেই তো মেয়েদের সঙ্গে এসেছে সব দেখছে আর অবাক হয়ে ভাবছে, ব্যাপার কি,—এরা কলকাতার মেয়ে, পাঁচিকে এতটা খাতির করে কোন্ হিসাবে? সে ভেবে পায় না। তবে সে পাঁচির সততার বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিল। এখন পাঁচি দেখলে এইভাবে চলতে দিলে তাতে বাবুদেরই বিপদ বেশী। মহামুশকিল হলো তার, কি করা যায়? ভেবেচিন্তে সে ধীরে ধীরে সেখান থেকে সরে এলো। পায় পায় বেশ সহজ ভাবেই সে তাদের এনে ফেললে খালের দিকে একটা বট গাছের তলায়, সেখানে অনেকটাই আড়াল ছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে পাঁচি, কৌশলে, নানা মিষ্ট কথায়, খানিকক্ষণ ধরেই সেই সুবুদ্ধি মেয়েদের ভাল করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি পাঠিয়ে দিলে। ইতিমধ্যে তার যেটুকু জানবার তা জেনেও নিলে, আর তার ছোটমাকে যা বলতে হবে তাদের কাছে বোলেও দিলে। সে এই খবরটা বিশেষ করেই পাঠালে যে, টিউবকলটা হয়ে গেলেই সে একদিন গিয়ে ছোটমায়ের কাছে বিদায় নিয়ে আসবে। আরও জানালে যে, ছোটমার দুঃখ সে সবার চেয়ে বেশী বুঝে ;—কিন্তু সে নিরুপায় বোলেই যেতে পারেনি। তার দিক থেকে যেটা জানবার সেটাও জেনে নিলে—পদ্মা ও পারুল দুজনেই পাসের পড়া শেষ করেই পরীক্ষা দিয়ে ছুটিতে এসেছে। এই কথাটাই তাকে একটু নাড়া দিয়ে গেল।

তারা চলে গেল, আরও ভাবনার বোঝা যেন চেপে বসলো;—সে এখনও এখানে পড়ে আছে পড়াশুনা তার কিছুই এগোয়নি। হায় কলকাতায় থাকলে কত কিছু হতে পারতো। লেখাপড়া তাকে যে শিখতেই হবে! মা সরস্বতীর মন্দিরে তাকে যে প্রবেশ করতেই হবে। এই যে তার ধন উপার্জনের চেষ্টা, কি জন্য? ঐ বাণীর মন্দিরে প্রবেশের জন্যই তো। এই বড় জাত, ছোট জাতের রহস্য ভেদ হবে ঐ বিদ্যার মন্দিরে প্রবেশ করতে পারলে। এ সম্বন্ধে

তার মনে কোন সংশয়ই নেই। এইভাবেই তার মধ্যে একটা উত্তেজনা, জীবন মরণের দ্বন্দ্ব যেন,—আজ যদিগয়ে গেল পদ্মা আর পারুল হাট দেখতে এসে।

তারপর নিজ জন্মভূমি ছাড়বার আগে পাঁচি কিভাবে সব-কিছু ব্যবস্থা করে নিলে এখন সেই কথাটাই বলে নিতে হবে। ঐ নলকূপের বিষয়ে আসল কথা এই যে, হাট বাবুদের,—পুকুর কাটালে মোটা টাকা পাওয়া যেতো, কিন্তু পাঁচি পুকুর তো কাটালেই না শেষ অবধি টিউবওয়েল হবে হাটে এই কথাই যখন ঠিক হলো পাঁচি ত্রৈলোক্যকে বললে, যাই করি শেষ অবধি বাবুদের হাতে যেতেই হলো দেখছি, এখন তুমি গিয়ে বাবুদের কাছ থেকে অনুমতিটা নিয়ে এসো জেঠা। তারপর, আশ্চর্য মেয়েটার বুদ্ধি—কখন যেতে হবে, কোন্ সময় বাবুরা একত্র বসে সব কিছু বিচার করে,—এটা শুনে প্রথমে বাবুরা কি বলবে, তার উত্তরে কি বলতে হবে ;—তারপর তারা কি বলবে, তার উত্তরে কি বলতে হবে, যেমন করে পাখিকে রাধাকৃষ্ণ পড়ায় সেই রকম করে পাঁচি ত্রৈলোক্য কয়ালকে শিখিয়ে-বুঝিয়ে ছেড়ে দিলে আর এই কথাটা বিশেষ করে বলে দিলে যা কিছু সে বলবে কেবল বড়বাবুর দিকে লক্ষ্য করে যেন বলে—অন্য কারো দিকে চাইবে না।

পাঁচির সব কথা শুনে কয়ালের ভাল লাগলো না,—মেয়েটার পয়সা হয়ে মাথাটা বিগড়েছে দেখি ; আমার যেন কোন বুদ্ধি নেই। এইকথা ত্রৈলোক্য ভাবলে—তারপর কিন্তু এই ব্যাপারটার শেষ অবধি দেখে,—মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো, তার বিচারে ভুল আছে, পাঁচিকে সে বুঝতেই পারেনি। সে ফেরবার পথে, বাবাঠাকুরের থান দিয়ে আসতে আসতে নিজের হাতেই নাক কান মলে প্রতিজ্ঞা করলে যে আর কখনও পাঁচিকে বিচার করবে না।

যাই হোক এখন,—ভদ্রতার খাতিরে সে পাঁচির কথা শুনে তারই উপদেশ মত সব কিছু করবে স্বীকার করে সে তো বাবুদের বাড়িতে যথাসময়ে উপস্থিত হলো। পাঁচি তাকে সময়ের কথাও একেবারেই নিখুঁত বলে দিয়েছিল। ওসব খবর তার চেয়ে বেশি কে জানবে ? সাত বছর বয়স থেকে সে বাবুদের সংসারের হাল-চাল দেখে আসছে। কোন গুরু ব্যাপারে বাবুদের সঙ্গে দেখা করবার সময় হলো যখন বৈঠকখানায় সকালের দিকেই তিন ভাই একত্র থাকেন। পাঁচিকে যাই মনে করুক ত্রৈলোক্য, বাবুদের বাড়ি গিয়ে যখন তিন বাবুর একত্র সমাবেশ দেখলে, তখনই তার যতো কথা অর্থাৎ পাঁচি যা যা বলেছিল প্রায় সবই গুলিয়ে গেল। তিন বাবুকেই প্রণাম করে—কথাটা পাড়ার সময়েও সে একটু ভুল করলে। এইভাবে পাঁচি কথাটা আরম্ভ করতে বলেছিল যে, হয়তো আপনারা শুনেছিলেন, —তার মা তৃষ্ণায় জল পায়নি, কলেরায় জল জল করে মারা গিয়েছে সেইজন্য সে একটা পুকুর কাটাবার কল্পনাই করেছিল সেটা যখন হলো না তখন এই ভাবেই মায়ের একটা স্মৃতিচিহ্ন রাখতে চাইছে। এটার খরচ তারই, তবে উপকার হবে হাটের, আর সে হাটের মালিক আপনারা। সেভাবে ত্রৈলোক্য কিন্তু বললে না,—সে প্রণাম করে গিয়ে বড়বাবুর কাছে দাঁড়াতেই বড়বাবু যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি খবর ত্রৈলোক্য ? ত্রৈলোক্য বললে,—আজ্ঞে,—হাটে সবার ভারি উপকার হবে আর গরমের দিনে জলকষ্ট বোলেই পাঁচি টিউবওয়েল একটা করাতে

চায়। আপনাদের জমিতেই তো হবে তাই আমায় পাঠালে। আপনাদের হুকুম ছাড়া তো হতে পারবে না।

বড়বাবু মেজবাবুর দিকে চাইলেন—মেজবাবু তখন বললেন,—হুকুম—কিসের হুকুম? ত্রৈলোক্য বললে,—একটা জায়গায় তো ওটা হবে,—আপনারা যদি দয়া করে একটু স্থান দেন তাহলে ওটা হয়। মেজবাবু বললেন, তাই বলো জায়গা চাই,—তা, দাম দিতেই হবে। এখন ত্রৈলোক্যের মনে পড়লো,—ঠিক এই কথার পর কোন কথাটা বলতে হবে, আর ভুল না করে এবার সে ঠিক ঠিক বলতে লাগলো। পাঁচি বলে আপনারা জমিদার,—আপনাদেরই হাট, আমরা হাটের প্রজা মাত্র, আমরা ঘর জমির খাজনা তো দিয়েই আসছি। আর সামান্য এক আধ ছটাক জায়গায় তো ওটা হবে—ওটা আপনারাই, টিউবওয়েলের মত একটা সৎকর্মের জন্য দান করে দিন, এইটাই চাইছে পাঁচি। কোন কথাই আর বড়বাবু বললেন না; মেজবাবুর মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল তিনিও কিছু বললেন না,—ছোটবাবু বললে এবার, কেন পুকুর-প্রতিষ্ঠা করলে তো অনেক টাকায় জায়গা কিনতে হতো,—সেই টাকাটা না হয় এই জমিতে দিলে। ত্রৈলোক্য বললে,—সেটা করতো দায়ে পড়ে, পুকুর কাটতে গেলে কিনতেই হতো, যার নিজের জায়গা নেই। কিন্তু তা তো হলো না, তাতে বেশী টাকার দরকার বোলেই তো হলো না। এখন যেটা হচ্ছে—সেটায় অতি সামান্য জায়গারই দরকার, নাম মাত্র জায়গা। আর সেটা এমনই জায়গায় হচ্ছে—আশপাশে কারো জায়গাই নেই সবটাই আপনাদের। সত্য বলতে কি, হাটের উপর এই কলটায় সর্বসাধারণের উপকার, বিশেষতঃ বাবুদের নিজেদের পক্ষেই বেশী উপকার। সকল মহাজন, স্থায়ী বাজারের দোকানদার, হাটবারে হাটের ফড়ে, খদ্দের সবারই জন্যে এটা বাবুদেরই করে দেবার কথা। যাই হোক সবাই বাবুদেরই নাম করবে, এই সৎ কর্মে ঐ জায়গাটুকু দিলে। শেষে বললে,—যখন কলটা হবে পাঁচি একটা পাথরের লেখা মেরে দেবে তার মায়ের স্মৃতিচিহ্ন বোলে আর তাইতে আপনাদের জমি দানের কথাও থাকবে।—এটা ঝোঁকের মাথায় বলে ফেললে, পাঁচির এ আদেশ ছিল না। মেজবাবুর টাকার উপর দমটা সবার চেয়ে বেশী, সে বলে কি, আমরা তাকে ঐ জায়গায় টিউবওয়েল করবার অধিকার দেবো, তার একটা দাম নেই, সে আবার তাতে শ্বেত-পাথরের ট্যাবলেট মারবে, নিজের নাম জাহির করতে, তার দাম নেই?—এইবার ত্রৈলোক্য শেষ কথাটা বোলে দিলে বড়বাবুর দিকে চেয়ে, যদিও মেজবাবুর কথার উত্তরেই সেটা বললে,—ঐ এক ছটাক জায়গার দাম আর কতটুকু বাবু,—ঐ দাম দিয়ে যদি কিনতে হয় তাতে কি আপনাদের ইজ্জৎ বাড়বে, সবাই বলবে বাবুদের কি এমনই অবস্থা হয়েছে,—

বড়বাবু চলে যাবেন বলে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, এখন তার কথায় বাধা দিয়ে বললেন,—সে কি চায়—লেখা অনুমতি? ত্রৈলোক্য বললে, লেখা অনুমতি দিলেই ভাল হয়, সে পাথরেও সেটা উল্লেখ করবে কিনা। বড়বাবু বললেন, আচ্ছা আচ্ছা, কাল বিকালে এসে ঐ লেখা নিয়ে যেও,—আমরা তিনজনেই তাতে সই দেবো আর পাঁচিকে বলো, ওটা যেভাবে রেজেস্ট্রী করবারও দরকার আমরাই করিয়ে দেবো।

ত্রৈলোক্য একটা ব্যাপারে আশ্চর্য হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এই ভেবে অনুতাপ এলো তার মনে,—হায় হায়,—আমরা কত ছোট মন নিয়েই ঘর করি। এত দেখার পর মনে হলো পাঁচি নিশ্চয়ই মা জগদম্বার বর পেয়েছে, না হলে আগে থেকে যা যা হবে ও জানবে কেমন করে?—তার শ্রদ্ধা বেড়ে তো গেলই—এ কথাটাও মনে হলো, বাগদী কাওরা ছোট জাতের মানুষ, এ কথায় কি কোনো মানে আছে—

এইভাবে অনুমতি পাওয়া গেল। তার মায়ের নাম ছিল ভবি, ভাল নাম ভবতারিণী। তারই নামে এটা উৎসর্গ, তার উপরে বড় অক্ষরে লেখা,—মায়ের স্মৃতি।

ইতিমধ্যে সেই শ্বেতপাথর ফলক তৈরি হয়ে এলো।

অনুমতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ আরম্ভ করে দিলে, পাঁচি একটুও দেরি করলে না। তবে দুঃখের কথা এই, তার বড় সাধের পুকুর-প্রতিষ্ঠা হলো না, এটা তার প্রাণে বেজেছিল। পুকুরের বদলে প্রতিষ্ঠা হলো কিনা একটা টিউবওয়েল, প্রায় পাঁচশত ফিট নিচে পাম্পটা বসানো হলো জমি থেকে আট ফুট উপরে আর তার পাশে একটা বড় চৌবাচ্চা হলো তাতে চারিটি কল লাগানো। যাতে ঐ বড় ট্যাঙ্ক ভরা থাকলে সবাই সহজে জল নিতে পারে। দুজন লোক দুবেলা কাজ করে ঐ ট্যাঙ্ক ভরাবে, তার খরচা পাঁচির। কাজটা ভাল হয়েছিল, সবাই একথা বলেছিল যখন উৎকৃষ্ট বালি এবং জল পাওয়া গেল! মিস্ত্রীরা সবাই তো বটেই গ্রাম-সুদ্ধ তাকে ধন্য ধন্য করলে,—বললে,—পাঁচি ভগবতী,—এ তল্লাটে এমন জল নেই, ভোগবতীর পবিত্র জল, এটা একবারেই পাতাল থেকেই আসছে।

এখন পুরুতমশাই একবার দেখতে এলেন। ঠাকুরমশাই বিস্ফারিত চক্ষে জলটানাটা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলেন, সবার আনন্দ ও উৎসাহটাও দেখলেন, সবার মুখে মেয়েটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও শুনলেন। পাঁচিও সেখানে জল টানা দেখছিল। তার প্রাণে আনন্দ কম ছিল না কিন্তু পুকুর কাটা হলো না এর জন্য কেমন যেন একটু বিরস ভাবও ছিল তার মধ্যে। এখন পুরুত-মশাই, কাঁসার মত খনখনে কণ্ঠস্বরে, যেন অসহ্য হয়েই রেগে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ,—এতে কি উপকার হলো,—ছত্রিশ জাতে ঐ হাতলটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জল বার করবে, আর ভিতরের ঐ চামড়া ধুয়ে ধুয়ে জল বেরোচ্চে—এতে কি ওর ভাল হবে? এই কথা শুনে পাঁচি তাড়াতাড়ি চলে গেল ঘরের দিকে।

সেখানে প্রজারা অনেকগুলি ছিল, তারা আগাগোড়া সব কিছুই জানতো এর ইতিহাস,—এখন একজন তাদের মধ্যে বলে উঠলো,—পাঁচি যে বলছিল আপনাকে দিয়েই এটা পিতিষ্ঠে করাবে ঠাকুরমশাই, বলছিল হাজার টাকা খরচ করবে পাঁচশো টাকা দক্ষিণেই দেবে। তারপর আপনি মন্তর পড়ে দিলেও শুদ্ধ হবে না জল?

আর একটিও কথা না বোলেই তিনি তার দিকে এক অদ্ভুত দৃষ্টি চাইতে চাইতে উঠলেন পথে।

যাই হোক তার এখানকার কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাবুদের ঘরে

বড় অশুভ ঘটনা ঘটে গেল। পাঁচির টিউবওয়েল যেদিন শেষ হলো সেইদিন হঠাৎ সকালেই বড়বাবু হৃদরোগে মারা গেলেন। যাবার আগে পাঁচি এই আঘাতটি পেলে। গোপনে সে চক্ষের জল ফেলে ছিল, তার সেই প্রথম দিনের কথা, যখন সে বাবুদের বাড়ির কাজে লাগলো সেইদিন থেকে তিনিই পাঁচিকে ওখানকার সকল আপদ থেকেই রক্ষা করে এসেছেন। এইজন্য পাঁচির শ্রদ্ধার সীমা ছিল না।

ছেলেবেলা থেকে তার ছোট্ট শাক-সবজির ক্ষেত, তার পেঁপে গাছ, কলাগাছ—হাঁসের পাল,—তার পাঁচটা গাই গরু, বাছুর, হেলে গরু দিয়ে দিলে সবকিছু তার জেঠা ও খুড়োকে। তার ভাই মুড়োর কাপড়ের দোকানখানি ত্রৈলোক্যের ছেলে গোকুলকে দিলে, অবশ্য তার লাভের অংশ বাড়িয়ে চালাবার ভার ছিল। ত্রৈলোক্য দেখবে-শুনবে, যেমন চলছিল ঠিক তেমনি চলবে! দোকানখানার ব্যবস্থা করে তার সেখানকার চালের কারবারের যতটা পারলে বাকি-বকেয়া আদায় করে, তার মূলধন যতটা বেশী সম্ভব আগে থেকেই ক্রমে ক্রমে উঠিয়েই নিয়েছিল।

যাত্রার আগের দিন ছোট বৌয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেল। সে সময় বুঝেই গিয়েছিল,—ছোটবৌ তাকে নিয়ে একেবারেই নিজের ঘরে ঢুকে দরজায় খিল লাগিয়ে দিলে। তারপর তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললে,—কেন তুই এতদিন আসিস নি বল,—তার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল ঝরছিল।

বল তোকে কে কি বলেছে?

কান্না পাঁচিরও অনেক জমা ছিল,—সে বেশী কিছু বলতে পারলে না, বেশী কথা সে মোটেই বললে না। কেবল শেষে পায়ের ধুলো নিয়ে বললে,—আশীর্বাদ করো যেন আর এখানে আসতে না হয়।

পাঁচি চলে গেল, ছোটবৌ কাঁদতে বসলো। বড়বৌ এলো, জিজ্ঞাসা করলে—একি তুই কাঁদতে বসলি কেন? ছোটবৌ বললে, দিদি, বাপ নেই মা নেই এখানে কেউ সহায় নেই, আপনজন বলতে মেয়েটার কেউ নেই বোলেই মেয়েটা চলে গেল। এখানে তাকে কেউ বুঝলে না, তাইতো ও গেল, দিদি! বড় বউ বলে, আমোলো! বাগদীর মেয়েটার জন্যে তুই কেঁদে মরছিস? তোর সবই ছিষ্টিছাড়া কাণ্ড! ওমা,—ও একটা ভ্রষ্টা ছোট জাতের মেয়ে; ওর রূপ আছে যৌবন আছে—যেখানে ওর ব্যবসা ভাল চলবে ও সেইখানে গেল,—তা তুই ওর জন্যে কেঁদে মরিস কেন? ও ভাল হলে কখনও এমন ভাল জায়গা ছেড়ে যেতে পারতো?

* * * *

মুড়ো বাগদীর ছেলে বটে কিন্তু তার গুণও বড় কম নয়। কি জানি ছেলেবেলা থেকেই তার একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল, যে-জাতেই জন্ম হোক না কেন ইচ্ছা করলে সবাই লেখাপড়া শিখতে, বড় বিদ্বান হতে পারে; ভদ্র আর ইতর বা মানুষ বড়ো ছোট তা তো নিজের দোষে আর গুণেই হয়—তার জন্মের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই। কেবল পয়সা রোজগারটা ভাগ্যের কথা সেটা মা লক্ষ্মীর দয়া না থাকলে হবার জো নেই।

মুড়ো তার ছোট ভগিনীর মনের কথা ভালই জানতো, তার মধ্যে একটা আক্ষেপ ছিল নিজের লেখাপড়া তো হলো না, ছোট বোনটির লেখাপড়া করবার এতটা সাধ সে কেমন করে পূর্ণ হবে তাই ভাবতো। এটা তার গুহ্য কথা। মুড়ো বুঝতো কলকাতায় না গেলে পাঁচির লেখাপড়া শেখার সুবিধা হবে না, সেই জন্যই সেও যত শীঘ্র সম্ভব পাঁচির পোলের হাট ছাড়বার চেষ্টায় সাহায্য বড় কম করেনি। ইতিমধ্যে কাপড়ের কারবারে সে ব্যবসার মূল কথাটা বেশ বুঝে নিয়েছিল। সহজ সরল বুদ্ধি ছিল তার, গোলমালের মধ্যে তার মাথা খেলতো না। তার কাছে গোপনীয় বোলেও কিছু ছিল না। যাই হোক, এখন পাঁচি তাকে কিছু না বললেও, কিসে সে তার লেখাপড়ার সুযোগটা করে দিতে পারে সেইটিই হয়েছিল তার প্রাণের কথা।

সে যে মারের ভয়ে লেখাপড়া শিখতে পারেনি একথা তার মনে বরাবর কাঁটার মত খচ্‌খচ্‌ করে বিঁধতো। কিন্তু তার কাপড়ের কাজটা আরম্ভের আগে থেকেই পাঁচি ত্রৈলোক্য জেঠাকে লাগিয়েছিল, মুড়োকে ভাল করে শুভঙ্করী আর পাটিগণিতটি তার সাধ্যমত শেখাতে হবে। তার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত নয়, পাঁচি নিজে দেখে শুনে পরীক্ষা করে যখন বুঝলে যে ভাইটি তার অঙ্কে বেশ দড়ো হয়েছে, সে বেশ জমা খরচের ব্যাপারটা ধরতে আর আয়ত্ত করতে পেরেছে তখনই কাপড়ের কাজ আরম্ভ করে দিলে। কাজেই মুড়োর সাহিত্য পড়া হলো না বটে কিন্তু অংক তার যতটা চাই ততটাই লাভ হয়েছিল। বেশ ভাল রকমই হয়েছিল, সেটা পাঁচি জানতো।

মুড়ো আর ত্রৈলোক্যের সাহায্যে সে প্রথমেই চেতলা অঞ্চলে, আদি গঙ্গার ধারেই একখানা একতলা বাড়ি ভাড়া নিয়ে কিছু কিছু জিনিষ চালান করে দিলে। তারপর সে একবার কালী-দর্শনে গেল। গিয়ে বাড়িখানা নিজে একবার দেখে এলো। পছন্দসই বাড়ি বটে দক্ষিণ আর পূর্বদিক খোলা, পূর্বদিকে একটা মাঠ আছে। ত্রৈলোক্যকে খোঁজ-খবর নিতে বোলে সেবার সে ফিরে এলো পোলের হাটে। তারপর দিনক্ষণ না দেখে, প্রাচীন প্রথা না মেনে হঠাৎ সকালে তার জেঠী আর জেঠা ঈশ্বরকে জানিয়ে দিলে—আমরা চললাম।

কখনও কখনও আসবি ত? জিজ্ঞাসার উত্তরে সে বললে, জেঠা আশীর্বাদ কর্‌রো যেন আর এখানে আসতে না হয়। সরল ঈশ্বর ভাবলে, মেয়েটা পাঁচ জনের মত নয় বোলেই এতো দুঃখ পেয়েছে, পাবেও বোধহয়। জেঠী একবার জিজ্ঞাসা করেছিল, হারে পাঁচি, বিয়ে করবিনি, সংসার-ধর্ম করবিনি? পাঁচি বললে, এতটা ধর্ম তোমরা তো করেছ, আমি বিয়ে না করেই যদি তার ফল পাই তো সে মন্দ কি?—তার জেঠী বুঝলে না কথাটা, বললে, কি যে বলিস তুই, সময়ের যা তাইতো করতে হবে?

পাঁচি কলকাতায় এলো—।

আসবার একমাস পরেই পাশের ছোট মাঠটা একদিকে চালের আড়ত অপর দিকে উঁচু চালা করে একটা বড় দোকানে রূপান্তরিত করে ফেললে। কাপড়ের কাজটা হলো মুড়োর, এখানে মুড়োকে ঐ নিয়েই তার অবস্থার উন্নতি করতে হবে। এখানকার আড়তদার হলো গোপাল ভদ্র বোলে একজন দক্ষ লোক,

ত্রৈলোক্যেরই পরিচিত। চারটি ডোঙায় তাদের চাল আসে মোকাম থেকে। আর পোলের হাটের কেনা-বেচা যা রেলীর সঙ্গে চলছিল সে কারবার ত্রৈলোক্যের হাতে রইলো, শনি ও মঙ্গলবারে সে এসে পাঁচিকে হিসাব-নিকাশ আর টাকা-কড়ি বুঝিয়ে দিয়ে যায়।

কিছুদিন পর পর পাঁচি মুড়োকে বললে, দাদা তুমি কিছু কিছু টাকা নিজের নামে জমাও না। মুড়ো বলে, তুই আমায় তাড়িয়ে দিবি নাকি? তোর মতলব কি? পাঁচি বলে কি, দাদা এত দিন তো কাপড়ের দোকান করলে, পাশাপাশি আমার চালের কারবারও দেখলে, হাতে থোকথাক টাকার সঞ্চয় কতটা দরকার তা বুঝলে না,—এতে তোমাতে আমাতে ছাড়াছাড়ির ব্যাপার কেনই বা কল্পনা করলে বলো তো?

মুড়ো বলে, আমার ভাগে জমানো একটা থোক, তোর ভাগে জমানো একটা থোক আমি ভাল বুঝি না। কেন সব তোরই থাকুক না। পাঁচি বুঝলে ও যখন সহজে বুঝবে না তখন ওকে একটু খুলে দেখাতেই হবে আর এইটাই ঠিক সময়। এই ভেবে সে বললে, শোনো আসল কথাটা। চালের টাকা কাপড়ের মধ্যে যাবে কেন, আর কাপড়ের টাকাই বা চালের মধ্যে আসবে কেন,—দুটো কাজের দুটো পুঁজি ভাল নয়? তবুও মুড়ো তার বুদ্ধি মতই বলে, আসলে সবই তো তোরই টাকা, আমার টাকা কোথা? এইবার পাঁচি তার চক্ষুদানের প্রয়োজনীয়তা বুঝলে এবং মুড়োকেও তখন খুলে বুঝিয়ে দিলে—যে, তোমার নগদ পয়সা নাইবা থাকলো, তুমি যখন আমার সঙ্গে সমানে পরিশ্রম করেছো গোড়া থেকে তখনই একেবারে বিধিবদ্ধ নিয়মেই আধা-আধির সমান অংশীদার হয়েই আছ। তুমি জানতে না কারণ মনটা জানবার দিকে দাওনি। কারবার সংক্রান্ত এই নিয়মের কথাই আমি জানি কারণ আমি কারবার করছি। এখন আর ওসব কথা তুমি বলো না। তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধের কোন ব্যতিক্রম ঘটবে না, তুমি তোমার অংশ বোলে দাবী করলে। দাবী তুমি করোনি কখনই আর করবে না বোলেই জানি, তাই আরও আমি তোমার অংশে আজ পর্যন্ত সব হিসাবই রেখেছি—বুঝে নিয়ে আজ আমায় মুক্তি দাও।

পাঁচি বুঝিয়ে দিলে—তোমার ভাগে যে টাকাটা জমা আছে চলতি কারবার ছাড়া, সেটা তোমায় শুনিয়ে দিচ্ছি।

পাঁচি তার সেই মিশমিশে কালো মলাটের মোটা বইখানি এনে আজ এই তেরো বৎসরের সম্পূর্ণ হিসাব দেখালে,—কাপড়ের দোকানের যা কিছু। তারপর দুধের হিসাব। সব কিছু নিখুঁতভাবে পাঁচি মুড়োকে বুঝিয়ে দিলে। মুড়োর আয় এখন যা জমা হয়েছে তা প্রায় সাতটি হাজার টাকা। এখন থেকে সেটা তাকেই রাখতে হবে। মুড়ো বলে কি, পাঁচি! টাকায় মাতাল করে বটে রে—আমার গা পা টলচে,—তুই আমায় কি করে দিলি। নেশা হয়ে গেল যে। বেশ ছিলাম সবই তোর টাকা জেনে—একটা শান্তি ছিল! এ আবার কি নেশা ঢুকিয়ে দিলি, বলতো?

উক্ত ঘটনার কয়েক দিন পরেই মুড়োর একটু অবস্থান্তর দেখা গেল। ছটফটানিটা একটু যেন বেড়েই গেল। সবাই দেখে সে কেবলই চুপচাপ থাকে,

কারো সঙ্গে বড় একটা কথা কয় না। কিন্তু নিজ আসনে স্থির হয়ে থাকতেও পারে না,—দোকান থেকে তিন চার ঘণ্টা অনুপস্থিত ; আবার এসে বসলো খাওয়া-দাওয়ার ব্যতিক্রম বড় একটা তার দেখা যেতো না ; তবে পাঁচির সঙ্গে বেশী কথা কইতো না। মায়ের মতই পাঁচির প্রাণ ছটফট করে, ভাবে, এ আবার কি হলো ;—হে মা কালী—ভাইটিকে আমার ভালো করে দাও। আবার সে ভাবে হয়তো ঐ পয়সাকড়ির ব্যাপারে তার মনে বড়ই লেগেছে। দায়িত্ব তো কম নয়। আবার ভাবে ঝোঁকের মাথায় একটা কিছু করে ফেলবার মত তার বুদ্ধি নয়। এইসব সাত পাঁচ ভাবে। বড়ই উদ্বেগে দিন কাটছিল তার। যাই হোক এইভাবে পাঁচ ছয় দিন কাটাবার পর,—একদিন সে বিকালে একজন ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ঢুকলো। নীচের ঘরে তাঁকে বসিয়ে উপরে পাঁচিকে খবর দিতে গেল, সিঁড়ি থেকেই এই বলতে গেল, ওরে পাঁচি! ভাগ্যক্রমেই এমন লোক পাওয়া গেছে তুই একবার গিয়ে কথাবার্তা কয়ে দেখ, তারপর আমায় বলবি।

যে লোকটি এসেছিলেন, প্রৌঢ় বয়স্ক, পয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে বয়স, সাধুদের মত বড় বড় চুল, কাঁচা-পাকা দাড়ি গোঁফ ; কিন্তু ভ্রূ যুগল ঘন আর কুচকুচে কালো আর তার নীচে উজ্জ্বল দু'টি চক্ষু। হৃষ্টপুষ্ট শরীর তাতে এখনও বোধহয় জোয়ান বয়সের শক্তি। প্রথম দৃষ্টিতেই তাকে বিচক্ষণ মনে হয়। নামটি তার গোলকবন্ধু বিশ্বাস বি.এ. ; ভবানীপুরে কোন হাই স্কুলের শিক্ষক। ধীরে ধীরে আর মৃদুস্বরে কথা কওয়াই তাঁর অভ্যাস। পাঁচিরও গলার স্বর ছিল মৃদু। সে যখন এসে দাঁড়ালো প্রথমে আগন্তুকের মূর্তি দেখেই সে কেমন একটা শ্রদ্ধা অনুভব করলে তারপর জোড় হাত করে নমস্কার করলে ; গোলকবন্ধুও পাঁচিকে দেখে কেমন একটা সশ্রদ্ধ স্নেহ অনুভব করে প্রতি নমস্কার করলেন। এরপর গোলকবন্ধুই কথা আরম্ভ করলেন এই বোলে, —হাঁ গো মা, তুমি নাকি এখন কিছু লেখাপড়া করতে চাও? তোমার দাদার কাছেই শুনেছি, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

পাঁচি অবশ্য তার কথার উত্তর দিলে, আর যথাযথই দিলে ;—কিন্তু পাঁচির সঙ্গে যে সকল কথা হলো, কথায় এখন আমাদের বিশেষ দরকার নেই। কারণ তার শিক্ষা-প্রসঙ্গে নিজের কথা, তবে তার মধ্যে বিশেষ কথা যেটুকু, জেনে রাখা ভালো।

ইতিমধ্যে কলকাতায় অর্থাৎ চেতলায়—আসবার পর পাঁচির প্রকৃতির একটু ইতর বিশেষ হয়েছিল ;—কারো সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ হলে অথবা কেউ তার নাম জিজ্ঞাসা করলেই নাম বলবার সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজেই, আমরা বাগদী, অত্যন্ত সহজভাবেই এই পরিচয় দিয়ে বসতো। তার পরেই আবার সেও, আপনারা? বোলেই প্রশ্ন করে উত্তরের অপেক্ষায় তার মুখের দিকে এমনভাবে চেয়ে থাকতো তাতে উত্তরদাতাকে বিলক্ষণ একটু অস্বস্তি ভোগ করতে হতো। এখানেও সে গোলকবন্ধুর কাছেও তাই করে যখন, আপনারা? বোলে তাঁর মুখের দিকে চাইলে তখনই ইনি বুঝলেন যে,—এই মেয়েটি জাতি নিয়েই কোথাও বেশ একটা দাগা পেয়েছে তাহাতেই বিচিত্র এই অভ্যাসটি তার

হয়ে থাকবে। গোলকবন্ধুরও জানা ছিল তার অনেক স্বজাতি কলকাতায় এসে অনেক জায়গায় নিজেদের উচ্চ জাতি উঁচু বংশের বোলে পরিচয় দিয়ে গৌরবান্বিত মনে করে থাকে,—তবে তাকে কখনও সে কাজ করতে হয়নি কারণ, ঠিক সেইভাবে তাকে ঠিক জাতি নিয়ে কেউ কখনও সোজা প্রশ্নই করেনি। এখন এই মেয়েটি কিন্তু এমনভাবে নিঃসংকোচে প্রশ্নটা করলে তাতে তাঁকে উত্তরটাও সে রকম ভাবেই দিতে হলো। গোলক বললেন,—জাতিতে আমরা কৈবর্ত, ইদানীং মাহিষ্য বোলেই পরিচয় দেওয়ার রীতি হয়েছে। কেন মা, জাতি নিয়ে তুমি এতটা উতলা হয়েছো বলতো?

তার কথাগুলি এমনই স্নেহাসিক্ত এবং মিষ্ট, পাঁচি মনে করলে যেন এবার সে যথার্থই নিজের লোক, যাকে আপনজন মনে করতে পারে এমনই এক আত্মীয়কে পেয়ে গেল। কারণ সে জানতো তার ত্রৈলোক্য জেঠাও জাতিতে কৈবর্ত, তবে তারা বাগদীর চেয়ে উঁচু জাত একথাও জানাতো। বিদেশে, অপরিচিত ভূমিতে বাঙালী একজনের দ্বিতীয় বাঙালী দেখলে যেমন মনে হয় পাঁচির তাই হলো। সে একটু স্নেহের পরশ পেয়েই একেবারে মনের সকল কথা উজাড় করে দিলে গোলকবন্ধুর কানের ভিতর দিয়ে তার অন্তঃকরণের মধ্যে। সেই শিশুকালে মায়ের কলেরায় মৃত্যু, তৃষ্ণায় জল জল করে ছাতি ফেটে মারা গিয়েছে কেউ জল দেয়নি। তারপর তার বাবার মৃত্যু সর্পাঘাতে, স্বচক্ষে সে দেখেছে। তারপর দিদিমার কাছে মানুষ হওয়া, সেখানে স্কুলে যাওয়া, তার লেখাপড়া শেখার প্রবল ইচ্ছা থাকলেও তার জেঠা তাকে রাখেনি সেখানে,—নিজ গাঁয়ে এনে কাজে লাগিয়েছে। সেই থেকে পয়সা কেমন করে হয়, কি ভাবে ধনসঞ্চয় করা যায়, ভাইকে সহায় করে সেই চেষ্টাই করে এসেছে। গরমের দিনে গ্রামে কি ভয়ানক জলকষ্ট, কতদূর থেকে মেয়েরা জল এনে প্রাণ বাঁচায়,—আরও সেইজন্যই তার মায়ের নাম করে একটা পুকুর কাটাবে এই তার সাধ, সেই সাধ তার পূর্ণ হলো না, শেষে টিউবওয়েল করে দিয়ে তা শেষ করতে হলো। তার কারণ যা যা ঘটেছিল খুঁটিয়ে বলে দিলে। জমিদার বাড়ির পুরোহিতের ফর্দ, দুই হাজার টাকা দিয়ে এক ব্রাহ্মণকে দানের কথা, কারণ বাগদীর পুকুর বোলে ব্রাহ্মণ ছোঁবে না তার জল ইত্যাদি। শেষে টিউবওয়েলেই সংকল্পের পরিসমাপ্তি করে কলকাতায় আসা পর্যন্ত সকল কথাই বোলে ফেললে। কেবল ছোটবাবুর প্ররোচনায় হামিদালী মিঞার সেই ভয়ংকর অত্যাচারের কথাটা বলতে পারলে না।

এই বর্ণনা-প্রসঙ্গে গোলকবন্ধু আর একটা মহত্বের পরিচয় পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল যে, এই বাগদীর মেয়ের গ্রামের প্রজাদের ঘরে—মেয়েদের এতটা দুঃখ, গ্রামের ছেলেদের এতটা জড়তা, আর পাঠশালায় লেখাপড়ার শেখার ব্যাপারে ছোট জাত বোলে এমন দুর্ব্যবহার আর গুরুমশাইয়ের কি ভয়ানক প্রহার-প্রীতির কথা বলতে,—তার চক্ষে জল এসে গেল,—আমার ভাইটি, একটু মুখচোরা কিন্তু বোকা মোটেই নয়, তাকে দুমাস ধরে, এমন মেরেছে যে, শেষে জ্বর গায়ে ঘরে এলো সে, লেখাপড়ার নামে ভয়েতে আর পাঠশালে গেল না। কৈ, মামার বাড়িতে খ্রীস্টানী পাঠশালে তো এমন মারে না, আমি দু' তিন বছর পড়েছিলাম

কখনও মারতে, কারো গায়ে কোন ছেলের গায়ে হাত দিতে দেখিনি। আমাদের গ্রামের সবই খারাপ হয়ে গিয়েছে, আর কিছু ভালো নেই ; প্রজাদের ঘরে ঘরে দুর্গতির সীমা নেই—তাই আমি থাকতে পারিনি।

যাই হোক সেদিন গোলকবন্ধুর এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা,—এমন অদ্ভুত মেয়ে তিনি আগে দেখেননি। তার মনের দুঃখের কাহিনী, বিশ বাইশ বৎসরের জীবন-কথা জানতে যখন আর কিছু অবশিষ্ট রইলো না তখন গোলক জিজ্ঞাসা করলেন, তা হলে এখন কি তুমি লেখাপড়া শিখে পাস-টাস্ করতে চাও ?

পাঁচি সোজা কথাটাই বললে, পাস করতে আমি চাই না কিন্তু মেয়েদের যতটা সম্ভব পাসের পড়া পড়তে চাই ;—আমি ইংরাজী ভাল করে শিখতে চাই, ভূগোল, ইতিহাস, আর আমাদের হিন্দুশাস্ত্র বিশেষ করেই আয়ত্ত করতে চাই, যাতে আমি এই ব্রাহ্মণাদি সকল জাতি কেমন করে হলো কতদিন আছে আর সমাজের এই ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে উদ্ধারের উপায় কি এই সবই যাতে ঠিক জানতে পারি ; তার উপায় আপনাকে করতেই হবে। না হলে আমার জন্ম ও জীবন বৃথা হবে। আমি আপনাকে পেয়েছি, মা কালী সদয়া হয়েই আপনাকে এনে দিয়েছেন, ঐ আপনাকে ধরেই আমি সব পাবো ; এই বিশ্বাস আমার হয়েছে। আপনি আমার বাবা। যখন তার তেরো বছর বয়স তখন সে ত্রৈলোক্য জেঠাকে পেয়েছিল এখন সে বাইস বছরে গোলকবন্ধুকে পেলে।

শেষে বললে, আমার ভাই কাপড়ের কাজ নিয়ে আছে, আর আমার ধান-চালের কাজ,—আমি সে সব দেখবার সময় ঠিক করে নিয়েছি। এখন রোজ সাত আট ঘণ্টা আমি লেখাপড়ায় সময় দিতে পারবো ; আপনি সকল কিছুই ঠিক করে দিন।

মুড়ো এই যে গোলকবন্ধুকে পেয়েছিল, এর মধ্যে একটু বেশ রহস্য আছে। তার আগে মুড়োর দৈনন্দিন কর্ম পদ্ধতির কথা অর্থাৎ দেশ থেকে চেতলায় আসা এবং স্থায়িভাবে বসে যাবার পর তার সহজ কর্ম জীবনের কথা—

প্রতিদিন সকালে দোকানের চাবিতালা খোলা থেকে মুড়ো হাজির থাকতো প্রায় এগারোটা পর্যন্ত, এর মধ্যে পাশেই তাদের চালের আড়তে তার আসা-যাওয়া অনেক বারই ঘটতো। এগারোটার পর দোকান থেকে কাছেই গঙ্গায় স্নান করে বাড়িতে এসে খাওয়ার পর দোকানে এসে বসতো, তখন কর্মচারী দুজন খেতে যেতো। তারপর ঘড়িতে চারটে বাজলে বাড়িতে গিয়ে কিছু খাবার খেতো। সে কলকাতার খাবার পছন্দ করতো না,—মুড়ি নারকেল, বড় জোর মুড়িতে তেল নুন, লঙ্কার ব্যঞ্জনা, না হয় দুধ দিয়ে চিঁড়ে নুতনগুড়, বড়া, চাপড়া, তাদের দেশ ঘরের যা কিছু এই সবই তার খাওয়া ছিল। তারপর সে পাঁচির কাছে একটু বেড়িয়ে আসি, বোলে একটা শার্ট পরে বেরিয়ে যেতো। সন্ধ্যার পরেই ফিরে আবার দোকানে বসতো রাত নটার পর দোকান বন্ধ করে একেবারেই বাড়ি ফিরতো এবং চাবির থোলেটা পাঁচিকে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনেই ভোজনে বসতো। দুজনেই এক সঙ্গে খেতো, আর সেই সময়ে যতো ফালতু কথা। কাজের কথা প্রতি শনিবার, ত্রৈলোক্য আসতো সেদিন, একটু বেশীক্ষণ

কত কত কথা যে হতো তার হিসাব নেই। শনিবার রাতটা থেকে রবিবার সব হিসাবপত্র টাকাকড়ি বুঝিয়ে দিয়ে বৈকালে ত্রৈলোক্য পোলের হাটের উদ্দেশ্যে চলে যেতো। এইভাবে তাদের কলকাতার জীবন সুখে ও শান্তিতে কাটছিল।

এর মধ্যেও মুড়ো পাঁচিকে একটু ভয় করে চলতো, বিশেষতঃ সেই হিসাব-নিকাশের পর থেকে তার শ্রদ্ধা যেমন বেড়ে গিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ের ভাবও কিন্তু ছিল, বিশেষতঃ কথা কইতে কইতে খাবার সময় পাঁচি মুড়োর মুখের দিকে এমন এক অদ্ভুতভাবে চেয়ে থাকতো তাইতেই এই ভয়টা তার একটু যেন শিকড় গাড়তে আরম্ভ করলে। মুড়ো জিজ্ঞাসা করতো, কি দেখছিস বলতো আমার মুখে? পাঁচি যা বলতো মুড়ো কিছুতেই তার তল পেতো না, কারণ হয়তো সে বললে, তোমার মধ্যে কতটা সম্ভাবনা আছে তাই দেখছি। মুড়ো পাঁচির সঙ্গগুণে খানিকটা বুদ্ধিমান তো হয়েছিলই, সে পাল্টা যদি জিজ্ঞাসা করতো,—কিসের সম্ভাবনা বলতো? পাঁচি বলতো, সব দিকেই। এটা মুড়ো কিছুতেই ধরতে পারতো না। তার ঐ ধাঁধার ভাব দেখে পাঁচি বলতো, হারা বাগদীর বেটা, ঈশ্বর বাগদীর ভাইপো কলকাতায় মদনবাবু হয়ে কতটা উঠতে পারবে তাই দেখছি গো দাদা।

যাই হোক এখন সেদিন বিকালে,—মুড়ো এসে পাঁচির কাছে খাবার চাইলে। পাঁচি তার খাবার বরাবরই ঠিক করেই রাখে,—তাকে কিছু না বলে এনে দেয় মাত্র। আজ দেখলে পাঁচি পেঁয়াজের ফুলুরী গরম গরম ও বেগুনী এক কাঁসিতে, মুড়ির সঙ্গে এনে দিয়ে বললে, খাও। কিন্তু দাদা খেয়েই চলে যেওনা যেন। ক্যানরে? বোলে সে আরম্ভ করে দিলে;—কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে পাঁচির মধ্যে যেন একটা কিছু রয়েছে। যাই হোক পাঁচি আর কিছু বললে না, যেন শুনতেই পায়নি অথবা বিশেষ কিছুই বলবার নেই এমন ভাবটা করে একটু তফাতেই রইলো—খাওয়া শেষ হবার অপেক্ষায়। মুড়োও আর কিছু না বলে খাওয়াটা শেষ করে নিলে। তারপর মাথার পিছন দিকে হাতটা মুছে বললে, যাই একটু ঘুরে আসি।

তখন পাঁচি বলে কি?—শোনো দাদা, একটা কথা আছে। মুড়ো ভাবলে দোকানের কোন কথা হবে হয়তো। সে তটস্থ হয়ে বললে, নেঃ কি বলবি বল, বোলে বেঞ্চির উপর বসলো। পাঁচি বললে, যাবে এখন, বোসো না একটু দাদা। শুনেই মুড়োর খটকা লাগলো, ভাবলে, ব্যাপারটা তো একটু গুরুতর রকমেরই দেখছি। না হলে এমন সময়ে বসতে বলে কেন? একটু ভয়ও হলো বোধহয় কিছু ভুলচুক বা কোন গোলযোগ কোথাও হয়ে থাকবে; মনে মনে ভাবতে লাগলো, সেটা কি হতে পারে?

হয়তো একটু সংকোচ ছিল পাঁচির মধ্যে, সেও এখন বুঝলে বেচারা বৃথা ভেবে কাহিল হচ্ছে।—এখন সে ধীরে ধীরে, অতীব কোমলকণ্ঠে কথাটা বোলেই ফেললে।—শোনো দাদা; এখন তোমায় কিছু লেখাপড়া শিখতে হবে।

তাই ভালো, তুই আমায় ভাবিয়ে তুলেছিলিস্ বোলে সে হেসেই খুন,—এই জন্যেই আমায় তোমার দরকার এখন?

হাঁ গো তাই,—আমার এই জন্যই দরকার, একটু লেখাপড়া তোমাকে

শিখতেই হবে। কলকাতায় এসেছ, অন্ততঃ বাঙলা লেখাপড়া তোমার শেখা দরকার। মুড়ো বলে,—তোরই দরকার তুই-ই শেখ, আমায় আবার টানিস কেন? আমার দ্বারা ও হবে না, এখন আর আমার মন নেই। পাঁচি বলে, দেখো দাদা,—আমি বেশ বুঝি তোমার কি হবে আর কি হবে না। হিসাবে যার মাথা এত পরিষ্কার ত্রৈলোক্য জেঠা বলে, যে তিন মাসে শুভঙ্করী, পাটি-গণিত শেষ করতে পারে,—সে সব পারে। তুমি আমায় বোকা বুঝিও না। ইংরেজী না শেখো বাঙলাই শেখো একটু। তোমায় পড়তেই হবে।

মুড়োর সংশয় লাগে, বলে আমি পারবো না,—নিতাই সেদিন বলছিল ইংরেজীর চেয়ে বাঙলা শক্ত। বাঙলায় অনেক ব্যাকরণের গোলমাল আছে।

তাতে তোমার কি, আমাদের নিজেদের ভাষা, কতো ভালো বই আছে, তুমি কতো বিষয় জানতে পারবে;—আমাদের বাঙলা ভাষা বড় বড় লোক সব্বাই বলে সারা ভারতের সেরা। তোমায় একটু মন দিতেই হবে দাদা, তোমায় শিখতেই হবে। মুড়ো তখন শেষ কথাটা বলে, লজ্জা করবে না? পাঁচি বলে, ঘরে দরজা দিয়ে ভিতরে লেখাপড়া করবে, কোন অসুবিধাই হবে না,—আমি সব ঠিক করে দেবো। দোহাই দাদা অমত কোরো না, দেখো না কি চমৎকার হবে। মুড়ো ভাবতে থাকে, কথা বলে না,—পাঁচি তখন বলে—তুমি আরম্ভ করে দাও, তিনটি মাস করে দেখো, মন না লাগে ছেড়ে দিও।

শেষে মুড়ো বলে যার ছেলেবেলায় হলো না, এখন আমার এই চব্বিশ বৎসর বয়সে হবে, কি করে বিশ্বাস করি।

দেখো দাদা এখন তুমি জানো ছেলেবেলায় যে তোমার হয়নি তা তোমার বুদ্ধির দোষে নয়, ঐ চামার গুরুমশাইয়ের দোষে, মারের ভয় না থাকলে তুমি ছাড়তে পাঠশালা? ওসব বলো না,—তুমি দ্বিতীয় ভাগ থেকে শুরু করো. আমি জানি তুমি খুব শীঘ্রই উঠে যাবে।

এখন মুড়ো কি একটা মনে মনে বুঝে বলে ফেললে,—আচ্ছা আমি পড়বো, কিন্তু আর কারো কাছে পড়বো না, তুই আমায় দ্বিতীয় ভাগ থেকে আরম্ভ করে দিবি,—রোজ সক্কালে উঠে নটা অবধি পড়বো। সাড়ে সাতটায় দোকানটা খুলে সব ঠিক চালু করে দিয়ে এসে নটা পর্যন্ত দরজা দিয়ে তোর কাছে পড়বো।

আনন্দে পাঁচি বললে, ভালো, আজ বুধবার, কাল থেকেই শুরু হবে, কেমন? পাঁচি কোথা থেকে শিখেছিল, বিদ্যারম্ভে গুরু শ্রেষ্ঠ,—সেই কথাটা বড়ই মধুরকণ্ঠে দাদাকে শুনিয়ে দিলে।

তুই আমার গুরু হলি, আজ বোলে নয়, গোড়া থেকেই তুই আমার গুরু হয়েই আছিস বোলে মুড়ো মহাউৎসাহে বেরিয়ে গেল।

সে বেরিয়ে পথে চলতে চলতেই ভাবতে লাগলো, আমাকে যে এতটা করলে মানুষ করবার জন্য, গোড়া থেকে লেগে আছে, আর লেখাপড়া শেখার জন্য, একজন ভাল লোক যোগাড় করে দিতে যদি না পারি তা হলে আমার বেঁচে লাভ কি? তিন চার দিন পরেই গোলকবন্ধুকে সে পেলে তার দোকানের পাটে বসে বসে। তিনি কাপড় কিনতে এসেছিলেন। পরিচয় হয়ে গেল,

তারপর তার বাড়ির ঠিকানা নিয়ে, পরদিন দেখা করে প্রয়োজনের কথা যথাসম্ভব সংক্ষেপে বলে তাকে এনে পাঁচির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে তবে তার শান্তি।

গ্রাম ছাড়বার পরও পাঁচির কথা গ্রামে কিছুদিন প্রবলভাবে চলেছিল। হঠাৎ বড়বাবু মারা গেলেন,—তাতে পাঁচি বুঝেছিল যে বাবুদের এবার পতনদশা আরম্ভ হলো। বড়বাবুর মৃত্যু তারপর শ্রাদ্ধশান্তি এই নিয়ে গেল কিছুদিন।

পাঁচির কলকাতায় চলে আসাটা প্রথমে বড় একটা কারো লক্ষ্যের বিষয় হয়নি। তারপর পাঁচির গ্রাম ত্যাগ নিয়ে পোলের হাট গ্রামে বেশ একটা সাড়া পড়ে গেল। যতদিন সে ছিল সেখানে ততদিন যারা তার পিছনেই লেগেছে,—তার কোন কাজ যারা ভাল বলে দেখেনি, তার কারবার, তার উন্নতি, নিজেকে সবার অগোচরে রেখে তার সকল কাজ সুসিদ্ধ করবার কৌশল, বিপন্নদের অতি গোপনে সাহায্য এসব কিছুই লক্ষ্য করেনি,—এখন তারাই ভেবে আকুল হলো ও কেন চলে গেল এমন সুখের স্থান নিজের জন্মভূমি ছেড়ে—নিশ্চয়ই এর পিছনে গূঢ় রহস্য আছে।

অবশ্য, যেমন সকল বিষয়েই হয়ে থাকে, পাঁচির কলকাতা আসা বা গ্রাম ত্যাগ নিয়েও দুটি দল হয়েছিল ; একদল, তার প্রধান হলো গ্রামের বড় ধার্মিক, শাস্ত্রজ্ঞ এবং সর্বজ্ঞ অম্বিকা ভট্টাচার্য, যিনি জমিদারবাড়ির পুরোহিত। অবশ্য তার সঙ্গে গ্রামের অলস অকর্মণ্য আকাট মূর্খ ব্রাহ্মণ-সন্তান কয়েকজন যাদের জ্বালায় পাঁচিকে শেষ দু'তিন বছর দিবারাত্র অত্যন্ত সাবধানে থাকতে হয়েছিল, আর গ্রাম ত্যাগের অন্যতম কারণও তারাই। অপরপক্ষে ত্রৈলোক্য কয়ালের দল, তার সহযোগী হাটের অনেক প্রজা এবং ফড়ে। এরা পাঁচির গুণগ্রাহী ভক্ত। আসলে মেয়েটি বাগদী হলে কি হয়, সে বেশ বড় একটি দলের নৈতিক অবলম্বন হয়ে পড়েছিল। পাঁচি ছিল তাদের অর্থনৈতিক সহায়, তারা সবাই পাঁচির কাছে উপকৃত। এদের প্রভাবেই ভট্টাচার্যের দল কাজে কিছুই করতে পারেনি,—তাই একথাও সত্য যে এদের শত্রুতা থেকে বাঁচতে একা পাঁচির চরিত্র বলই পর্যাপ্ত ছিল না।

পাঁচির টিউবওয়েল হলো, তখনও তারা তার স্থান ত্যাগের কথা জানে না, কারণ পোলের হাট থেকে গ্রাম খানিক তফাতে, মধ্যে সরকারী বড় রাস্তা তার দুই দিকে দুটি মাঠ মাত্র ব্যবধান। তারা আশ্চর্য হয়ে যখন শুনলে পাঁচি এখান থেকে কলকাতায় চলে গেল তখন দলের সবাই আশ্চর্য হয়ে বেশ ভাল করে অনুসন্ধান চালাতে লাগলো গোপনে গোপনে। প্রথমে ঈশ্বর বাগ্দীকে কাছারী বাড়িতে ডাকিয়ে,—সওয়াল হলো—পাঁচি কলকাতায় চলে গেল কেন ?

সে বলে, আমি কেমন করে জানবো বাবু, সে মেয়ে কি আমায় কোন কথা বলে বরং তার জেঠাই খুড়ী এদের সঙ্গে কথা বলে, আমার সঙ্গে কোন কথাই কয় না।

তুই বেটা জানিস, সে নষ্টা ছিল—বলছিস না, আমাদের কাছে। সাবধান ! কোন কথা ঢাকিসনি, বল খুলে সব কথা। এই পর্যন্ত শুনেই ঈশ্বর থরথর করে কাঁপতে লাগলো, তার মুখ গেল শুকিয়ে,—নষ্টা, কথাটা শুনেই ঈশ্বর

বুড়ো মনে ও শরীরে ধাক্কাটা সামলাতেই পারলে না ; ভাঙা ভাঙা গলায় বললে, ওকি বাবু, নষ্টা সে কেন হতে যাবে ? তার স্বভাব কে না জানে।

ঈশ্বরের গলা ভাঙা আওয়াজ, আর থরথর করে কাঁপুনি দেখেই তারা বিশেষতঃ পাকাবুদ্ধি মেজবাবু সিদ্ধান্ত করলে, ঠিক ধরা পড়েছে,—সে নিশ্চয়ই নষ্টা ছিল এ বেটাই ঠিক জানে। কিন্তু অনেক মার-ধর করেও ঈশ্বরের মুখ থেকে যখন কিছুই বার করা গেল না তখন ছোটবাবু বললেন,—ও বেটা পাকা চোর, মিথ্যাবাদী এখন ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির সেজেছেন। এক বাড়িতে ঘরে থাকিস তুই জানিস না কি, হারামজাদা আমরা কি কিছুই বুঝি না ? এইভাবে গেল দুচার দিন,—তারা কেউ বুঝলে না কেন পাঁচি কলকাতায় গেল।

ঐ গ্রামের অলস লোক-সমাজ, আমরা জানি কেন এতটা পাচির বিষয়ে অনুসন্ধানী হয়েছিল, পাঁচিও কতকটা আভাসে বুঝেছিল তাহার সহজ বুদ্ধি দিয়ে। বর্তমান অবস্থায় সে ছিল একটা অসাধারণ মানুষ। একে মেয়েমানুষ, বয়সের আকর্ষণও আছে, কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশী ছিল তার সাবধানী জীবন-যাপন প্রণালী। ছোট জাত তারা, অথচ সেই ছোটর সংকীর্ণতা নেই তার মধ্যে, সঙ্কোচের নামমাত্র নেই তার কোন ব্যবহারে। বড় জাতের সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে সব কাজ মোকাবেলা করে নিতে, নিজ সৎ উদ্দেশ্যের পিছনে সোজা চলতে সে স্বয়ংসিদ্ধা, এমনই যে চরিত্র এই গ্রামের এক বিস্ময়,—তাই এই অসাধারণ মেয়েটিকে শত্রুমিত্র যেই হোক কারো উপেক্ষা করবার যো ছিল না, করবে কে ?

যারা তার শত্রু তারাও সবাই সামনা-সামনি তার কাছে এলে নিজেদের ছোট মনে করে। কাজেই সেই গ্রামের সবার লক্ষ্যের বিষয় তো ছিলই সে।

পাঁচি নিজের মনে মনে জানতো তারা কি পদার্থ—তাদের যা উপজীবিকা। তাতে পাঁচির উপর কলঙ্ক আরোপ করবার লোভ সামলাবে কেমন করে ?—তাতেই যেন তাদের জীবন খানিকটা উন্নত মনে হয়, সুখময় উৎসাহ আসে ঐ কাজে। মিত্র ভাবের যখন সম্ভাবনা নেই, কারণ তাদের বিরুদ্ধ প্রকৃতি, অথচ তাকে উপেক্ষাও করা যাবে না, তখন শত্রুভাবের মধ্যে দিয়েই সম্বন্ধের সার্থকতা বজায় রাখাই যে প্রাকৃতিক নিয়ম। পাঁচি জানতো এটা তাদের ভাত হজমের বৃত্তি। তাদের মধ্যে সে যুক্তিটা প্রবল ছিল তা এই যে, ও এত বয়স অবধি বিয়ে করেনি কেন ? তারপর বনমালী বাগদীর ছেলেকে কেন বিয়ে করলে না ? অথচ তারা একথাও জানে যে সে চুরি অপরাধে দুবার শ্রীঘরে বাস করে এসেছে। তারপর সে ছিল দুর্দান্ত মাতাল আর অত্যাচারী—বাবুদের আশ্রিত এবং দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় তাঁদের হাতের যন্ত্র। তাই পাঁচি যখন তাকে বিয়ে করবে না বললে তখন বাবুদের সেটা ভাল লাগবার কথা নয় যেহেতু বাগদীর ঘরের মেয়ের আবার অত বিচার কেন ? নিশ্চয়ই এ তার চরিত্র দোষেরই প্রমাণ। এখন পাঁচির গ্রাম ত্যাগের পর এদেরই একটা ভয়ানক মাথা ব্যথার বিষয় হলো যে, সে গ্রাম ত্যাগ করলো কেন ? এমন সুখের পোলের হাট, যেখানে তার এতটা উন্নতি, এতটা ধন লাভ ও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, এমন সুখের স্থান সে কেন ত্যাগ করলে ?

ভট্টাচার্য তো দার্শনিক পণ্ডিত, তার যুক্তি অকাট্য—প্রথম দফায় তার আবিষ্কার এই হলো,—যৌবনে যে মেয়ে বিয়ে করতে চায় না সে ভ্রষ্টা নয় তো কি? যৌবন ও রূপ লাবণ্য নিয়েও কি চুপচাপ বসে আছে? এ কি বিশ্বাস-যোগ্য? কিন্তু একজনে ত ভ্রষ্টা হওয়া যায় না, দুজন চাই। কিন্তু কেউ খুঁজে পায় না, কে পাঁচির সেই প্রিয়জন বা দোসর পুরুষ যার সঙ্গে তার প্রীতি? কার উপর সন্দেহটা দাঁড়ায়? যতদিন পাঁচি এখানে ছিল, শত চেষ্টায়ও কেউ রহস্য ভেদ করতেই পারেনি, এও এক মুশকিল হয়েছিল তাদের দলের পক্ষে। দীনুবাবুর ছেলেদুইটি কম চেষ্টা করেনি, তারা হন্যে কুকুরের মত পাঁচির পিছনে বেড়িয়েছে। রাত্রেও তৃতীয় প্রহর অবধি তিন চারজন দল বেঁধে চৌকিদারী করেছে হাটের পাশে বাগদী পাড়ায়। তবুও কোন সন্দেহ করবার মত জীব আবিষ্কার করতে পারেনি। তখন উদ্ভট কল্পনা আরম্ভ হলো। অবশ্য যতদিন পাঁচি পোলের হাটে ছিল, তাকে যে কি সাবধানে থাকতে হতো তা বিধাতাই জানেন। সে সব কিছুই খবর পেতো যে দল যে ভাবে তাকে বিপন্ন করবার জন্য যে সকল কর্ম-কৌশল অবলম্বন করেছে।

তার চলে আসবার পরেই তাদের কল্পনা উদ্দম হয়েই উঠলো। কোন নূতন লোক যার প্রেমে পাঁচি বিবাহে বিমুখ এমন কাকেও ধরতে না পেরে ওরই মধ্যেই একদল সিদ্ধান্ত করলে, আর কেউ নয় ঐ ত্রৈলোক্যই হবে সেইজন—যাকে তারা খুঁজছে। এখন ত্রৈলোক্য লোকটা অত্যন্ত সরল, তার দোষটা এই যে সে মনেপ্রাণে কখনও কুচিন্তা করেনি, পাঁচিকে সে মেয়ে আর মনিব ছাড়া অন্য কোনভাবেই দেখতে অভ্যস্ত নয়।

কথাটা যখন ত্রৈলোক্য কয়ালের কানে গেল, সে আর, মোটেই ভালমানুষ রইলো না, সে যে কাণ্ড করলে তাতে সবাই দমে গেল। সে একেবারে ঐ দলপতি অম্বিকা ভটচাজের কাছে গিয়ে সোজা কথায় বলে ফেললে, দেখো ঠাকুরমশাই, আমি জীবনে কখনও কারো সঙ্গে ঝগড়া, অম্বরস করিনি, আমার নিজের মেয়ের মত যাকে দেখে আসচি যদি তোমরা তার চরিত্র নিয়ে এ রকম ঘোঁট করো তাহলে স্পষ্টই বলে দিচ্চি, তোমার দলের সব শালাকে ভাতে মারবো। তারা চাঁড়ালেরও অধম, তাদের শাস্তি দিলে কোন পাপ নেই। কাকেও আর হাটে আসতে হবে না। একটিও ধান চাল কেউ পাবে না ঐ পোলের হাট থেকে।

ত্রৈলোক্যের ভালোমানুষ, তার ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে সে দল সামলালো বটে, তবে এবার গ্রামের ভদ্রলোকের দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো, এবার তাদের আবিষ্কার এমনভাবেই সবার উপরে গেল যে তারপর আবিষ্কারের আর কিছুই রইলো না; অবশ্য এর মূলেও ঐ অম্বিকা ভটচাজ।

বাবুদের বাড়িতেই সেদিন পাঁচি-চরিত্র আলোচনা সভাটা বসেছিল, সভাপতির জায়গায় ছিলেন ভটচাজ। তিনি বললেন এবার ঠিক ধরা পড়েছে, —বাবা, এ ভগবানের রাজ্যি,—আর যায় কোথা, ঐ ভাই আর বোন, আর চাই কি?

ছোটজাত তো, ওদের কি সে জ্ঞান আছে? ওর প্রিয়জন বাইরে খুঁজতে

হবে কেন ঘরের মধ্যেই তো আছে ; না হলে মুড়ো এখনও বিয়ে করেনি কেন, চব্বিশ পঁচিশ বৎসরের জোয়ান,—কেন সে পাঁচির এতটা অনুগত ? ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর আরম্ভ হল যুগ বা কালের নজীর, এটা যে কলিকাল, কালটা দেখতে হবে তো ? পুরুতমশাই মেজ ছোট দুই বাবুকেই লক্ষ্য করে তাঁর নব আবিষ্কারের কথা বেশ জোর গলায় বললেন। সঙ্গে সঙ্গে এটাও জানানো হলো তিনি ধার্মিক মানুষ কাকেও ভয় করেন না। সত্যসন্ধ ব্রাহ্মণের জীবন তাঁরা যা কিছু জানেন স্পষ্টই বলে দেন। বললেন, আপনারা সরল মানুষ, কেমন কোরে ঐ ছোটলোক নষ্টা ভ্রষ্টা বাগদী মাগীর কুচক্রের মধ্যে ঢুকবেন ? গ্রামের ধর্মের মাটিতে তো ও চলবে না, চাপা থাকবে না বেশীদিন। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে যাবে। মেয়েমানুষের ও-পাপ চাপবার জো আছে কি, আবিষ্কারের কথা এই পর্যন্ত বলে, তিনি এবার ইঙ্গিতে, গর্ভ বুঝাতে নিজ হাত দুটি পেটের উপর ফাঁপালো করে দেখিয়ে, সদম্ভে বলতে লাগলেন, —তাই তাড়াতাড়ি একটা বিশ্রী চামধোয়া জল বেরোনো নল পুঁতে, জলকষ্ট দূর করবার লোক দেখানো একটা ঢং করে, ভাইকে নিয়ে সরে পড়লো কলকাতায়। আমরা কি বুঝি না ? কলকাতাই তো ঠিক জায়গা, সেখানে তো কেউ কাকেও চেনে না, সব পাপই ঢাকা দেওয়া যায়। আরে বাবা এ ধর্মের স্থান,—গাঁ-ভুঁয়ে তো ও সব হবার জো নেই ! না হলে দেখুন না, মেয়েটার পেটে পেটে বুদ্ধি, তুই নিজে তো উচ্ছন্ন গেলি, ভাইটারও মাথা খেলি ? তুই যে চুলোয় ইচ্ছে যা না, মুড়োটাকেও টানতে গেলি কেন ? তার পৈত্রিক ভিটে, বাবুদের দেওয়া চার পুরুষের ধান জমি, তাকে ভিটেচ্যুত গ্রাম ছাড়া করলি কেন ? আর তার কথাও বলি, তুই এক কাজ না হয় মনের ভুলে বয়সের দোষে পড়ে করেচিস, তা বেলে শেষ অবধি তারই আঁচল ধরে রইলি, এ্যাঁ—

পাঁচির জেঠি তো কেঁদেই খুন, ঈশ্বরকে ডেকে বেশ মুখ ঝামটা দিয়ে বললে, এসব শুনচোনা, হয়েছে—ভটচাজ মিনসে কি সব রটাচ্চে ?

ঈশ্বর ভাল মানুষ লোক, বলে, বলতে দেনা, চাঁদে কলঙ্ক লাগে না, আমাদের পাঁচিকে যিনি দাগ দেবেন তার নরকেও ঠাঁই হবে না।

জেঠি বলে, আচ্ছা, আমরা ছোট জাত বাগদী, কাওরা, ডোম, আমরা তোমাদের গোয়াল কাড়বো, ঘুঁটে দেবো, পুজোয় বাজনা-বাদ্দি বাজাবো, আমাদের ঘরের কথা নিয়ে তোমাদের এত মাথা ব্যথা কেন ? তোমরা বড়ো আছ বড়র মতই থাকো না, কে তোমাদের কাছে যাচ্চে—

ঈশ্বর বলে, কি জানিস, ঐ যে পয়সা ! হারার বেটি, বাপ মা মরা মেয়ে তার পয়সা কেন ? তারপর সেই পয়সা ধারকর্জ করতে এসে কেউই পায়নে যে ! মেয়েটাই কি কম একগুঁয়ে, কাকেও একটা পয়সা ধার বোলেও দিলে না, —আমি জেঠা, আমায় পর্যন্ত নয়। আমি ওর বাপের বড়ো—এ্যাঁ বল না মাগি ?

জেঠি তখন হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললে, তুমি মদ খেতে আমায় মারধোর করতে, তাই তোমার ওপর ওর রাগ ছিল যে গো, সেইজন্যেই তোমায় দেয়নি, ওগো—আমায় তো দিতো, মাসে দু তিন টাকা করে—এই পর্যন্ত বলেই তার মনে পড়লো যে পাঁচির বারণ আছে কাকেও একথা বলতে। তখন,—ওমা

ঝাঃ, বলে ফেন্নু, মা, মা, কালীর দিব্বি করেছিনু যে ;—মা গো, কি পাপ কন্নু ? হেই মা কালী ! তবে ঝাবার সময় ঝা দিয়েছে, ঐ যে দু-কুড়ি আড়াই গণ্ডা করকরে টাকা থলের মধ্যে বাঁধা, সে কথা তো তোমায় বলিনি। দোহাই মা রক্ষে কোরো মা গো ! বলেছিল বড় বিপদ না হলে খরচ কোরোনি জেঠি। তা আমি তো পুতু পুতু করে সবই রেখে দিইচি। মা কালীই জানেন তা থেকে এক পয়সাও খরচ করিনি তো। তোমাকেও দেবোনাতো, সে বলে গেছে ঝে মেরে কুটি কুটি করলেও তোমায় ঝেন না দিই। সুদু আমায় কেন ছোট বৌকেও তো অতোই দিয়ে গেছে। সে চালাক মেয়ে কেমন পেটে করে রেখেছে, আমি বোকা বলে ফেন্নু তোমার কাছে। হাঁগা চলোনা এই আমাবোস্যেতে যাই আমরা মায়ের থানে, মাকে দেখে আসি, আর দিব্বি ভাঙ্গার জন্যে পুজো দেবো—চলো না,—মেয়েটাকেও দেখে আসবো।

ভাল মানুষ ঈশ্বর বললে, ও বাব্বা, সে কি কম খরচের ব্যাপার, কলকেতায় কালীঘাটে যাওয়া-আসা, পুজো দেয়া, আমা দ্বারা হবে নি। জেঠি বলে, তুমি কেন ভাবচ আমার কাছে ওয়েচে তো টাকা,—শুনে ঈশ্বর সাবধান করে দিলে ; পুঁটেকে, ছোট বৌকে বলিস না যেন। জেঠি বলে, বলবো না ক্যানু, দু'ঘর এক সঙ্গে গেলে হবে কেন, এবারে আমরা গেনু, এরপর ওরা ঝাবে তখন আমরা থাকবো, সেই তো ভালো। পাঁচি তো সেই কথাই বলে গেছে ঝাবার বেলা ; দু'ঘর এক সঙ্গে ভিটে ছেড়ে যেতে তার বারণ। মেয়ে হলে কি হয় তার বিলি-ব্যবস্থা সাত মুহুরীর কান কাটে। বাছারে,—

যাই হোক, এখন স্বামী-স্ত্রী মিলে একটা দিন ঠিক করে ফেললে, মেয়েটাকে দেখে আসবে একবার, যাবার সময় অনেক করে যেতে বলেছিল। সে রাতটা তার গুণকীর্তনেই কাটালো। পাঁচি বলেছিল, জেঠি ! আমি আর আসবুনি, তোরা ঝাবি নিশ্চয়, যখন ইচ্ছে ঝাবি, মায়ের থানে ঝাবি, আমারেও দেখে আসবি। তবে খবরদার দু'ঘর এক সঙ্গে যাসনি, একবার তুই গেলি জেঠাকে নিয়ে, খুড়োখুড়ি রইলো ঘরে, আবার যখন খুড়োখুড়ি গেল তোরা রইলি ঘরে। ভিটে ফেলে কখনও ঝাসনি। ভিটের উপর তার দম কতো।

ওদিকে জমিদারবাড়িতে ছোটবাবু আর ছোটবৌ, দুজনের মধ্যে এমন ব্যবহার-বৈচিত্র্য ঘটলো যা পূর্বে কখনও ঘটেনি। পাঁচির গ্রাম ত্যাগের কথা ছোট বৌ কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারলে না। বাবুদের বাড়িতে বিলাসী বোলে যে ঝি,—সে ছিল ছোটমার বড় অনুগত আর মহান দরদী সখী। পাঁচি-সম্বন্ধে যে সব বিষয় পোলের হাটে এবং তাদের গ্রামের মধ্যে আলোচনা হতো তা সব ঐ বিলাসী ছোট বৌয়ের কাছে এসে বলতো। তা ছাড়া কলকাতায় পাঁচির কারবারের প্রসার, তারা যেভাবে দিন দিন উন্নতি করছিল ত্রৈলোক্য কয়ালের মারফৎ ছোটবৌ-এর কানে আসছিল। কাজেই পাঁচি যাবার পর গ্রামে যে সব কানাঘুষা, পাঁচির কলঙ্ক প্রচারের কাজ ভটচায্যি অম্বিকার দল চালাচ্ছে —সে সকলও এসে বাবুদের অন্তপুরে পেঁৗছেছিল এতে ছোটবৌ কম আঘাত পায়নি। কি ভাগ্যি পাঁচির কানে এ কথাগুলো যায়নি,—ছোটবৌ ভাবতো,—তা হলে সে এদের কি মনে করতো, কে জানে ? তার দুঃখের সীমা থাকতো

না নিশ্চয়ই। তারপর আজ আবার স্বামীর মুখে যে কথা শুনলে তাইতে তার আঘাত তীব্রতম হয়ে তাকে ক্ষিপ্তপ্রায় করে তুললে। ইতিমধ্যে স্বামী-স্ত্রীতে পাঁচির সম্বন্ধে কোন কথাই হয়নি।

তার পিত্রালয় কলকাতায় বৌবাজারে। ছোটবৌ ঠিক করলে এবার কলকাতায় গিয়ে কালীঘাটে যাবে। পাঁচির সঙ্গে দেখা করে তার সুখ-দুঃখের কথা আলোচনা করবে। এই ঠিক করে এক সময় ছোটবাবুকে ধরে বসলো, আমায় কলকাতায় যাবার ব্যবস্থা করে দাও, দিন কতক ঘুরে আসি। ছোটবাবু বললে, হঠাৎ কলকাতায় কেন এখন, আর নিয়েই বা যাবে কে?

এখন বড়বাবুর মৃত্যুর পর দুই ভাইয়েতে যতো কাজ ভাগাভাগি করে নেওয়া হয়েছে। ছোটবাবুর হাতে এখন হাটের বন্দোবস্ত আর খাস জমিজমা বিলি-ব্যবস্থার ভার। লোকটা এখন টাকা কিসে আসে সেই ফিকিরেই সব কিছু করছে। সময় সময় ন্যায়ান্যায় বিবেচনাশূন্য হয়েই চলেছিল, পয়সা পয়সা কোরে। যাই হোক এখন তিনি হাটের সব নূতন ধরনের অর্থবৃদ্ধিকরি ব্যবস্থায় অত্যন্ত তৎপর, কাজেই এখন তার পক্ষে ছোটবৌকে বাপের বাড়ি রেখে আসা সম্ভব নয়। এখন ছোটবৌ কর্তার মুখে যখন শুনলে, নিয়েই বা যাবে কে? তখনই বললে,—

কেন, তুমিই রেখে আসবে আমায়, তারপর যখন ফিরবো, আমি লিখলে আবার গিয়ে নিয়ে আসবে। শুনে ছোটবাবুর মেজাজ একটু গরম হতে আরম্ভ হলো, সে বললে, আঃ বড়ই যে হুকুমদারী করচো ঘরের ভিতর বসে বসে,— আমার যাওয়া সম্ভব নয়, হাটের ব্যবস্থা নিয়ে গোলমাল চলেচে, এ সময়ে আমার এখান থেকে এক ঘণ্টার জন্যও নড়া হবে না।

ছোটবৌ এরপর যখন জিজ্ঞাসা করলে, হাটে হাঙ্গাম কিসের, নূতন ব্যবস্থাই বা কেন? এবার ছোটবাবু স্ত্রীকে একটা আঘাত দেবার জন্যই বললে, ঐ বাগদী হারামজাদী পাঁচির গোলা নিয়েই ব্যাপার,—

ছোটবৌ তো অবাক, আঘাত তার লাগলো বটে কিন্তু একথাও বললে— ভদ্রলোকের মতই কথা বলো না, গালমন্দ কেন একজনকে, যে এখানে নেই; তার কি অন্যায় হলো, সেতো সব ভালো ব্যবস্থাই করে গিয়েছিল।

না, সে মাগী তার গোলা এখানে রেখে গেল আর একজন কাজ করবে সেই গোলায়। সে এখানে থাকবে না, তার নামে গোলাই বা থাকবে কেন? যে সেই গোলা নিয়ে কাজ করচে এখানে তার নামেই ঐ গোলা রেজেস্ট্রি করে দিতে হবে।

ছোটবৌ বললে, আমি কলকাতায় থাকি, যেখানেই থাকি আমার গোলা যদি এখানে থাকে, এখানেও আমার কারবারের উপযুক্ত ব্যবস্থা যদি করে যেতে পারি, তাহলে দোষ কি আমার নামে গোলা থাকলে, তাতো বুঝতে পারলুম না। তার কারবার চলচে এখানে, গোলা অন্য লোকের নামে বিলিই বা হবে কেন? একথা শুনে ছোটবাবু যুক্তির দিক দিয়ে ছোট হয়ে গেলেন, রাগও বাড়লো, কিন্তু একটু সামলে নিয়ে বললেন, যে এখান থেকে একেবারে চলে গিয়েচে, কালামুখ দেখাতে আর কখনও আসবে না, তার নামে কোন গোলাও

আমার হাটে থাকবে না। তা ছাড়া এখন নূতন একজনের নামে আমাদের খাতায় রেজেস্ট্রি করে নাম জারি হলে আমাদের তবিলে কিছু টাকা আসবে, তা ছাড়া একজন বেশ্যাকে যদি আমরা না রাখি হাটে ?

ছোটবৌ বুঝলে, যেভাবে এদের কাজ চলেছে ভগবানের দণ্ড থেকে এরা বাঁচতে পারবে না ; বললে—দেখো, না জেনে-শুনে রক্তের জোরে, একজন সৎ, যে কখনও কারো প্রতি অন্যায় অধর্ম করেনি এমন লক্ষ্মী মেয়েকে মুখে যা আসে তা বলো না, সাবধান করে দিচ্চি, তুমি এতে ঠাকুরের কোপে পড়বে। এর নাম ছন্নমতি—

এবার বাবুর পৌরুষে আঘাত লাগলো সুতরাং তিনি বললেন, তোমার বড় দরদ, তার সঙ্গে তোমারও নাড়ীর যোগ আছে দেখছি। শুনে হেসে উঠলো ছোটবৌ, বললে, আমায় যা খুসী বলো আমি সহ্য করবো, গ্রাহ্যই করবো না, কিন্তু ঐ নিরীহ, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র মেয়েটির নামে যা-তা বলবে আমি সহ্য করবো না ; তুমি গ্রামের কতকগুলো পাতকী; মহাপাপীর সঙ্গে থেকে যা কিছু শুনেছো সে-সব ভুল ভুল ভুল।

ছোটবাবু বললে, তোমার কাছে হিতোপদেশ শুনে কাজ করার মত সময় নেই, ওগো সতী, বেশী বাড়াবাড়ী করো না, তোমার পেয়ারের সেই বাগদিনীর এখান থেকে অত তাড়াতাড়ি পালানোর কারণটা কি ? কি বোলে ঢাকবে তার সে কলঙ্ক ? এত বয়স হলো নিজে বিয়ে করলে না কেন, ভাইটাকেও বিয়ে করতে দেয়নি কেন ? ভাই বোনে অত টান কেন ? আর কিছুদিন থাকলেই তার স্বরূপ বেরিয়ে পড়তো যে ; ভাইবোনের নষ্ট স্বভাবের কথা কে না জানে এ গ্রামে। মেয়ে-মানুষের পাপ কতদিন ঢাকা যায়,—না পালালে উপায় ছিল কি ?

দুই কানে হাত দিয়ে ছোটবৌ বললে, ছি, ছি, হে ভগবান, তুমি এমন লোককে আমার স্বামী করেছিলে কেন ? একমাত্র অপরাধ তার, সে বাপমা খেকো ছোট জাতের মেয়ে, কখনও কারো প্রতি কোন অন্যায় করেনি, বামুন কায়েতের ঘরে জন্মালে আজ অনেকে তার পায়ের ধূলো নিতে—তাকে তুমি যা মুখে আসে তাই বলবে। এখান থেকে যাও তুমি বাইরে, তোমার নিজের কাজে যাও,-

ছোটবাবু দেখলে, এ ছোটবৌ সে লোক নয়, এর মুখে যে কথা সে এখন শুনলে, এমন কথা আগে কখনই তার মুখে বার হয়নি। এ কি মূর্তি ছোট-বৌয়ের! দেখতে দেখতে চক্ষু তার রক্তবর্ণ হয়ে এলো মুখের ভাব তার এমনই পরিবর্তিত হয়ে গেল যাকে ছোটবাবু একটু আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। কিন্তু তা সত্বেও তার কথাটা বলতে ছাড়লো না,— দেখো, বেশী বলবো না কেবল এইটুকু ভেবে দেখো, এই বোলে,—নিজের উদরের উপর হাত বুলিয়ে দেখিয়ে ; —মেয়েমানুষের এ পাপ ঢাকা যায় না শিবের অসাধ্য—আর কিছুদিন থাকলেই তার স্বরূপ বেরিয়ে পোড়তো ; তাই না এত তাড়াতাড়ি কাকেও না বোলে না জানিয়ে রাতারাতি ভাই বোনে চম্পট। তুমি এ কথা বিশ্বাস করবে না ? আচ্ছা তা হলে সে এখানকার এতটা সুখ-সুবিধে ছেড়ে পৈত্রিক ভিটের মায়া ত্যাগ করে পোলের হাট থেকে চলে গেল কেন ;—বলতে পারো ?

ছোটবৌ কেমন যেন কতকটা ঝিমিয়ে গেল প্রথমে, মুখখানা তার মড়ার

মতই ফ্যাকাশে—তারপর ম্লান হয়ে গেল ; সে ধীরে ধীরে বোসে পড়লো সেইখানেই। কিন্তু অতি অল্পক্ষণেই, ঠিক যেন মুহূর্তেই সে সামলে নিলে নিজেকে, সঙ্গে সঙ্গেই তাড়াতাড়ি গলায় আঁচলটা দিয়ে জড়িয়ে নিলে, হাঁটু মুড়ে বসলো সেইখানে,—তারপর দৃঢ় কণ্ঠেই বললে,—

হাঁ, আমি বলতে পারি,—বলচি শোনো—জীবনে কখনও ভালো সঙ্গ করো নি, ভালো মানুষ চেনো না, তার উপর পুরুষ, জমিদার বোলে ঐ দম্ভে, কেবল দণ্ডদাতা বোলেই দেখে এসেচো নিজেদের। বিবাহ করেছ, কখনও ভালবাসা দাওনি, নারী প্রকৃতির সঙ্গে অপরিচয়ই তোমায় এতটা বিপথে নিয়ে গিয়েছে। এখন শোনো, কেন সে এখানে থাকতে পারেনি, তার মত স্বভাব, প্রকৃতি, সৎ চরিত্র মেয়ে, অন্য দেশ হলে সেই দেশের লোকে যাকে মাথায় করে নিতো। একা, সহায়হীন, একটি মেয়ে, তার উপর কি পাশব অত্যাচারটাই না হলো। কেন ? অপরাধের ভিতর সে জাতে ছোট তাই তোমাদের পাতকের জন্যেই না তাকে এতটা সইতে হলো ; রক্তের জোরে কেবল তার পিছনেই লেগেছো, অথচ সে তার স্বভাবের গুণে সবাইকে আপন করে নিয়ে যে উন্নতি করে গিয়েছে এরকম ক'টা তোমাদের উঁচু জাতের মেয়ে দূরে থাক কটা ছেলেইবা করতে পারে ? সেটা ভেবে দেখেচ কি ? তার ফলে সে পেলে কি তোমাদের কাছে ? নিজের বুকে হাত দিয়ে বলো তো, নিজে তুমি তার কি সর্বনাশ করেচ তাকে নষ্ট করতে না পেরে ? মেয়েমানুষের যার চেয়ে আর অপমান নেই, অসহায় নারী-জীবনের উপর ঘৃণা আসে, যে অত্যাচার, পীড়নের পর আর বাঁচতে ইচ্ছা হয় না তার পরেও তাকে এই নরকে থাকতে হবে ? সেই অত্যাচারের চরম দণ্ড অবশ্য বিধাতার বিচারে, যথা সময়ে নিশ্চয়ই পেতে হবে। এখন নিরীহ ঐ মেয়েটার মন নিয়ে দেখো তো পুরুষ বীর,—ঐসব সহ্য করে এখানে থাকতে প্রাণ চায় কি, যেখানে চারিদিকে ঐ পাতকের সাক্ষী তার উপর তোমাদের লোলুপ দৃষ্টি তার দেহটার উপরে রয়েছে, ঐ অত্যাচারী দানবদের দৃষ্টি সকল সময়েই তাকে আঘাত করচে, সে আঘাত কি কখনও বন্ধ হবে যতদিন না তার দেহের সব আকর্ষণ নিঃশেষে লুপ্ত হয় ? তবুও তাকে থাকতে হবে তারমত একজনকে, যার নিজের অর্থ-সামর্থ্য আর এই নরকতুল্য স্থান ত্যাগ করবার সুযোগ-সুবিধা আছে ? তবুও তাকে সকল কিছু ব্যবস্থার জন্য থাকতে হলো কিছুদিন নিরুপায় হয়ে। এখন তাকে কলঙ্কিনী বললে তার পিছনে যা খুশী অপবাদ দিলেই বা কি হবে, সে যে তোমাদের পাপের অধিকার ছাড়িয়ে যেতে পেরেছে এইটিই কি তার মহত্ত্বের একটা বড় প্রমাণ নয় ? আত্মশক্তির এমন পরিচয় আর কোথায় পেয়েচ ?

বোলেই পায়ের কাছে জোরে জোরে মাথা ঠুকে, ছোটবৌ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ছোটবাবু হতভম্ব, তার সব কিছু ভিতরের পরিস্থিতি ওলট-পালট হয়ে গেল। কি কথা শুনলে সে আজ !

* * * * * * *

ইতি মধ্যে পাঁচির অভিজ্ঞতার পুঁজি বেড়ে চলেছিল কলকাতায় এসে। প্রথম থেকেই স্বাধীন প্রকৃতি বোলে তো বটেই, তা ছাড়া আগাগোড়া

গাঁয়ের প্রজাদের সমাজ দেখে—তারপর এখন বিদ্যাভ্যাসের ফলে পাঁচির মনের মধ্যে একটা প্রবল আত্মবিশ্বাস তাকে এমনই উন্নতমনা করে তুললে যা ভাষায় বোঝানো যায় না। তার নিজ অন্তরের আলোই তাকে বুদ্ধি ও কর্মশক্তিতে অটুট করেছিল। কিন্তু এ জাতের ছোট বড় সমাজের মধ্যে এই উঁচু নীচু শুধু পল্লীগ্রামে নয়, কলকাতাতেও আছে আর ভালই বুঝলে যে সেটাও ঐ পল্লীগ্রাম থেকেই আমদানি। এখানকার যে উঁচুনীচু জাতিভেদ সেটা অন্য-রকম, পাঁচি তার হদিস একদিন ঐ কালীবাড়িতেই পেলে।

সেদিন সন্ধ্যায় সে গিয়ে নাটমন্দিরের যেখান থেকে মায়ের মূর্তি একেবারে সামনা সামনি দেখা যায়,—মাঝে মাঝে ভিড় সরিয়ে তাদের দেখবার অবসর করে দেওয়া হয়, সেইখানেই দাঁড়িয়েছে। সে দাঁড়িয়েছিল সবার পিছনেই। চির সাবধানী পাঁচি কখনও আগে গিয়ে কোথাও দাঁড়াতো না, সব সময়েই সে সবার পিছনেই থাকে—পাছে কোথাও তার জাতের কথা ওঠে।

উজ্জ্বলবর্ণা বিধবা গিন্নী-গোছের একজন ঠেলেঠুলে আগে ভাল করে দেখবে বোলে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো,—তাতে সহজেই পাশের আর একটি ক্ষীণাঙ্গী বিধবা শ্যামবর্ণা প্রৌঢ়ার গায়ে গা লাগলো, তার কাপড়টাও খানিক লাগলো তাঁর গায়ে। তখন তিনি তার দিকে চেয়ে,—মর মাগি, কোন ছোটজেতের মেয়ে তুই, গায়ে গা দিয়ে মরিস কেন?

যাকে এই মিষ্টি কথাটি শুনতে হলো তিনিও গিন্নী এবং মনে হয় বিশেষ বুদ্ধিমতী। উত্তরে বললেন,—ওগো গায়ের রঙ একটু সাদা না হলে ছোট জাত হয় না, আমরা কাওরা—বাগদী নই, আমরা কৈবত্ত মাহিষ্য, আমরা ছোট নয়।

বামন গিন্নী রাগে গরগর করতে লাগলো, বললে, কি আমার বড় জাতগা, কৈবোত্তো—ভারি বড় জাত রে?

এবার সেই কৈবর্ত গিন্নী যা বললে তাইতে বামুনগিন্নীকে ঠাণ্ডা হতেই হলো।

বলি ও বড় জাতের গিন্নী, রাণী রাসমণির নাম শুনেছ, আমরা তারই সজাত কত বামন তার চাকর আছে। তোমাদের ছেন্দা ভক্তি তো সব ঐ পয়সায়। পয়সা মা পয়সা, এখন পয়সাতেই মানুষ বড়, পয়সাতেই মানুষ ছোট। তোমার বামনাই-এর দেমাক এখন চলবে না মা, সেকাল আর নেই। বোলে বামুন গিন্নীর আগে সোজা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো। দর্শনের সুযোগ যখন এলো তখন সেই কৈবর্ত আগে দেখলে। বামুন গিন্নী গজগজ করতে করতে পাছে গায়ে আবার গা লাগে সেই ভয়ে আর এগিয়ে যেতে পারলে না। পাঁচি ছিল তাঁর পিছনে, তাকে দেখেই বামুন গিন্নী খপ্ করে হাতটা তার ধরে ফেললে, বললে, মা, তুমি আমার আগে থাকতো, তাহলে আর কারো গায়ে গা লাগবে না, মায়ের মুখখানা দেখে একেবারেই বাড়ি চলে যাবো,—ঘরে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে, মা।

পাঁচি অবাক হয়েছিল প্রথমে, তারপর তার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, আমরা বাগদী যে, আমায় ছুঁলেন? শুনেই বামুন গিন্নী,—কখনও নয়, কক্খোনো নয়, তুমি বাগদী বোলে আমায় ঠকাতে পারবে না, মা।

পাঁচি আর কোন কথাই বললে না,—ভাবলে বাদ-প্রতিবাদ এখানে না করাই ভালো, কোন লাভ নেই—বরং এক্ষেত্রে হয়তো ক্ষতিই হবে।

তার মনে আজ একটা বিষয় স্পষ্ট হলো,—সমাজের এক শ্রেণীর লোকে জাতের গোড়ার কথাটা জানে না, কেবল জানে ছোঁয়াছুঁই, আর বড় জাত আর ছোট জাত। তারপর ফিরে এসে যখন সে এই গল্প গোলকবন্ধুর কাছে করলে, শুনেই তিনি হেসে উঠলেন—বললেন, আসল কথা এখন কি দাঁড়িয়েছে জানো মা, যাদের আর্থিক অবস্থা হীন, তারাই জাতের গৌরব আঁকড়ে ধরে আছে, তাইতে দুঃখ-দারিদ্র্য কতকটা সহ্য করতে পারছে। এই বড় জাতের আর ছোট জাতে মধ্যে অবস্থায় তারতম্যেই শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট বিচার হয়, বিদ্যা জ্ঞান সংস্কৃতি দীর্ঘকাল চলে আসার জন্যই বামুনেরা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে,—না হলে লেখাপড়া বা উচ্চভাব জ্ঞান ও সংস্কৃতির সুযোগ পেলেই ছোট বড় হয়ে যায়, একথাটা ভেবে দেখার অবসর নেই কারো। অনেকদিনের সামাজিক নীতির চাপে ছোট যাদের বলা যায় সে জাতের প্রসার হতে পারেনি। কিন্তু এখন ইংরাজের আমলে আর সেদিন নেই ; এখন সুযোগকে করায়ত্ত করতে যে বা যারা পারবে তারাই বড় জাত। সমাজে তারাই শ্রেষ্ঠ। না হলে ধর্মমাত্রেই সদাচারের অধিকার সকল বর্ণেরই আছে,—এই দেখ না, তোমার পরিচ্ছন্নতা দেখেই তো সেই বামুন গিন্নী তোমারই হাত ধরে আশ্রয় প্রার্থনা করলে। না হলে, যখন বাগদী বোলে শুনলে তার বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তিই হলো না কেন—এইটাই কি উৎকৃষ্ট প্রমাণ নয় যে জাত ছোট বড় কারো বংশ বা জন্ম দিয়ে সাব্যস্ত হয় না।

অধ্যবসায় অসাধারণ থাকায় পাঁচি তার কারবারের খুঁটিনাটি সকল কিছু দেখাশুনার পরও অধ্যয়নে মনোযোগ তিলমাত্র শিথিল হতে দেয়নি। অল্পদিনেই তার সব কিছু দৈন্দিন কর্মক্রম যথারীতি অভ্যস্ত হয়ে গেলেও তার আরও জানবার আগ্রহ বেড়েই চলেছিল। সময় বিশেষে প্রশ্নের উত্তরে গোলকবন্ধুর কাছে সে জেনে নিয়েছিল, এখন এখানকার বিদ্বজ্জন সমাজের মুখপাত্র কারা। আর মনে মনে এই আশাও পোষণ করে এসেছে একদিন না একদিন সে তাঁদের কাছেই প্রাণের গূঢ় প্রশ্নের উত্তর মিলবে, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটবে ;—এই সমাজের জাতি ব্যবস্থার মূল কথাটা শুনতে পাবে। যত কাজই করুক তার মনে ঐ ছোট জাতের সঙ্কোচ বরাবরই লেগেছিল। তাই একদিন যখন কথা-প্রসঙ্গে শুনলে যে গোলকবন্ধুর সঙ্গে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাইয়ের জানাশুনা ও পরিচয় আছে—সে ধরে বসলো, তাকে একদিন নিয়ে যেতে হবে তাঁর কাছে।

গোলকবন্ধু স্বীকার করলেন। একদিন তিনি একলা গিয়ে শাস্ত্রীমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে পাঁচির সম্বন্ধে সকল কথা, শেষে, সে তাঁর কাছে আসতে এবং কিছু জানতে চায়, জানিয়ে, একদিন তার আসবার কথাও বললেন। শাস্ত্রী-মশাইয়েরও মেয়েটিকে দেখবার ইচ্ছা হলো। ফলে একদিন পাঁচির অদৃষ্ট প্রসন্ন হলো। গোলকবন্ধুর সঙ্গে সে নিঃসঙ্কোচে গিয়ে শাস্ত্রীমশাইয়ের বাসায় উঠলো। তখন তিনি বেনেটোলায় থাকতেন। পণ্ডিত ব্রাহ্মণের কাছে পাঁচি

শুধু হাতে গেল না। গোলকবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে পাঁচি বেশ কিছু ভাল আম ও মিষ্টান্ন-দ্রব্য আট দশ টাকার সঙ্গে নিয়ে গেল।

পাঁচি তো তাঁকে গলায় আঁচল দিয়ে গড় হয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করে দাঁড়ালো। শাস্ত্রীমশাই তখন একগাদা প্রুফ নিয়ে সমাহিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে দেখলেন, জিনিসগুলিও দেখলেন এবং প্রসন্ন ভাবেই তাকে বললেন, বস, তুমি বোস ঐখানে, বোলে সামনের একটি আসন দেখিয়ে দিলেন। এখানে এসে পাঁচির প্রাণে যেন অদ্ভুত এক শ্রদ্ধাপূর্ণ বিস্ময়ের ভাবানুভূতি প্রবল হয়ে উঠলো, আর কাজগপত্র পুস্তক পরিপূর্ব আধারগুলি, যেন জ্ঞানে ভরা এখানকার বায়ুমণ্ডল, দেখে তার অন্তঃকরণ উদ্দাম পুলকে পূর্ণ হয়ে উঠলো। সে গিয়ে শাস্ত্রীমশাইয়ের আসনের নীচে বসলো, বললে, এইখানেই আমি বসি। শাস্ত্রী-মশাই বললেন,—এসব এনেছো কেন? পাঁচি বললে, গুরু ব্রাহ্মণ এঁদের কাছে কি শুধু হাতে যেতে আছে? শাস্ত্রীমশাই বললেন, আর কখনও এনো না, বুঝলে? পাঁচি বুঝলে।

শাস্ত্রীমশাই তার মুখখানির পানে লক্ষ্য করে বললেন,—বিদ্যাবতী হতে চাও? পাঁচি নিরুত্তর—মুখটি নীচু করে হাতে হাত কচলাতে লাগলো। বলতে যাচ্ছিল, আমরা ছোট জাত, এইভাবের অনের কিছু তার মনে এলো বটে কিন্তু মুখে কথাটি বার হলো না। ভালই হলো—শাস্ত্রীমশাই কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করলেন, হয়তো এখানকার অনেক বই পড়েছ, তুমি বঙ্কিম পড়েছ?

পাঁচি সবিনয়ে অথচ বেশ স্পষ্ট ভাষায় নিবেদন করলে যে তাঁর উপন্যাস-গুলি প্রায় সবই সে পড়েছে।

শাস্ত্রীমশাই বললেন, তাতে তো বঙ্কিমের সকল পরিচয় নেই, তাঁর কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন, গীতার টীকা এসব পড়তে হবে, তারপর তাঁর আরও বিবিধ প্রবন্ধ প্রভৃতি অনেক কিছুই আছে যা এখন হয়তো বাজারে পাবে না। পুরানো কোন কোন মাসিকে বেরিয়েছিল, আমার কাছে সংগ্রহ করা আছে, তোমাকে আমি দেবো।

পাঁচির মনে হলো,—আমি কি ওসব বুঝবো,—কথাটা সে বলেও ফেললে। শুনে শাস্ত্রীমশাই বললেন,—ঐ গোলকের কাছে পড়বে, তাতেই দুজনের কাজ হবে।

এবার পাঁচি একটু বেফাঁস কথা বলে ফেললে,—যা জানতে এতটা আমার ইচ্ছা, তাঁর ঐসব বইয়ের মধ্যে পাবো,—তাই কি ঐসব পড়তে বলছেন?

ইতিমধ্যে শাস্ত্রীমশাই নিজ কর্মে মনোনিবেশ করেছিলেন—পাঁচির কথা শুনে বললেন,—যা বলচি তাই করো না গো,—তারপর এসো তোমার কথা শুনবো। এই বোলে দ্বারপ্রান্তে দৃষ্টিপাত করলেন। একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল পাঁচিকে আর শুনছিল তাঁদের কথাবার্তা,—তাকে বললেন, একে ভিতরে নিয়ে যা। সে পাঁচিকে বড়ই যত্ন করে ভিতরে নিয়ে গেল। প্রায় আধঘণ্টা পরে ফিরে এলো তখন সে যে বাগদীর মেয়ে একথা তার আর মনে রইলো না। তবে একটা সন্দেহ তার মনে রইলো, তার উপহারগুলি শাস্ত্রীমশাইয়ের ভোগে লাগলো কিনা।

যাই হোক এখন এই কথা ভেবে পাঁচির প্রাণ আনন্দে ভরে উঠলো যে, ভাগ্যে সে পোলের হাট থেকে কলকাতায় এসে বসতে পেয়েছিল, তাইনা এই ভাবের এক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর পরিবারের সঙ্গে, এমনভাবে মিলন ঘটলো। কয়েকদিন পর্যন্ত তার মনে অবিরাম তার জন্মভূমি আর গ্রামের কথা উঠছে—তার সঙ্গে এখানকার বর্তমান বর্ধমান পরিবেশের তুলনায় তাকে এখন ব্যস্ত রাখলে।

শাস্ত্রীমশাইয়ের সঙ্গে দেখার প্রায় সপ্তাহ খানেক পর একদিন সকালে একটি ছোকরা, বেশ ভদ্রঘরের মতই বেশভূষা, এসে মদ্রো অর্থাৎ মদনের দোকানে জিজ্ঞাসা করলে ; এখানে পঞ্চমা দেবীর বাড়ি কোথায় ?

পাঁচির ভাল নাম লেখার সময় সে, পঞ্চমা, লিখতো,—এটা মদ্রো জানতো কিন্তু দেবী বলায় এইটুু ভড়কে গেল। —সে জিজ্ঞাসা করলে পঞ্চমা দেবীকে কি দরকার,—কোথা থেকে আসচেন আপনি ? সে বলে, আমি আপাততঃ পোলের হাট থেকেই আসচি। আমাদের দেশ ছিল, মগরার কাছে মড়াপাই লক্ষ্মীকান্তপুর ; ছেলেটি বললে, আমার কথা তারই সঙ্গে,—আপনি শুধু একবার বাড়িটা বোলে দিন, তাহলেই হবে। কাজেই মদ্রো ভাবলে, বোধ হয় পাঁচি জানে এর কথা। পাট থেকে উঠে বললে, আপনার নামটি কি, তাকে কি বোলতে হবে ? সে বললে, আমার নাম হলো রামনারায়ণ দাস ; একবার দেখা করতে চাই তার সঙ্গে।

পাঁচিকে বোলতেই সেও আশ্চর্য হয়ে গেল, আমায় আবার দেবী বোলে সম্ভাষণ করতে এলো, কে রামনারায়ণ—আচ্ছা তুমি ডাকো তাকে দেখি তো! ছোকরা এসে বেশ শ্রদ্ধাবনত শিরে জোড়হাতে নমস্কার করে বললে, আপনিই পঞ্চমা দেবী ?

পাঁচি একখানা টুল দেখিয়ে বললে, বসুন,—তারপর বললে, আমাকে দেবী বলতে কে আপনাকে বোলেচে, আমরা বাগদী, আমরা কি কখনও নামের সঙ্গে দেবী বোলতে পারি ? এখন বলুন তো আপনার কথা।

সে বললে,—আমায় চিনতে পারলেন না, আমি রামনারাণ,—আপনার মামা যে চিন্তামণি আমি তার সম্বন্ধী যে, এক সঙ্গেই আমরা ওখানে তো ছিলাম, আপনি যখন ছ' সাত বছর অবধি ওখানে খৃষ্টানদের স্কুলে পড়তেন, আমরা এক বয়সী ছিলাম,—এক সঙ্গে কত খেলা করেছি, মনে নেই ? তারপর আপনি ওখান থেকে চলে গেলেন পোলের হাটে আপনাদের গ্রামে, আপনার জেঠা নিয়ে গেল।—মনে পড়ে না আমাকে ?

পাঁচি বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে তার দিকে চেয়ে বললে,—ওমা, সেই রাম-নারাণ,—মা গো, আমায় দেবী বলে দেখা করতে এসেছ এখানে ? যতদিন পোলের হাটে ছিলাম, ততদিন কি একবারও মনে পড়েনি ? এই এখন তোমার মনে হলো ?

সে বলে, আমি ম্যাট্রিক পাস করি চার বছর আগে ;—বেহালায় আমার এক মামা থাকে তার কাছে থেকেই আই-এ পর্যন্ত পড়েছি, পাস করেছি,—এখন জেনারেল পোস্ট অফিসে কাজ করছি,—কলকাতায়, বৌবাজার কপালীটোলায়

বাসা করেছি। পূজার ছুটিতে আপনার মামার বাড়ি মগরায় যাই, সেখানে শুনলাম আপনি একজন গণ্যমান্য কারবারী লোক হয়েছেন পোলের হাটে। আমি সেখানে গেলাম, শুনলাম সেখানেও আপনার কারবার আছে,—আপনার জেঠাই আমায় এ সব কথা বললে, তারপর ত্রৈলোক্য কয়ালের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিলে। তার কাছে সব কিছু জেনেই এখানে আসছি।

পাঁচির প্রাণে ভারি আনন্দ হলো। তাদেরই জাতের একটি ছেলে,—আই. এ. পাস করে একজন বেশ ভদ্রলোক হয়েছে। আমায় আবার দেবী বোলে ডাকতে চায়। এটা ওর বাড়াবাড়ি,—কালীঘাটে এসে ধান চালের আড়ত আর কাপড়ের কারবার করলেই কি দেবী হয়ে গেছি। বেশ মজা তো, আমাদের মামার বাড়ির বড় মামার সেই সুমুন্দি রামনারায়ণটা এত বড় কাজের মানুষ হয়েছে,—তার ইচ্ছা হলো জিজ্ঞাসা করে তার বিয়ে হয়েছে কিনা। কিন্তু এমনই একটা লজ্জা এলো সেই লজ্জায় তা জিজ্ঞাসা করতেই পারলে না। তবে সে তাকে একটা ঘা লাগালে এই বোলে,—তুমি আই. এ. পাস করলে তো চাকরি করতে গেলে কেন? পাঁচি একথা খুব ভাল করেই জানতো যে চাকরি করে কখনও অভাব মেটে না, বাবুদের সেই মাস মাইনের উপর সারা মাসের সকল খরচ বেঁধে নিতে হয়। গ্রামের বামুন কয়েকঘর বাবুদের তো সে দেখেছে, ধার দেনা করে বড় বড় দায় মেটাতে বাবুরা জেরবার হয়ে পড়েছে, মাসের শেষে,—যার যেটা পাওনা, মুদি, গয়লা, এদের দিতে পারে না—ধার আর ধার করে করে স্ত্রীর গায়ের গয়না পর্যন্ত বাঁধা, তা ছাড়া, লোকের কাছে কত ছোট হয়ে থাকতে হয়েছে। বামুন হয়ে ছোট জাতের খোসামোদ করতে হয়—সেসব দুঃখ পাঁচি অনুভব করেছে যে! কাজেই কথাটা রামনারায়ণকে বোলতে পাঁচির আটকালো না যে, আই. এ. পাস করেচ তো চাকরি করতে গেলে কেন?

ছেলেটি,—একথাটা আশা করেনি,—সে ভেবেছিল আই. এ. পাস শুনেই পাঁচি মোহিত হয়ে যাবে, তারপর এতবড় গভর্নমেণ্ট অফিসে কাজের কথা শুনে সে স্তম্ভিত হবে। এখন উত্তরে তাই সে অপ্রতিভ হয়ে গেল, তার মুখখানা শুকিয়ে গেল,—বললে,—চাকরি না করে কি করব? বাবা যে মারা গেলেন, মা, ভাই, বোন ; এদের খাওয়াতে হবে, বোনের বিয়ে দিতে হবে না? পাঁচি বললে,—তা হোক, চাকরি করতে করতেই তো মরে যাবে, দুঃখ ঘুচবে কি?—আমি তো কতো দেখলুম,—তোমার তো সেই বুড়ো বয়সে একশো দেড়শো মাইনে হবে, তারপর না হয় পঞ্চাশ টাকা পেনসান হবে—কতই বা হবে বাপু? আবার বিয়ে থা আছে তো?—

সে বললে, না,—এই সংসারই কষ্টে চলচে, তার উপর বিয়ে করে খরচ যোগাবো কি করে,—বিয়ে করবো না ভেবেচি।

এইবার পাঁচি সত্য সত্যই রামনারায়ণের প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করলে। বেশ শক্ত ছেলে তো! সে বললে, এখন এসেচো, একটু জলটল খাও, ঠাণ্ডা হয়—তার পর ভাত খেয়ে যেও। বসো একটু আমি আসচি। তাকে বসিয়ে সে বেরিয়ে এসে প্রচুর জলখাবারের ব্যবস্থা করে—তাকে একবারে জানিয়ে দিলে যেন এখানে পাঁচি তাকে পেয়ে ধন্য হয়ে গিয়েছে।

সেই রাত্রে পাঁচি যখন শুয়ে পড়ল তার শয্যায়,—সারাদিনের কাজের পর —তার নিত্য অভ্যাসমত কিন্তু ঘুম তার চক্ষে এলো না, এলো নানা চিন্তা, আর একটা নূতন অপরিচিত ভাবের আলোড়ন শুরু হয়ে গিয়েছে তার মনে। বুকের মধ্যে প্রবল আলোড়ন, সঙ্গে সঙ্গে মাথা যেন ভার। এমন কোনদিনই তার হয়নি। তার মনে আগাগোড়া যত কিছু আশা, উদ্যম, কর্মপ্রবৃত্তি কাজ করেছে সব কিছুই যেন তলিয়ে যেতে লাগল, ফুটে উঠলো কেবল তাদের গ্রামের, বিশেষতঃ ঐ ছোটবাবুর ব্যবহার ; তারপরেই তারই নিযুক্ত সেই নরপশুর নির্মম পাশবিক কাণ্ড—তার জীবনে সে আঘাত সহ্য করে আবার তার প্রিয় কর্মকে ধরেই জীবন পথে চলতে চলতে এখন সে ঐ গ্রাম ত্যাগ করে কলকাতায় এসেছে তার সাধ পূর্ণ করতে—এখানে নূতন উদ্যমেই কর্মও শুরু করেচে,—কিন্তু এখানে এলেও ঐ কথাটা যে কিছুতেই মনের তল থেকে একেবারে মিলিয়ে যায়নি। কাজকর্মে, নানাবিধ সৎচিন্তায়, কালীঘাটের তীর্থমাহাত্ম্যে চাপা থাকলেও মাঝে মাঝে যখন তার মন একটা গ্লানিতে ভরে যায়,—এক অবর্ণনীয় যন্ত্রণা ওঠে, বুক থেকে মাথা পর্যন্ত যেন আগুনের জ্বালা আরম্ভ হয়ে যায়। তারপর বহুক্ষণ সে যেন কোন কাজে উৎসাহ পায় না। ঐটাই কি তা জীবনে এতবড় একটা ক্ষত হয়ে থাকবে ?—তার নিরপরাধী প্রকৃতি কিন্তু ঐ ব্যাপারটাকে চাপা দিতে পারে না। সবার শেষে তখন গ্রামের এক শ্রেণীর লোকের ব্যবহার, ঐ নিয়ে তাকে পীড়নের প্রবৃত্তিই তাকে সবার চেয়ে বেশী পীড়া দেয়। কি অদ্ভুত মানুষ প্রকৃতি !

যাই হোক,—আজ সে বিছানায় শুয়ে নিদ্রার অভাবে ভারি মাথা ও বুকের যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলো,—তার ঘুম এল না।

* * * *

ছোটবৌ আজ যে মূর্তি দেখিয়ে ছোটবাবুকে স্তম্ভিত করেছিল ইহজীবনে সেভাবের পরিচয় ছাটবাবু ত বটেই আর কেউ কখনও পায়নি। তার মন বুদ্ধি স্তম্ভিত, তারপর ছোটবাবুর মনের মধ্যে একটা ভীষণ ঝড় বইতে আরম্ভ হয়ে গেল। প্রথমে এই কথাটিই বড় জোরে ধ্বনিত হতে লাগলো,—হে ভগবান, এতদিন আমি কি করে এসেচি ; আজ আমার একি বীভৎস মূর্তি ছোটবৌ দেখিয়ে দিলে আমার চক্ষের সামনে, আমার এমন কুৎসিত রূপ তো আগে দেখিনি। একখানা কালো পরদা যেন সরে গেল, তারই মধ্যে প্রকটিত হয়ে উঠলো যে কালো কুৎসিত মূর্তি তেমন করে স্পষ্ট রেখায় এমনটা পূর্বে কখনও আর দেখা যায়নি।

আসলে এটা পাঁচির নৈতিক প্রভাব ; উপযুক্ত মুহূর্তে পাঁচির প্রতি ছোটবৌয়ের আন্তরিক প্রীতির ফলে ছোটবাবুর অন্তর ক্ষেত্রের জড়িমাকে সত্যের দুর্জয় আঘাতে চূর্ণ করে দিলে। সঙ্গে সঙ্গেই ছোটবৌ-এর দিব্যমূর্তি তার পাশে, স্বর্গের মাধুর্য নিয়ে ফুটে উঠলো। তখন ছোটবাবু নিজের সেই মূর্তি আর দেখতে চাইলে না ; কত কুৎসিত সে, চক্ষু বুজেও তার সেই মূর্তি ঢাকা পড়লো না, অন্ধকারের সঙ্গে মিশেও যেন মিলাতে চায় না—আরও স্পষ্ট হয়ে তাকে যেন ছেয়ে ফেলতে চাইলে সেটা।

ছোটবৌ তখন তো নীচে চলেই গিয়েছে—ডাক্তে পাঠালেও হয়তো আর এখন আসতে চাইবে না তার কাছে। ছোটবাবুর বড়ই ইচ্ছা হতে লাগলো একবার স্ত্রীকে ডেকে তার পায়ের উপর মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে বলে, ওগো আমায় ক্ষমা করো,—এখন আমি বুঝেছি সব কিছু সত্য, যা দিনের মতই উজ্জ্বল তা দেখতে পেয়েছি। আর আমার ভুল নেই,—তুমি দেখো, আর আমি মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেবো না,—আমি দেখেছি, কোন্ নরকের নারকী, মহাপাতকী আমি। অনুশোচনার আগুন এইভাবে জ্বলে উঠলো লোকটির মধ্যে।

সে রাত্রে ছোটবাবুকে সবাই অন্যরকম দেখলে। কারো সঙ্গে কোন কথাই নেই তার। সঙ্গে সঙ্গে মতিও পরিবর্তিত হলো, হাটের ব্যবস্থা সব পড়ে রইলো। অতি অল্প কথায় ছোটবাবু গোমস্তাকে বোলে দিলেন, পাঁচির গোলার মালিক পাঁচিই থাকবে ; —পূর্ব ব্যবস্থার কোনো ব্যতিক্রম হবে না। সেই রাত্রেই লোক পাঠিয়ে স্টেশনে যাবার পালকীর ব্যবস্থাও হলো, পরদিন ছোটবাবু স্ত্রীকে নিয়ে প্রভাতেই কলকাতা যাত্রা করবেন।

ওদিকে ত্রৈলোক্যও কালীঘাট যাবে। তার ছেলে অনুকূল,—যে কাপড়ের দোকানখানা চালাচ্ছে সে বাপের মতই বুদ্ধিমান, নিরীহও বটে,—তাকে আরও কিছু গুরুতর কাজের উপদেশ দিয়ে বলে গেল, আমি কলকাতা চললাম, হয়তো আজ না ফিরতেও পারি। অবশ্য এরকম মধ্যে মধ্যে হতো। নিয়মিতভাবে যথাকালে ত্রৈলোক্য পাঁচির ওখানে গিয়ে হয়তো র'য়ে গেল দুই এক রাত্র। কাজকর্ম শেষে রাত্রে কালী-দর্শন করে,—পাঁচির সস্নেহ আতিথ্য গ্রহণ করে পরদিন সকালের গাড়িতে পোলের হাটে ফিরে এসে কাজকর্ম আরম্ভ করে দিতো। এখন খাতাপত্র নিয়ে সেও রওনা হলো কলকাতার গাড়ি ধরতে পাঁচির বাসার উদ্দেশে।

* * * *

সেদিন প্রথমে অবশ্য পাঁচির জেঠা সস্ত্রীক ঈশ্বরই পেঁৗছেছিল পাঁচির বাসায়। গিয়ে দেখলে তাদের মুড়ো, এখানকার মদনবাবু—মুখটি চুন করে তক্তাপোশের এক ধারে মাথায় আইসব্যাগ ধরে আছে আর এক সায়েবের পোশাকপরা ডাক্তার পাঁচির অচৈতন্য শরীর বকযন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করছে। মুড়ো তখনই বাইরে এসে তাদের জানালে, পাঁচির পরশু সকাল থেকে জ্ঞান নেই, এখন তারা যেন ঘরে না ঢোকে।

তার পরেই এলো ত্রৈলোক্য। তারপর বেলা বারোটা নাগাদ এলো সস্ত্রীক ছোটবাবু। ছোটবৌ স্তম্ভিত। পাঁচির অবস্থা দেখে তার সংজ্ঞারহিত হবার মতই হলো, তাড়াতাড়ি পাঁচির পাশেই বিছানার উপরে বোসে পড়লো সে। ছোটবাবু মুড়োকে জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপারটা কি ?

কাঁদতে কাঁদতে মুড়ো বললে, ডাক্তার বলছে মাথার শির ছিঁড়ে রক্তস্রাব হচ্ছে না কি ভিতর ভিতর,—বলছে প্রাণের আশা খুবই কম। পরশু সকাল থেকে জ্ঞান নেই, বিছানা থেকে ওঠেনি।

এমন সময়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে আর একটি ছেলে এসে তাড়াতাড়ি

ঘরে ঢুকল। তাকে দেখেই মুড়ো বললে, তুমি এরই মধ্যে উঠলে কেন রামনারায়ন,—আজ দুরাত্র তোমার ঘুম নেই, একটু ঘুমিয়ে নাও। সে বললে, ঘুম হবে না আমি বসছি তুমি বরং একটু ঘুমিয়ে নাও এই বেলা।

ছোটবাবু জিজ্ঞাসা করলে, এ কে? মুড়ো বললে, আমার বড় মামার সুমুন্দি।

পাঁচি আর জাগলো না।